ঢাকার গির্জা স্থাপত্যঃ সপ্তদশ — উনবিংশ শতাব্দী

গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক ঃ
ডঃ হাবিবা খাতুন
প্রফেসর
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ডিসেম্বর - ২০০১

400114

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

গবেষক ঃ
নূর-উন-নেসা
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা
বাংলাদেশ।

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়ন পত্র

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, **'ঢাকার গির্জা স্থাপত্য'** (সপ্তদশ-উনবিংশ শতাব্দী) শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি **নূর-উন-নেসা**-এর গবেষণালব্ধ মৌলিক রচনা এবং এটি এম.ফিল ডিগ্রী প্রদানের জন্য বিবেচনাযোগ্য ।

২৭.১২.২০০১

(ডঃ হাবিবা খাতুন)
প্রফেসর
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
বাংলাদেশ ।

400114

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

সূচী পত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
প্রত্যয়ন পত্র	'ক'
চিত্র সূচী	'খ-গ'
ঢাকার মানচিত্র	'ঘ'
ভূমিকা	১-৩
প্রথম অধ্যায় ঃ খ্রিস্ট ধর্মের উত্থান ও ক্রমবিকাশ	৪-১৬
খ্রিস্ট ধর্মের প্রাথমিক অবস্থা	৫
খ্রিস্ট ধর্মের জন্ম ও প্রসারের কারণ	৫
গির্জা সংগঠনের উন্নয়ন	৬
খ্রিস্ট ধর্মের আরাধনার রীতি	৭
পূর্বাঞ্চলের গির্জা	৮
পোপ তন্ত্রের উৎপত্তি	৮
সন্নাসবাদ ও মঠতন্ত্র	১১
খ্রিস্ট ধর্ম এবং শ্রেণী বিভাগ	১২
ক্যাথলিক ধর্ম সংস্কার	১৪
প্রটেস্টান্ট	১৪
দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ গির্জার উৎপত্তি ও ক্রমবিবাশ	১৭-২৬
গির্জার ইতিহাস	২০
প্রচীন যুগ	২০
মধ্য যুগ	২১
আধুনিক যুগ	২৩
সামন্ত প্রথায় গির্জার ভূমিকা	২৩
সম্রাট ও পোপের সংঘর্ষ	২৪
তৃতীয় অধ্যায় ঃ উপমহাদেশে বিভিন্ন বণিকদের আগমন ও গির্জা নির্মাণ	২৭-৩৫
পর্তুগীজদের আগমন ও গির্জা নির্মাণ	২৭
জেসুইস্ট আগমন	৩০
ক্যাটেখিস্ট অ্যান্থনি	৩১
বাংলায় ফরাসীদের আগমন	৩১
বাংলায় ডাচদের আগমন	৩৩
বাংলায় প্রটেস্টান্টদের আগমন	৩৪
আর্মেনীয়ানরাদের আগমন	৩৪
গ্রীকদের আগমন	৩৫

Dhaka University Institutional Repository

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
চতুর্থ অধ্যায় ঃ বঙ্গে খ্রিস্টানদের আগমন এবং খ্রিস্ট ধর্ম প্রবর্তন	৩৬-৮০
ঢাকায় খ্রিস্ট ধর্মের প্রবর্তন	৩৬
ঢাকায় ধর্মপ্রদেশের যাত্রা শুরু	৩৭
সপ্তদশ-উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যে ঢাকায় নির্মিত গির্জাগুলোর স্থাপত্যিক বর্ণনা	
নারিন্দা গির্জা, ঢাকা	৩৮
জপমালা রাণীর গির্জা	৩৯
(আওয়ার লেডি অব দ্যা হলি রোজারিও) তেজগাঁও	
সাধু নিকোলাস তলেন্তিনো গির্জা (নাগরী)	৫১
জপমালা রানীর গির্জা (হাসনাবাদ)	৫৭
সাধু আন্তনীর গির্জা (পাঙ্গোরা)	৬২
সেন্ট থমাস গির্জা (জনসন রোড)	৬৪
হলি রেসারেকশন গির্জা (আর্মানিটোলা)	৬৭
পবিত্র ক্রুশ গির্জা (লক্ষ্মীবাজার)	৭২
সাধু যোহানের গির্জা (তুমুলিয়া)	৭৪
ব্যাপ্টিস্ট গির্জা (বাংলা বাজার)	৭৮
ভক্তিরাণীর গির্জা (আমপট্টি)	৮০
পঞ্চম অধ্যায় ঃ গির্জার তুলনামূলক আলোচনা	৮১-৮৪
উপসংহার	৮৫-৮৮
গ্রন্থপঞ্জি	৮৯-৯৩
ভূমি নকশা	৯৪-৯৯
চিত্র	১০০-১২১

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র সূচী

চিত্র নং পৃষ্ঠা নং

চিত্র নং-১ ঃ Church History. The Fortress of Faith, from a 15th-century manuscript, shows the Church defended by its Chevaliers (the Pope, bishops, and monks) against heretics and the impious (Mansell Collection) ১০০

চিত্র নং-২ ঃ জপমালা রাণীর গির্জার সম্মুখ অংশ, তেজগাঁও (আওয়ার লেডি অব দ্যা রোজারিও) ১০১

চিত্র নং-৩ ঃ জপমালা রাণীর গির্জার প্রধান প্রবেশ পথ এবং উভয় পাশে জোড়া স্তম্ভ এবং নীচে কলসী নকসা

চিত্র নং-৪ ঃ সাধু নিকোলাস তলেন্তিনো গির্জা

চিত্র নং-৫ ঃ সাধু নিকোলাস তলেন্তিনো গির্জার পশ্চিম দিক থেকে

চিত্র নং-৬ ঃ সাধু নিকোলাস তলেন্তিনো গির্জার বেদীর চিত্র

চিত্র নং-৭ ঃ জন পলের মুর্তি

চিত্র নং-৮ ঃ সাধু মাতা মেরী ও পালক পিতা যোশেফের মুর্তি

চিত্র নং-৯ঃ সাধু নিকোলাস তলেন্তিনো গির্জার উত্তর পূর্ব কোনে Grotto বা গুহা

চিত্র নং-১০ ঃ সাধু নিকোলাস তলেন্তিনো গির্জার ফাদারের বাসস্থান

চিত্র নং-১১ঃ নাগরী,শব দেহ কবরস্থ করার পূর্বে এখানে রাখা হয়

চিত্র নং-১২ ঃ জপমালা রাণীর গির্জা (হাসনাবাদ)

চিত্র নং-১৩ ঃ জপমালা রাণীর গির্জার (একাংশ)

চিত্র নং-১৪ ঃ গির্জার প্রধান প্রবেশ পথ

চিত্র নং-১৫ ঃ জপমালা রাণীর গির্জার বেদীর চিত্র

চিত্র নং-১৬ ঃ বেদীতে পূর্ব প্রান্তে ক্রুশবিদ্ধ যীশু

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র নং | পৃষ্ঠা নং

চিত্র নং-১৭ ঃ বেদীর ডানদিকে সাদা পোষাকে বসা অবস্থায় যীশুর মুর্তি

চিত্র নং-১৮ ঃ পশ্চিম প্রান্তে গ্যালারীর চিত্র

চিত্র নং-১৯ ঃ সন্তান কোলে মাতা মেরীর মুর্তি

চিত্র নং-২০ ঃ যীশুর মুর্তি

চিত্র নং-২১ ঃ সাধু আন্তনীর (পাঞ্জরা) গির্জা

চিত্র নং-২২ ঃ সাধু আন্তনী গির্জার বেদীর চিত্র

চিত্র নং-২৩ ঃ গির্জার সম্মুখে পাথরে নির্মিত একটি ষষ্ঠকোনাকৃতির একটি স্থানে পর্তুগীজ ভাষায় লিখিত শিলালিপি

চিত্র নং-২৪ ঃ সেন্ট থমাস গির্জা (জনসন রোড)

চিত্র নং-২৫ ঃ সেন্ট থমাস গির্জার বেদীর অংশ

চিত্র নং-২৬ ঃ ব্যাপটিস্ট ফ্রন্ট

চিত্র নং-২৭ ঃ শিলালিপির চিত্র

চিত্র নং-২৮ ঃ দেয়ালে সন্তান কোলে মায়ের চিত্র

চিত্র নং-২৯ ঃ হলি রেসারেকশন গির্জা (আরমানিটোলা)

চিত্র নং-৩০ ঃ বসার আসনসহ বেদীর চিত্র

চিত্র নং-৩১ ঃ বেদীর পেছনে দু'টি তেল চিত্র

চিত্র নং-৩২ ঃ বেদীর উপর কারুকাজ করা জোড়া স্তম্ভ এবং বহুখাজ বিশিষ্ট অর্ধবৃত্তাকার খিলান

চিত্র নং-৩৩ ঃ শ্বেত মর্মরের এপিটাফ

চিত্র নং-৩৪ ঃ পবিত্র ক্রুশ গির্জা (লক্ষ্মী বাজার)

চিত্র নং-৩৫ ঃ পবিত্র ক্রুশ গির্জায় বেদীর চিত্র

চিত্র নং-৩৬ ঃ সাধু যোহানের (তুমুলিয়া) গির্জার সম্মুখ অংশ

চিত্র নং-৩৭ ঃ তুমুলিয়া গির্জার বেদীর অংশ

চিত্র নং-৩৮ ঃ যীশুর মুর্তি

চিত্র নং-৩৯ ঃ সাধু ব্যাপ্টিস্টের মুর্তি

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তদশ-উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত ঢাকার গির্জা স্থাপত্য

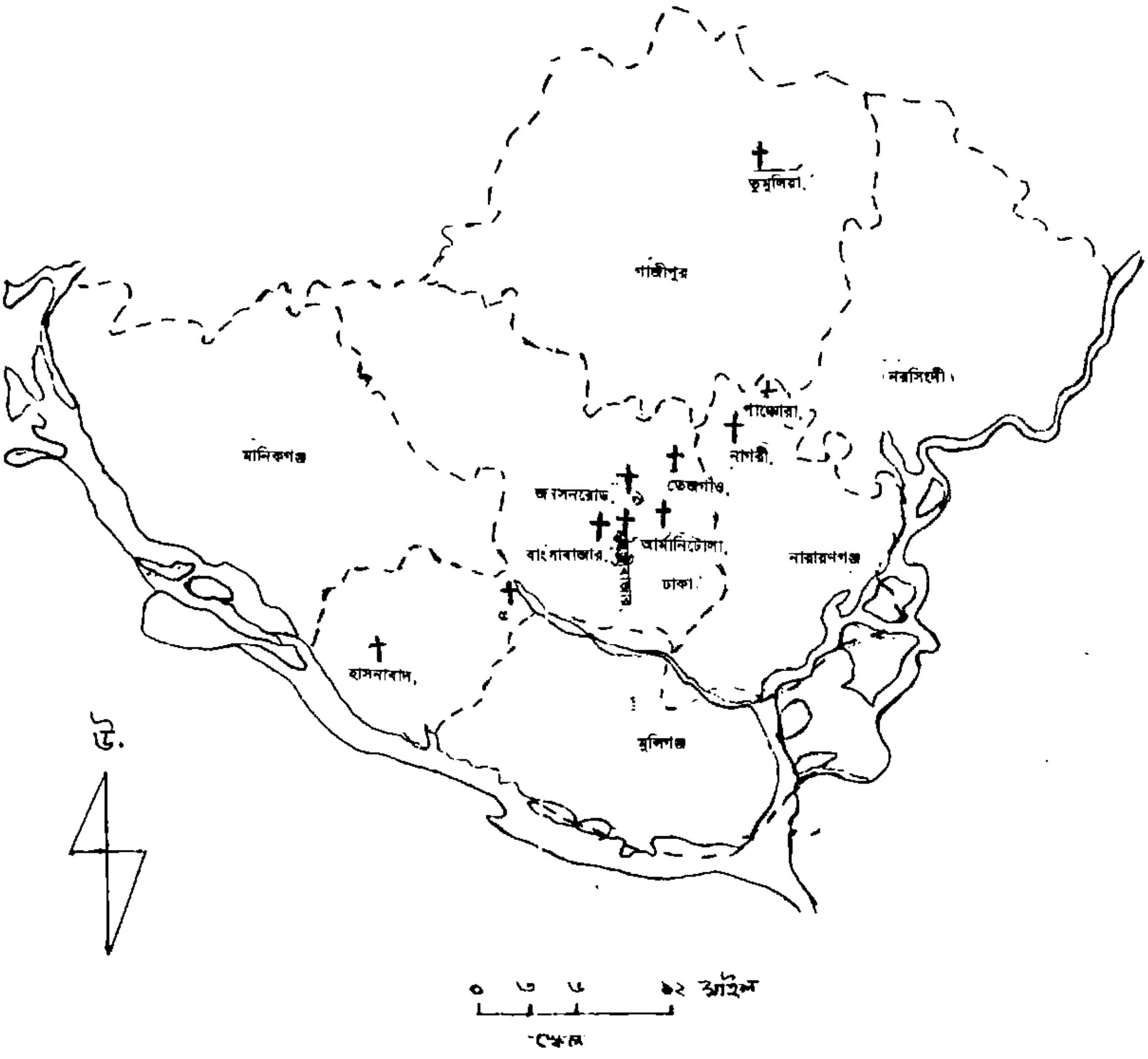

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

সূর্য উঠছে প্রতিদিন আবার ডুবেও যাচ্ছে। দিনবদলের এ পালার হিসেব আমরা অনেক সময় রাখিনা। কিন্তু মহেন্দ্রখন যখন এসে উপস্থিত হয় তখন আমাদের ফেলা আসা দিনগুলোর দিকে ফিরে তাকাতে ইচ্ছে করে। মানুষ যখন বিগত দিনগুলোকে একটি সূতোয় গেথেঁ রাখে তখন এর নাম হয় ইতিহাস। ইতিহাস আমাদের শেখায় অনেক কিছু। ইতিহাস শুধু গৌরব গাঁথা নয়, ইতিহাস সত্য প্রকাশের বাহন। আলোচ্য গবেষণার বিষয় 'ঢাকার গির্জা স্থাপত্যঃ সপ্তদশ -'উনবিংশ শতাব্দী' । স্থাপত্য মানেই ইতিহাসের সাথে অঙ্গাঅঙ্গি ভাবে জড়িত ঘটনাবলীর কথা। বর্তমান অভিসন্দর্ভে গির্জা স্থাপত্য আলোচনা প্রসঙ্গে (১) গির্জা নির্মাণ কারীদের উৎপত্তির ইতিহাস (খ্রিস্টধর্ম) (২) উপমহাদেশে তাদের আগমন ও ধর্ম প্রচার (৩) বঙ্গে তাদের আগমন ও ধর্ম প্রচার; অতঃপর (৪) ঢাকায় তাদের আগমন এবং গির্জা নির্মাণ ও (৫) সেসব গির্জা স্থাপত্যের বর্ণনা আলোচনায় আনা হয়েছে । ইতোপূর্বে এধরনের গবেষণা কর্ম হয়নি।

খ্রিস্ট ধর্মকে প্রাচ্যের ধর্ম বলে মনে করা হলেও মূলত তা মধ্যপ্রাচ্যের ধর্ম। যীশু খ্রিস্ট জম্মগ্রহণ করেছিলেন দু'হাজার বছর পূর্বে প্যালেস্টাইন অঞ্চলে এশিয়া মহাদেশে। এশিয়া মহাদেশকে প্রাচ্য দেশ বলে অভিহিত করা হয়। প্রাচ্য তখন ঐশ্বর্য সম্পদে জ্ঞানে গরিমায় অনেক সমৃদ্ধ ছিল। কথিত আছে প্রথম শতাব্দীতে প্রেরিত শিষ্য - সাধু থমাস দক্ষিণ ভারতের কেরালস্থ - মালাবার প্রদেশে খ্রিস্টধর্ম প্রচার করেছিলেন কিন্তু একথা সত্য যে ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশ অঞ্চলে মিশনারীরা এসেছিলেন পাশ্চাত্য থেকে। ১৪৯৮ খিষ্টাব্দে পর্তুগীজ নাবিক ভাস্কো-দা-গামা - ভারতবর্ষে আসার সহজপথ আবিস্কার করলে অনেক ধর্মপ্রচারক ও বনিক এদেশে খ্রিস্ট ধর্ম প্রচার শুরু করেন। নদী পথে পৌছা যায় এরকম প্রত্যন্ত অঞ্চলে খ্রিস্টান ধর্মপল্লীগুলো স্থাপন করা হয়েছিল এর উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যায় হাসনাবাদ নগরী।[১]

বাংলার স্বাধীন সুলতান গিয়াস উদ্দিন মাহমুদ শাহের শাসনামলে পর্তুগীজরা এদেশে এসে নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিল। এ পর্তুগীজরাই প্রথম গির্জা স্থাপন শুরু করে। একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে এদেশে খ্রিস্ট ধর্ম প্রচার এবং গির্জা নির্মানে পর্তুগীজদের ভূমিকাই অগ্রগন্য, আর ঢাকা মহানগরীর বেশীর ভাগ গির্জাই পর্তুগীজদের নির্মিত। যেমন ঃ ১৬১৫ খ্রিঃ তারা ঢাকার নারিন্দা অঞ্চলে প্রথম গির্জা নির্মাণ করেন। (গির্জাটি বর্তমানে ধ্বংসপ্রাপ্ত), এছাড়া তেজগাঁও গির্জা, নাগরীর গির্জা, হাসনাবাদ গির্জা, পাঙ্গোরা গির্জা, সেন্টথমাস গির্জা, হলিক্রস গির্জা, লক্ষী বাজার, আর্মানিটোলা গির্জা ইত্যাদি। পর্তুগীজদের পাশাপাশি ইউরোপীয় অন্যান্য বণিক গোষ্ঠী ভারতের মুঘল দরবারে উপস্থিত হয়। তাদের মাঝে চিকিৎসা বিদ্যায় পারদর্শী ব্যাক্তিরাও ছিলেন। তাঁরা ধর্মীয় বিষয়ের পাশাপাশি চিত্রকলার প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। ফলে মুঘল দরবারে সম্রাট আকবরের সময় থেকে তারা বিশেষ স্থান দখল করে। ধীরে ধীরে ওলন্দাজ, আর্মেনীয়, ইংরেজরা ও গ্রীকরা বাংলায় এসে বাংলায় গির্জা স্থাপন করে। এর পরবর্তী পর্যায়ে তারা ঢাকায় বিভিন্ন ধর্মপল্লী স্থাপন করে গির্জা নির্মাণ করতে থাকে। গির্জাগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে নাগরীর সাধু নিকোলাসের গির্জা, তেজগাঁও এর হলি রেজারিও গির্জা, (জপমালা রানীর গির্জা) সেন্ট থমাস গির্জা, বাংলা বাজার ব্যাপটিষ্ট গির্জা, হাসনাবাদের জপমালা রানীর গির্জা । এ গির্জাগুলো সপ্তদশ থেকে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে বৃহত্তর ঢাকা জেলায় নির্মিত হয়েছে। উক্ত সময়কালীন গির্জাগুলোর স্থাপত্যিক বর্ণনা এবং গির্জা নির্মাণ ইতিহাস এ গবেষণা কর্মে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। গবেষণা সময়কালের বহির্ভূত গির্জার আলোচনা এখানে করা হয়নি।

আমাদের দেশে খ্রিস্টানদের শ্রেণী বিভাজন (যেমন ঃ ক্যাথলিক ঃ যারা গোড়া এবং কোন রকম সংস্কারে বিশ্বাসী নয়, প্রটেস্টান্ট ঃ যারা সংস্কার পন্থী) অনুযায়ী গির্জার বৈশিষ্ট্যের মধ্যেও পার্থক্য রয়েছে তবে গির্জাগুলো তেমন জাঁকজমকপূর্ণ নয় সাদামাটাভাবে নির্মিত। কিন্তু পাশ্চাত্যের গির্জাগুলো রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতায় খুব

Dhaka University Institutional Repository

জাঁকজমক ও ব্যয়বহুল ভাবে নির্মিত হয়েছিল। এদেশের খ্রিস্টানরা আর্থিক ভাবে সচ্ছল ছিলনা বিধায় তাদের স্থাপত্য কর্মে জাঁকজমকতা পাওয়া যায়না। খ্রিস্টধর্ম প্রচারকরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে নদী পথে প্রত্যন্ত অঞ্চলে দিয়ে তাদের ধর্ম পল্লী গড়ে তুলত এবং দরিদ্রদের মাঝে ধর্ম প্রচার করত এবং খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করত। সে অঞ্চলের জনগনের আর্থ-সামাজিক অবস্থা ছিল খুব নাজুক। আর সে কারনে গির্জা গুলো সাদামাটা ধরনের ছিল। খ্রিস্টান ধর্ম প্রচারকরা মনে করতেন যে, ধর্মান্তরের ক্ষেত্রে মুসলমানদের চেয়ে হিন্দু সমাজই বেশী উপযোগী। কারণ, অতীতে হিন্দু সমাজ থেকে বহুলোক ভিন্ন ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়েছে। তাই খ্রিস্টান ধর্ম প্রচারকদের তৎপরতা হিন্দু এলাকাতেই সীমাবদ্ধ ছিল। ফলে খ্রিস্টান ধর্মে ধর্মান্তরিতদের মধ্যে হিন্দুরাই ছিল সংখ্যায় বেশী।[২] উল্লেখ্য যে, প্রাথমিক গির্জাগুলো স্থানীয় উপকরন দিয়ে নির্মিত ছিল। আঞ্চলিকভাবে ছনের ব্যবহার ছিল বেশী। (আঞ্চলিক ভাষায় ছনকে 'ছোন' বলা হয়) বর্তমানে দন্ডায়মান গির্জাগুলো পরবর্তী সময়ে স্থায়ী উপকরনের মাধ্যমে নির্মাণ করা হয়েছে।

এ গবেষণা কর্ম শুরু করতে গিয়ে একদিকে রোমাঞ্চিত, অন্যদিকে দ্বিধাগ্রস্থ হতে হয়েছে। রোমাঞ্চিত হওয়া এজন্য যে, ইতোপূর্বে গির্জা নিয়ে গবেষণা কর্ম হয়নি। নতুন একটি বিষয়। অনেক কিছুই জানা যাবে। দ্বিধাগ্রস্থ বা ভয় এজন্য যে একদিকে নতুন বিষয়; কোন তথ্য পাওয়া যায় কিনা। কাজ করতে গিয়ে দেখা গেছে তথ্য সূত্র খুব কম। গির্জার ইতিহাস কোথাও একটু আধটু পাওয়া গেলেও স্থাপত্যিক বর্ণনা দু'একটি গ্রন্থছাড়া অন্য কোন গ্রন্থে পাওয়া যায় নাই। নাজিমউদ্দিন আহমেদ এর Buildings of the British Raj in Bangladesh নামক গ্রন্থ-এ গবেষণায় খুব সহায়ক হয়েছে। এ গ্রন্থটিতে বৃটিশ আমলে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থাপত্য কর্মের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। আর এ বইয়ের Architectural Legacies of the British Period শিরনামের ৩য় অধ্যায়ে সে সময়ের কয়েকটি গির্জার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। Dhaka Past, Present and Future গ্রন্থে ডঃ পারভীন হাসান এর লেখা Old Charches and Cemetries of Dhaka এ অধ্যায়ে গির্জা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

এছাড়া আহমেদ হাসান ডানী'র 'Dacca and A Record and Its Changing Fortune' নামক গ্রন্থের ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে Dacca under the British (1765 - 1947) এ অধ্যায়ে কয়েকটি গির্জা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এ গ্রন্থটিতে প্রাচীন ঢাকা থেকে শুরু করে আধুনিক ঢাকার ইতিহাস এবং স্থাপত্য সম্পর্কে বিশেষ ভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

তাছাড়াও জেরোম, ডি, কস্তার লেখা 'বাংলাদেশ ক্যাথলিক মন্ডলী' এটি বিশেষ ভাবে সহায়ক হয়েছে। এসব গ্রন্থ ছাড়া গির্জার স্থাপত্যিক বর্ণনা তেমন কোথাও নেই বলা চলে। তবুও এসব গ্রন্থগুলোর সাহায্য পাওয়ার কারনে লেখার বা বর্ণনার একটা ধারা খুজেঁ পাওয়া গেছে। কেননা এ যাবৎ কেবল মসজিদ, মন্দির, দূর্গ ইত্যাদি বিষয়ে বর্ণনা দেওয়া এবং পড়া হয়েছে। কিন্তু গির্জা নতুন হওয়াতে এবং গির্জার অনেক স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্য্য আছে যা জানা না থাকায় কিভাবে বর্ণনা শুরু হবে তা বুঝা যাচ্ছিলনা। এসব ক্ষেত্রে খুব অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছে। সরেজমিনে গির্জাগুলো দেখে ও গির্জার ফাদারের সাথে বা ব্রাদারদের সাথে কথা বলে অনেক তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। মূলতঃ এ গবেষণা কর্মটি বাস্তব পর্যবেক্ষণের উপর ভিত্তি করেই করা হয়েছে।

গির্জা স্থাপত্য বর্ণনা করতে গিয়ে একটি বৈশিষ্ট্য সবসময় নজরে পড়েছে তা'হল, ত্রি-কোনাকার নকশাকৃত অংশ বা Pediment। অবশ্য প্রটেস্টান্ট গির্জায় এ বৈশিষ্ট্যটি নজরে পড়েনি। প্রতিটি ক্যাথলিক গির্জায় এবং টেলিভিশনে খ্রিস্টানদের কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠান বা ইমারত দেখালে বিশেষ করে আমেরিকার বিশেষ কয়েকটি স্থাপত্য ইমারতে যেমন আমেরিকান হাই কোর্ট, হোয়াইট হল ইত্যাদিতে এ ত্রি-কোনাকার অংশটি দেখে মনে হয়েছে এ বৈশিষ্ট্যটির নিশ্চয়ই কোন তাৎপর্য রয়েছে। হাসনাবাদের ফাদার জ্যোতি গোমেজের কাছ থেকে জানা গেছে যে, এ ত্রি-কোনাকার অংশটি হচ্ছে খ্রিস্টানদের 'Symbol of Trinity' অর্থাৎ ত্রিত্ববাদের প্রতীক। অর্থাৎ ঈশ্বর এক আর মানব চরিত্র যীশুপুত্র ঈশ্বর এবং শক্তির নাম পবিত্র আত্মা।

Dhaka University Institutional Repository

আরও জানা গেছে বিভিন্ন গির্জায় যে স্থাপত্য বৈশিষ্ট্যটি স্থাপত্যকে অতি আকর্ষণীয় করে রেখেছে তা হলো গির্জায় ব্যবহৃত স্তম্ভ শ্রেণীর ছাদ সমান্তরালে স্তম্ভের বিভিন্ন ধাপ গুলোর ক্রমশঃ হ্রাস পাওয়া রূপ ও শীর্ষে তা ক্রমহ্রাস হয়ে যাওয়া। পাঙ্গোরা গির্জায় এরূপটি বিশেষভাবে দেখা যায় । হাসনাবাদের ফাদার জানিয়েছেন যে, পৃথিবী ক্রমশঃ ছোট হয়ে যাচ্ছে এ ধারনা বুঝানের জন্য ক্রমহ্রাস পাওয়া স্থাপত্য বৈশিষ্ট্যটি গির্জায় ব্যবহার করা হয়েছে। তবে এটা সত্য যে এ বৈশিষ্ট্যটি বাহ্যিক ভাবে স্থাপতা কাঠামোকে আকর্ষনীয় করে তোলার জন্য মেকি অলংকরণ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে।

এছাড়া আরও একটি ব্যাপ্তায় কৌতুহলের উদ্রেগ করেছে তা হলো খ্রিস্টানদের প্রার্থনার কি কোন নির্দিষ্ট দিক আছে ? মুসলমানদের যেমন কিবলা দিক রয়েছে। বিভিন্ন গির্জায় ফাদারদের সাথে আলোচনা করে জানা গেছে তাদের প্রার্থনার কোন দিক নেই। সবদিকেই তারা প্রার্থনা করে। তবে ঢাকার গির্জাগুলোর প্রার্থনাবেদী সাধারনত পূর্ব দিকেই দেখা যায় এবং এর বিপরীত দিকে অর্থাৎ পশ্চিম দিকে প্রধান প্রবেশ পথ এবং এদিক থেকেই গির্জার মূল অংশ (Nave) এবং খিলান পথ (Aisle) এর সৃষ্টি হয়েছে। নাগরী, পাঙ্গোরা গির্জায় দক্ষিন দিকে প্রার্থনাবেদী। এর বিপরীতে উত্তর দিকে প্রধান প্রবেশ পথ। তবে গির্জার প্রাথমিক ইতিহাস থেকে জানা যায় গির্জার মূল প্রবেশ পথ পশ্চিম দিকে এবং প্রার্থনাবেদী পূর্ব দিকেই ছিল।

প্রধান প্রবেশ পথের বিপরীত দিকেই থাকে প্রার্থনাবেদী বা প্রার্থনা মঞ্চ, যা সাধারনত মেঝে থেকে কিছুটা উত্তোলিত এবং প্রার্থনা মঞ্চের পিছনের দেওয়ালে থাকে যীশুর ক্রুশবিদ্ধ প্রতীক ভাস্কর্য (ক্যাথলিক গির্জার ক্ষেত্রে অথবা কেবল ক্রুশচিহ্ন (প্রটেষ্টান্ট গির্জার ক্ষেত্রে)। এ প্রার্থনাবেদীর উপর থেকে ফাদার বা খ্রিস্টান পুরোহিত বা বিশপ গির্জায় সমবেত খ্রিস্টান ধর্মপ্রানদের প্রার্থনা পরিচালনা করেন। প্রার্থনা শেষে গির্জার সমবেত প্রার্থনাকারীদের খাদ্য বিতরণ করা হয়, তা খ্রিস্টভোগ নামে পরিচিত।

আবার এ গির্জাকে কেন্দ্র করে খ্রিস্টানদের সমাজ ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। কোন অন্যায়, অবিচারের প্রাথমিক বিচার খ্রিস্টান পুরোহিতরাই পরিচালনা করেন। তারপর প্রয়োজনে আদালতের স্মরনাপন্ন হয়। খ্রিস্টানদের বিয়ে পুরোহিত পরিচালনা করেন। এ অনুষ্ঠান গির্জাকে কেন্দ্র করেই হয়ে থাকে।

মুসলিম প্রধান দেশ হলেও অন্যান্য ধর্মের লোকেরা এখানে স্বাধীনভাবে ধর্মকর্ম করে। এদেশে প্রায় ১% খ্রিস্টান রয়েছে। সংখ্যালঘু হলেও গির্জাকে কেন্দ্র করেই খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বীশৃঙ্খলাবদ্ধ ও একতাবদ্ধ।

তথ্যসূত্র:

১ স্মরণীকা খ্রীস্ট জন্ম জয়ন্তী ২০০০, শিকরের সন্ধানে ঢাকা মহাধর্ম প্রদেশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, ফাদার ডেভিড গোমেজ - পৃ ঃ - ১০

২ বাংলাদেশের ইতিহাস (১৭০৪-১৯৭১) সম্পাদক সিরাজুল ইসলাম, ৩য় খন্ড, ডিসেঃ ১৯৯০, এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বাংলাদেশ, পৃঃ-৭২৮

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

খ্রিস্ট ধর্মের উত্থান ও ক্রমবিকাশ

আগাস্টাস সীজার যখন সাম্রাজ্যবাদী একনায়কতন্ত্রী রোমের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন, ঠিক তখনই তাঁর সাম্রাজ্যে এক যুগান্তকারী মহানায়কের আর্বিভাব ঘটে। রোমান সাম্রাজ্যের অর্ন্তগত জেরুজালেম প্রদেশের বেথলহেম নামক গ্রামের এক আস্তাবলে মাতা মেরীর ঘরে মহাপুরুষের জন্ম হয় খ্রিস্টীয় প্রথম অব্দে। এ মহানায়ক যীশু খ্রিস্টই ছিলেন খ্রিস্টান ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা।

প্রথম জীবনে যীশু বেথেলহামের গ্যালিলি (Galilee) নামক এক অখ্যাত গ্রামে ১৩ বৎসর কাঠের ব্যবসা করেন। তাঁর সামান্য প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ছিল। এছাড়া তিনি পূর্ববর্তী ঐশীগ্রন্থের (যবুর, তাওরাত) উপর পড়াশুনা করেন।

যীশু খ্রিস্টের আর্বিভাবের পূর্বে ইহুদী সম্প্রদায়ের লোকের কাছে রোমান আইন অসহনীয় হয়ে উঠেছিল এবং তারা দীর্ঘদিন যাবৎ একজন মহান নেতার আর্বিভার কামনা করছিল, যিনি রোমান প্রভূদের ভূমি থেকে উচ্ছেদ করে দেবে এবং স্বাধীন সমৃদ্ধশালী ইহুদী রাষ্ট্র পূনঃ প্রতিষ্ঠা করবে।

প্রায় ২৮ খ্রিস্টাব্দে (A.D) যীশু খ্রিস্ট ধর্ম প্রচারক হিসেবে আর্বিভূত হন এবং ঈশ্বরের নতুন আদেশ প্রচার করতে থাকেন। এ মহানায়ক যীশু খ্রিস্ট রোমের মানবতাবিরোধী দাসতান্ত্রিক ভাবাদর্শের প্রতি চ্যালেঞ্জ হিসেবে আবির্ভূত হন। তাঁর প্রচারিত খ্রিস্ট ধর্ম সারা রোমান সাম্রাজ্যে এক প্রচন্ড আলোড়ন সৃষ্টি করে। গ্রেকো-রোমান যুগের মুদ্রাভিত্তিক আন্তর্জাতিক বানিজ্যনির্ভর অর্থনীতির উপরোক্ত ভাবাদর্শ যে নতুন সৃষ্টির প্রয়োজনে দেখা দিয়েছিল, দাসতন্ত্রের উপস্থিতির ফলে তা কখনও বাস্তবায়িত হতে পারেনি। সমাজের তিন-চর্তুথাংশ মানুষকে দাসত্বের শৃংখল পড়িয়ে, তাদের পশুর মত জীবনযাপনে বাধ্য করে দাসপ্রথা যে সংকট সৃষ্টি করেছিল, রোমান সাম্রাজ্য সে সংকট থেকে পরিত্রাণ পায়নি।

আন্তর্জাতিক অর্থনীতি যে বিশ্বজনীন দর্শনের প্রয়োজনীয়তা সৃষ্টি করেছিল সে চাহিদা মেটাতেই আর্বিভূত হয়েছিল খ্রিস্ট ধর্ম।

যীশু খ্রিস্টের জীবনকাহিনী ও খ্রিস্ট ধর্ম প্রচারের বিবরণের মূলসূত্র বাইবেল। এটি নতুন টেস্টামেন্ট নামেও খ্যাত। যীশুর প্রধান সহচরদের লিখিত বিবরণ থেকেও এ সমন্ধে কিছু কিছু তথ্য পাওয়া যায়।

যীশুর জন্মস্থান জেরুজালেম ছিল প্রধানত ইহুদীদের বাসভূমি। বাল্যকাল থেকেই যীশু ইহুদী ধর্মযাযকদের সাথে ধর্মবিষয়ে নানারূপ তর্কে প্রবৃত্ত হতেন। কতক বিষয়ে তাদের সাথে যীশুর মত পার্থক্য দেখা দেয় এবং সে সাথে যীশুর নিজস্ব মতে আকৃস্ট হয়ে বহু লোক তাকে ধর্ম প্রচারক বা ঈশ্বরের প্রেরিত পুরুষ বলে মেনে নেয়। এর ফলে ইহুদীরা তাঁর প্রতি প্রচন্ড ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে এবং তাঁকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র চালাতে থাকে।

দিন দিন তাঁর প্রতি বিশ্বাসীদের সংখ্যা বেড়ে যায়। যীশুর মানবতার বানী দলে দলে লোককে বিশেষ করে ক্রীতদাস নিঃস্ব মজুর, কৃষক ও দরিদ্রদের আকৃষ্ট করে তোলে। কিন্তু খ্রিস্টান ধর্মের মানবতা এবং বিশ্বপ্রেমের আদর্শ দাসতান্ত্রিক রোমান সাম্রাজ্যে কোন ক্রমেই গ্রহণযোগ্য ছিলনা। রোমান শাসকরা স্বয়ং যীশুকে তাদের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে মনে করলেন। তাদের ধারণা যীশু একটি পাল্টা সাম্রাজ্য গড়ে তোলার চেষ্টা চালাচ্ছিলেন। এ অভিযোগে যীশুকে অভিযুক্ত করা হয় এবং জেরুজালেমের রোমান শাসক পন্টিয়ার্স পাইলেট তাঁকে মৃত্যুদণ্ডে দন্ডিত করেন। যীশুকে অতঃপর ক্রুশে বিদ্ধ করে হত্যা করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

খ্রিস্ট ধর্মের প্রাথমিক অবস্থা ঃ

যীশু খ্রিস্টের তিরোধানের পর অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটতে থাকে। গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে, যীশু খ্রিস্টের ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার পর তাঁকে দেখা গিয়েছে এবং যীশু মিশন চালিয়ে যাওয়ার জন্য তাদেরকে অনুরোধ জানিয়েছেন। তারা অতি শীঘ্রই জেরুজালেমে একত্রিত হয়ে তাদের প্রভূর শিক্ষা স্মরণ করেন এবং অন্যান্য ইহুদীদের নিজেদের ধর্মে দীক্ষিত করার চেষ্টা করেন।

প্রথমে অল্পবিস্তর নব দীক্ষিত লোক ছিল। ৪৫ খ্রিস্টাব্দে মিশনারী কাজের মাধ্যমে তাদের ধর্ম প্রচারের আন্দোলন সূচিত হয়। বিদেশে বসবাসরত ইহুদীদের মধ্যে এথেন্স, এ্যান্টিয়োক এবং রোমে বসবাসরত ইহুদী সম্প্রদায়ের মাঝে নতুন ধর্ম এক নতুন আন্দোলন সৃষ্টি করে।

খ্রিস্ট ধর্মের জন্ম ও প্রসারের কারণ ঃ

খ্রিস্ট ধর্মের জন্ম মরমীবাদ আবহাওয়া ও পরিবেশের মধ্যে,যীশু খ্রিস্ট পৃথিবীতে এক স্বর্গরাজ্য স্থাপনের পরিকল্পনা করেছিলেন। এ স্বর্গরাজ্যে প্রবেশাধিকার লাভের জন্য তিনি সকলকে আহবান জানালেন। তিনি বললেন পৃথিবীর প্রতিটি নর-নারী আদি পিতা ও মাতা আদম ও ঈভের পাপের অংশ বহন করে জন্মেছে। এ পাপ থেকে মুক্ত হওয়ার একমাত্র উপায় সত্য ও ন্যায়নিষ্ট জীবনযাপন। মিথ্যাচার, হঠকারিতা ও প্রবঞ্চনার তিনি তীব্র নিন্দা করেছেন। ধনদৌলত, পার্থিব সুখ সম্পদ ত্যাগের মাধ্যমেই মানুষ স্বর্গরাজ্যে প্রবেশের অধিকার লাভ করে। যীশু ধন বৈষম্য লোপ করার উপদেশ দিয়েছেন, কেননা সমস্ত ধন সম্পদের মালিক স্বয়ং ঈশ্বর। সমাজ সংস্কার সাধনের উদ্দেশ্যের এটা এক গুরুত্বপূর্ণ বৈপ্লবিক আন্দোলন। কিন্তু খ্রিস্ট ধর্মের আন্দোলন যদি শুধু নীতিবাক্য ও আদর্শবাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকত, তবে তা অংকুরেই বিনষ্ট হত।

একে এক বিশ্বধর্মরূপে প্রচার করে সেন্টপল খ্রিস্ট ধর্মকে এ বিপদের হাত থেকে রক্ষা করলেন। এর জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির জন্য অনুষ্ঠান, উপাসনা, যাদুবিদ্যা প্রভৃতির পরিকল্পনা প্রর্বতন করা হল, সর্বসাধারনের গ্রহণযোগ্য এক জীবনাদর্শ ও দর্শন তৈরী করা হল। এ কাজ সম্পাদনের জন্য খ্রিস্ট ধর্ম মিথ্রাইজম, সেরাপিস-আইসিস ধর্ম, স্টোইক-দর্শন ও বিশেষ করে নিও প্ল্যাটোনিজম থেকে মতবাদ গ্রহণ করল। খ্রিস্টধর্মের মূল উপদেশের সাথে যথাসম্ভব সঙ্গতি রেখে প্রয়োজন মত বেছে বেছে এসব অনুষ্ঠান কৌশলে গ্রহণ করা হয়েছে।

ওরিগেন (১৮৫-২৫৪ খ্রিঃ) গ্রীক দর্শন থেকে নানা মত ও তথ্যের সমাবেশ করে দেখাতে চেষ্টা করেছেন যে খ্রিস্টীয় ধর্মবিশ্বাস সুপ্রাচীন দর্শন ও জ্ঞান থেকে উদ্ভূত। লোগোস গ্রীক আধ্যাত্মবাদের ভিত্তিতে প্রচার করেন যে, ঈশ্বর অপরিবর্তনশীল। খ্রিস্টীয় ধর্মবিশ্বাসের এরূপ পান্ডিত্যপূর্ণ মত শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে খ্রিস্ট ধর্ম প্রচারের বিশেষ সুবিধা করে দেয়। সেন্ট আগাষ্টিন (৩৫৪-৪৩০ খ্রিঃ) এ দার্শনিক ভিত্তি আরও সুদৃঢ় রূপে রচনা করেন। তিনি নানা শাস্ত্রে, বিশেষতঃ প্লেটোনিক দর্শনে সুপন্ডিত ছিলেন। খ্রিস্ট ধর্মবিশ্বাসের ভিত্তিতে তিনি সমগ্র জ্ঞানের এক সমন্বয় সাধন করেন। তাঁর চেষ্টায় খ্রিস্ট ধর্ম এক আধ্যাত্ম দর্শনে পরিণত হয়। সেন্ট আগাষ্টিন মরমীবাদে বিশ্বাসী ছিলেন; ঐশ্বরিক ক্ষমতা প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে তিনি মরমীবাদও যাদু বিদ্যার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করতেন। সেন্ট জেরোম, সেন্ট গ্রেগরী প্রমুখ নেতৃস্থানীয় ধর্ম যাজকরা অত্যাশ্চর্য ঐশ্বরিক ক্ষমতার প্রমাণ দেওয়ার জন্য যাদুবিদ্যার ও আশ্রয় নেন।

যীশু খ্রিস্টের মৃত্যুর পর তাঁর প্রধান চারজন সহচর সেন্টপিটার, সেন্টপল, সেন্ট মথি ও সেন্ট লিউক খ্রিস্ট ধর্ম প্রচার ও প্রসার কার্য পরিচালনার দায়িত্ব নেন। তাদেরই চেষ্টায় খ্রিস্ট ধর্মের ব্যাপক ব্যাপ্তি ও প্রসার ঘটে।

Dhaka University Institutional Repository

রোমান সাম্রাজ্যের পতনের যুগে সমগ্র পশ্চিম ইউরোপ ব্যাপী যে প্রচন্ড অবক্ষয় ও দুর্দশার সৃষ্টি হয়েছিল, সাধারণভাবে মানুষের মনে তা এক অনিশ্চয়তা ও হতাশার জম্ম দিয়েছিল। এরই পরিপ্রেক্ষিতে যীশু খ্রিস্টের মরমীবাণী মানুষকে বাঁচবার প্রেরণা দেয় এবং তাদের মনে নতুন আশার সঞ্চার করে। খ্রিস্ট ধর্মের বিশ্বভ্রাতৃত্ব মানুষের প্রতি বিশ্বপিতার ভালবাসা, তাদের দুর্গতি মোচনের জন্য ঈশ্বর কর্তৃক তাঁর সন্তানকে প্রেরণ এবং এ জীবনের দুঃখ ও কষ্টের সমাপ্তিতে পরকালে চিরস্থায়ী সুখ ও আনন্দ লাভের আশ্বাস ইত্যাদি সে যুগের নির্যাতিত, দ্রারিদ্র পীড়িত মানুষকে সকল দুঃখ বেদনা সহ্য করার অপরিসীম প্রেরণা যোগায়। দিন দিন খ্রিস্ট ধর্মের বিশ্বাসীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। খ্রিস্টধর্মের এ ব্যাপক প্রচার রোমান সম্রাটদের মনে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি করে এবং খ্রিস্টানদের উপর নেমে আসে ব্যাপক নির্যাতন ও অত্যাচার। যখনই কোন দুর্ভিক্ষ মহাপ্লাবন, মহামারী, ভূমিকম্প বা প্রাকৃতিক বিপর্যয় দেখা দিত তখনই খ্রিস্টানদের এ জন্য দায়ী করা হত। খ্রিস্টানদের অবস্থা সবচেয়ে শোচনীয় হয়ে পড়ে যখন ইহুদীরা বিদ্রোহ ঘোষণা করে (৭০ খ্রিঃ) এবং জেরুজালেম নগরী ধ্বংস করে। নিরো ডমিসিয়ান মার্কাস অরেলিয়াস প্রভৃতি রোমান সম্রাটরা ব্যক্তিগত ভাবে খ্রিস্টান বিদ্বেষী ছিলেন বলে তাদের সময় খ্রিস্টানরা সর্বাধিক নির্যাতন ভোগ করে। কিন্তু নির্যাতন সহ্য করেও তারা ধর্মে অবিচল ছিলেন বলে তা সকলের এমনকি খ্রিস্ট ধর্মের শত্রুদের মনেও বিস্ময়ের উদ্রেক করে। এ কারণেই দিন দিন এ ধর্মের অনুরাগীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়।

শেষ পর্যন্ত রোমান সম্রাটরা উপলব্ধি করতে সক্ষম হন যে খ্রিস্ট ধর্মকে আর কোন কিছুর দ্বারাই দমন করা সম্ভব হবে না । ৩১১ খ্রিস্টাব্দে পূর্ব রোমান সম্রাট গ্যালেরিয়াস খ্রিস্টানদের উপর নির্যাতন বন্ধ করার আদেশ দেন। দু'বছর পরে সম্রাট কন্সটার্নটাইন মিলানের নির্দেশের (৩১৩ খ্রিঃ) মাধ্যমে খ্রিস্টানদের ধর্মীয় অধিকার দান করেন। কিন্তু জেমস টেইলর ৩১৩ খ্রিঃ কন্সটানটাইন খ্রিস্ট ধর্মকে বৈধ রাষ্ট্রীয় ধর্ম হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন বলে উল্লেখ করেছেন।[১] কন্সটানটাইনই প্রথম রোমান সম্রাট যিনি নিজ সন্তানকে খ্রিস্ট ধর্ম শিক্ষা দিয়েছিলেন। (যদিও তিনি নিজে খ্রিস্ট ধর্ম-গ্রহণ করেননি) ৩৯৫ খ্রিঃ সম্রাট থিওডোমিয়াস খ্রিস্ট ধর্মকে রোমান সাম্রাজ্যের একমাত্র স্বীকৃত ধর্ম বলে ঘোষণা করেন।

মাত্র অল্পাধিক তিনশ বছরের মধ্যে সমস্ত প্রতিকূলতা সত্বেও খ্রিস্টধর্ম একটি বিশ্বধর্মরূপে স্বীকৃতি লাভ করে। খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর প্রথমার্থে রোমানদের ধর্মমন্দির গুলি ক্রমশঃ ভগ্নদশায় পতিত হয় এবং এ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে ইউরোপে রোমান ও অন্যান্য ধর্মের প্রচলন বল পূর্বক বন্ধ করা হয়।

গির্জা সংগঠনের উন্নয়ন ঃ

যীশু খ্রিস্টের মৃত্যুর পর খিস্টধর্মাবলম্বীদের সমন্বয়ে সংগঠন তৈরীর একটি প্রচেষ্টা গৃহিত হয়েছিল কিন্তু তা ফলপ্রসূ হয়নি। কারণ ধর্মান্তরিত নব্য খ্রিস্টানদের মধ্যে ধারণা ছিল যীশু পুনরায় প্রত্যাবর্তন করবেন। কিন্তু দীর্ঘ সময় অতিক্রন্ত হওয়ার পর এ প্রত্যাশা মানুষের মন থেকে তিরোহিত হয়। এ সময় খ্রিস্টান ধর্মগুরুরা খ্রিস্টান হিসেবে ঐক্যবদ্ধ থাকার প্রয়োজনে ধর্মীয় সংগঠন হিসেবে চার্জ বা গির্জা গড়ে তোলে। শুরুতে যাজক ও সাধারণ মানুষের মধ্যে তেমন পার্থক্য ছিল না। ধর্মীয় বাণী প্রচারের জন্য খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের মধ্যে ঘুরে বেড়াতেন যাজকরা। কিন্তু ধর্ম প্রচার ও নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে এ প্রচারণা ক্রমে অপ্রতুল মনে হতে থাকে। স্থির হয় ধর্ম বানী প্রচার, মানুষের সামনে প্রতিনিয়ত ধর্ম ব্যাখ্যা করা, ধর্ম প্রচারের প্রয়োজনে অর্থ সংগ্রহ করা এবং তা সংরক্ষণ করা, ধর্মীয় অনুষ্ঠান পরিচালনা করা এবং তা সংরক্ষণ করা, ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি পালন প্রভৃতির জন্য দরকার একটি সুনির্দিষ্ট সংগঠন। এ ধারণা থেকেই ক্রমে গির্জা বা গির্জা সংগঠন আত্মপ্রকাশ করে।

প্রাথমিক পর্যায়ে গির্জার বা গির্জার অধিকর্তাদের বয়োজেষ্ঠ বলা হত। আবার প্রেসবাইটার (Presbyter) অথবা বিশপ (Bishop) ও বলা হত। দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যেই ধর্মগুরুদের অবস্থান নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়। তখন

Dhaka University Institutional Repository

থেকে প্রেসবাইটার এবং অন্যান্য নিম্ন পদস্থ কর্মকর্তা, কর্মচারী ষ্টিওয়ার্ড (Stewards) এবং রেকর্ডারদের (Recorders) উপর অধিকার প্রয়োগ করতে পারত। আবার শহরে স্থাপিত প্রধান গির্জার নিয়ন্ত্রণে গ্রামে ছোট গির্জা স্থাপন করা হতো। বিশপ উপাধীধারী একজন পাদ্রী বা পুরোহিত এ গির্জা পরিচালনা করতেন। এভাবে 'ডায়োসিস' (Diocese) বা বিশপ নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলের সমুদয় গির্জার সম্পত্তি রক্ষনাবেক্ষণ করতেন এবং ধর্মগুরুর দায়িত্ব পালন করতেন।

কয়েকটি ডায়োসিসের সমন্বয়ে তৈরী হতো প্রদেশ। প্রদেশের গুরুত্বপূর্ণ শহরটির বিশপ হতেন সবচেয়ে বেশী মর্যাদাবান। তাঁকে অনুসরণ করতেন সবাই। ফলে গুরুত্বের বিবেচনায় এ বিশপকে সাধারণত বলা হতো আর্চবিশপ (Archbisop)। প্রদেশ সমূহের সমন্বয়ে একটি বৃহৎ প্রশাসনিক অঞ্চল গঠন করা হতো। এর নাম ছিল প্যাটিয়ার্কেট (Patriarchate) এমন বৃহৎ প্যাট্রিয়ার্কেট হিসেবে রোম, কন্সষ্টান্টিনোপাল ও আলেকজান্দ্রিয়ার নাম করা যেতে পারে। এ বিশাল শহরের বিশপ ছিলেন আরও বেশী মর্যাদাবান। তাই তাঁর পদের নাম দেয়া হয় প্যাট্রিয়ার্ক (Patriarch) । এভাবে গির্জা সমূহকে মর্যাদার বিচারে পৃথকভাবে চিহ্নিত করা হয়। যাজক পদের নামকরণ থেকে মনে করা হয় প্রশাসনের সাথে যাজক সম্প্রদায়ক সম্পৃক্ত করা হয়েছিল। যেমন প্যাট্রিয়ার্কেটের ধর্মগুরু প্যাটিয়ার্ক নামে পরিচিত হন।

বিবর্তনের ধারায় গির্জা সংগঠনটি রোমান সরকারের অনুরূপ মডেলের কাছে অনেকটা ঋণী। সংগঠন প্রতিষ্ঠায় খ্রিস্টানরা রোমান সাম্রাজ্যের প্রশাসনিক বিভাগকে নিজেদের জন্য ব্যবহার করেন। আর বিশপ উপাধি গ্রহণ করে মিনিউসিপালটির গুরুত্বপূর্ণ অফিস থেকে।

খ্রিস্ট ধর্মের আরাধনার রীতি ঃ

গির্জার প্রশাসনিক কাঠামো তৈরী হবার পর খ্রিস্টান ধর্ম মতকে সুস্পষ্টভাবে ব্যাখা এবং একটি নির্দিষ্ট ধর্মীয় আরাধনারীতি তৈরীর প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। ধর্মগুরুদের কাছে এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ছিল যে, বিশ্বব্যাপী খ্রিস্ট ধর্মকে ছড়িয়ে দেয়ার জন্য ব্যাখ্যা বিশ্লেষণসহ সুনির্দিষ্ট ধর্মতত্ব উপস্থাপন করা প্রয়োজন। যেখানে ব্যাখ্যা থাকবে যীশু খ্রিস্টের বাণী সমূহের এবং বিশ্বব্যাপী গির্জা সমূহের করণীয় কার্যক্রম। মানবাত্মার মুক্তির জন্য আরাধনা পদ্ধতি সম্পর্কেও বক্তব্য থাকবে। সাধু পলই প্রথম খ্রিস্টান ধর্মমতকে সুনির্দিষ্ট কাঠামোয় নিয়ে এসেছিলেন। তিনি যীশুর ঐশ্বরিক গুনাগুনের ব্যাখ্যা করেছিলেন এবং বলেছিলেন মানুষকে পাপমুক্ত করার জন্যই তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

ধর্মীয় মতবাদ তৈরী করাটা খুব সহজ ছিলনা। বিভিন্ন ব্যাখার প্রশ্নে ক্রমে মতবিরোধ দেখা দিল। এ বিতর্ক উঠেছিল আরিয়ান মতবাদের (Aryanism) সাথে। আরিয়ান বিতর্কের মূল বিষয় হচ্ছে খ্রিস্ট ধর্মের ত্রি-তত্ত্বর (Trinity) প্রশ্নে। অর্থাৎ পিতা-পুত্রে ও পবিত্র আত্মার বিষয়টি। এর একটি সত্ত্বা হিসেবে যীশুকে মনে করা হতো। অর্থাৎ একজন পিতা হিসেবে ঈশ্বর একজন পুত্র হিসেবে ঈশ্বর এবং পবিত্র আত্মা হিসেবে ঈশ্বর। একই সাথে ঈশ্বরকে পিতা, পুত্র ও সত্ত্বা হিসেবে ব্যাখ্যা করাকে আরিয়াস (Arius-256-336 A. D) তীব্র ভাষায় বিরোধীতা করেন। তিনি ছিলেন আলেকজান্দ্রিয়ার এক প্রেসবাইটার। তাঁর মতে জাগতিক সত্ত্বার অধিকারী যীশু ঈশ্বর হতে পারেন না। এ বিতর্ক ক্রমে ভয়ঙ্কর রূপ নেয়। অবশেষে সংকট মোচনের জন্য সম্রাট কনস্টান্টাইন ৩২৫ খ্রিস্টাব্দে নিকাইয়া (Nicaea) অঞ্চলে বিভিন্ন গির্জার ধর্মগুরুদের সমন্বয়ে একটি সম্মেলন আহবান করেন। কনস্টান্টাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সম্মেলনে আরিয়াসের দাবী গৃহীত হয়নি। গির্জা সমূহ যীশুকে ঈশ্বর ও ঈশ্বরপুত্র এ দুই সত্ত্বায় প্রতিষ্ঠিত করে। নিকাইয়া সম্মেলনে গৃহীত মতবাদ খ্রিস্টান ধর্মকে আরও সুক্ষ্ম ও জটিল করে তোলে।

Dhaka University Institutional Repository

প্রাথমিক গির্জা সংগঠনই খ্রিস্টানদের ধর্মগ্রন্থের সংকলন তৈরী সম্পন্ন করে। এখানে নিউ-টেস্টামেন্টের বিষয়বস্তু কিছুটা সংক্ষিপ্ত করা হয়। এ সংকলনটিই পরবর্তীকালে খ্রিস্টান বিশ্ব গ্রহণ করে। প্রথম যুগের গির্জার বা গির্জার প্রার্থনা পদ্ধতি খুব সরল ছিল। এতে অর্ন্তভূক্ত ছিল প্রার্থনা, বাইবেল পাঠ, ধর্ম সঙ্গীত গাওয়া এবং ধর্ম প্রচার করা। ধীরে ধীরে খ্রিস্টানদের মধ্যে গির্জার গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। ঈশ্বরের কাছে পৌছতে গির্জাই হচ্ছে মূল মাধ্যম এ বিশ্বাস সকল খ্রিস্টানেরই ছিল।

এ সময় গির্জা প্রশাসন পরিচালনার একটি কাঠামো তৈরী হয়, যা দ্বিতীয় থেকে পঞ্চম শতাব্দী পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। প্রশাসন মোটামুটি পুরোহিত তান্ত্রিক অর্থাৎ যাজকদের কর্তৃত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। মূল নেতৃত্বে থাকেন গির্জার প্রধান ধর্মগুরু 'ফাদার'। ফাদারদের অনেকেই ছিলেন সুশিক্ষিত। তারা নব্য প্লাটোনীয় বাদ, স্টোয়িকবাদ ও গ্রীক দর্শন-দ্বরা প্রভাবিত ছিলেন। তাই তাদের প্রচারিত ধর্মবাণীতে এর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। কারণ খ্রিস্টান ধর্মগুরু ও পন্ডিতদের মতে দর্শনের যুক্তি ঈশ্বরকে বুঝতে সাহায্য করে। খ্রিস্টানদের বিশ্বাস ছিল পৌত্তলিকদের (Pagan) ধর্ম ও দর্শনের চেয়ে খ্রিস্টান ধর্ম ও দর্শন অনেক বেশী উন্নত। ধর্মীয় রীতি ও পদ্ধতি পূনর্বিন্যাসে তিনজন বিখ্যাত যাজকের নাম উল্লেখ করা যায়। এ ক্ষেত্রে প্রথমেই যার নাম নিতে হয় তিনি সেন্ট জেরম (ST. Jerme 340-320 A.D)। তিনি ল্যাটিন ভাষায় বাইবেল অনুবাদ করেন। রোমান ক্যাথলিক গির্জা অদ্যাবধি এ অনুবাদ গ্রহণ করে আসছে। দ্বিতীয় ধর্মগুরু হচ্ছেন সেন্ট আমব্রোস (St. Ambrose-340-397 A.D) । তিনি উচ্চ পদের সরকারী চাকরী ছেড়ে মিলানের গির্জার বিশপ হয়েছিলেন। সাধু আমব্রোস পাদ্রীদের কর্ম পদ্ধতির একটি মডেল প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। শেষ ধর্মগুরু হচ্ছেন সেন্ট আগাস্টিন (St. Augustine 354-430. A. D) তিনি ছিলেন সবচেয়ে খ্যাতিমান পাদ্রী ও পন্ডিত।

৩২ বৎসর বয়সে সেন্ট আগাস্টিন 'Confessions' নামে গ্রন্থ লিখে খ্রিস্টান ধর্মের মূল তাৎপর্য ব্যাখা করেন। এ গ্রন্থটি বিশ্বে অধ্যাত্মিক আত্মজীবনী মূলক গ্রন্থ হিসেবে সবচেয়ে বেশী খ্যাতি অর্জন করেছে। এছাড়াও তিনি তাঁর জীবদ্দশায় শতাধীক ধর্মীয় গ্রন্থ ও প্রবন্ধ লিখেছেন । সেন্ট আগাস্টিনের রচনাসমূহ কে গির্জা ধর্মতত্ত্বের ভিত্তি হিসেবে স্বীকার করা হয়।[২]

পূর্বাঞ্চলের গীর্জা ঃ

সাম্রাজ্যের পূর্বাঞ্চলে পোপের আধিপত্যকে কেন্দ্র করে কন্সটান্টিনোপলের যাজকবৃন্দের মাঝে বিতর্কের সৃষ্টি হয়। চতুর্থ শতাব্দীর শেষভাগে রোম এবং কন্সটান্টিপলে এ বিতর্ক তীব্রতর হয়। খ্রিস্টান গির্জা গুলো দু'ভাবে বিভক্ত হয়ে যায়। পশ্চিমাগুলোর গির্জা তখন থেকে ক্যাথলিক গির্জা হিসেবে পরিচিতি লাভ করে এবং তারা পোপের কর্তৃত্বাধীনে থাকে। পূর্বাঞ্চলের গির্জাগুলো গ্রীক অর্থোডক্স (Orthodox) গির্জা হিসেবে বিবেচিত হয় এবং তারা কন্সটান্টিনোপলে অবস্থিত প্যাট্রিয়ার্ক (Patriarch) -এর অধীনতা স্বীকার করেন নেয়। গির্জাগুলোর বিভক্তির ফলে খ্রিস্টান সম্প্রদায় কার্যকারিতা হারায় এবং প্রয়োজনীয় মুহূর্তে পূর্ব ও পশ্চিম ইউরোপের মাঝে অর্থনৈতিক সহযোগীতার সম্ভাবনা হ্রাস পায়।[৩]

পোপ তন্ত্রের উৎপত্তি ঃ

প্রাথমিক ভাবে খ্রিস্ট ধর্ম যেরূপ সরল ও আড়ম্বরহীন ছিল তা আর রইল না। ধর্মানুষ্ঠান, উপাসনা, বিভিন্ন ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপ এর সাথে যুক্ত হয়ে একে জটিল ও আড়ম্বরপূর্ণ করে তুলল।

Dhaka University Institutional Repository

শিশুকে খ্রিস্ট ধর্মে দীক্ষাদান (Baptism), বিবাহ অনুষ্ঠান ও মৃতের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া প্রভৃতি ছাড়াও প্রাত্যহিক, সাপ্তাহিক, মাসিক ও বাৎসরিক বহু অনুষ্ঠানের কার্যপরিচালনার জন্য পুরোহিতের প্রয়োজন হয়। প্রথম দিকে একজন ধর্মযাজক গ্রামে গ্রামে লোককে ধর্মোপদেশ দান প্রভৃতি কার্যে ব্যাপৃত থাকতেন। কিন্তু ক্রমশঃ এসব ধর্মীয় কাজে গ্রামের গির্জার সার্বক্ষণিক পুরোহিতের উপর অর্পিত হয়। কালক্রমে গ্রামীণ গির্জাগুলি শহরের একটি গির্জার অধীনস্থ হয়ে পড়ে। শহরের গির্জার অধিকর্তার নাম প্রেসবাইটার (Presbyter)। তাঁরা আবার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ জেলা বা ডায়োসেস এবং বিশপের নিকট দায়ী থাকতেন। এ বিশপই ছিলেন তাঁর ডায়োসেসের সকল গির্জাভূক্ত সম্পত্তির মালিক, অধীনস্থ ধর্মযাজকদের উপর তাঁর কর্তৃত্ব বহাল থাকত। কয়েকটি ডায়োসেস জেলা একটি প্রাদেশিক গির্জার অধীনে ছিল। প্রাদেশিক গির্জার কর্মকর্তাকে বলা হত আর্চবিশপ। প্রদেশগুলি একত্রে আবার একটি প্যাট্রিয়ার্কেট (Patriarchate) গঠন করত। রোমান সাম্রাজ্যে এ রকম পাঁচটি প্যাট্রিয়ার্কেট ছিল, যথা রোম কনস্টান্টিনোপাল, আলেকজান্দ্রিয়া, জেরুজালেম ও অ্যান্টিওক।প্যাট্রিয়ার্কেট এর অধিকর্তা ছিলেন প্যাট্রিয়ার্ক এভাবে ধাপে ধাপে ক্রমশঃ নীচু থেকে উপর দিকে গড়ে উঠেছিল গির্জা বা গির্জা সংগঠন।

এখান থেকে পাঁচটি প্যাট্রিয়ার্কেট এর মধ্য থেকে একটি গির্জাকে সর্বোচ্চ সংস্থারূপে নির্বাচিত করা হয় এবং অধিকর্তাকে বলা হত পোপ। পোপ এর কার্য সংস্থার নাম প্যাপাসি (Papacy)।

পোপ ছিলেন খ্রিস্ট জগতের ধর্মগুরু সর্বোচ্চ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত। রোমান সম্রাটের মত ধর্মীয় ব্যাপারে তাঁরই ক্ষমতা ছিল সর্বশক্তি সম্পন্ন। ধর্মীয়নীতি ব্যাখ্যা ও বিধান দেয়ার একমাত্র কর্তা ছিলেন তিনি।

রোমান সাম্রাজ্যের পাঁচটি প্যাট্রিয়ার্কেট এর সময়ে সমমর্যাদা সম্পন্ন ছিলেন। কালক্রমে রোমের গির্জা সবার উপরে প্রধান্য বিস্তার করে এবং এর প্যাট্রিয়ার্ককে পোপ (Pope) বলে স্বীকার করে নেয়া হয়। (গ্রীক শব্দ পোপ এর অর্থ পিতা) পোপ তন্ত্র হচ্ছে পোপের কর্মসংস্থার নাম। রোমের গির্জার প্রধান্য অর্জনের পিছনে কয়েকটি কারণ ছিলঃ

প্রথমতঃ রোম ছিল রোমান সাম্রাজ্যের রাজধানী, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কেন্দ্রস্থল এবং একটি গৌরব উজ্জল ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক। স্বভাবতই রোমান গির্জার একটি বিশেষ গুরুত্ব ছিল।

দ্বিতীয়তঃ রোমের গির্জার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন যীশু খ্রিস্টের প্রধান সহায়ক সেন্ট পিটার। তিনি ও তাঁর পরবর্তী রোমের বিশপরা সকল নির্যাতন ও অত্যাচারের মুখে খ্রিস্ট ধর্মের পতাকা সমুন্নত রেখে ছিলেন।

তৃতীয়তঃ রোমের সেন্ট পিটার্স গির্জার বিশপ খ্রিস্ট ধর্ম প্রচার কার্যের নেতৃত্বভার গ্রহণ করেন। দুর্ধর্ষ বর্বরদের মধ্যে ধর্ম প্রচার করে তাদেরকে খ্রিস্ট ধর্মে দীক্ষিত করার সকল কৃতিত্ব তাদেরই প্রাপ্য।

দুর্ধর্ষ হুন নেতা এ্যাটিলাকে রোম আক্রমন থেকে বিরত রাখার কৃতিত্ব পোপ প্রথম লিও'র প্রাপ্য। পোপ মহান গ্রেগরী লম্বার্ডদের রোমনগরী আক্রমণ প্রতিহত করেন। তাঁর সময়ে সেন্ট আগাস্টিন ইংলন্ডে অ্যাংগল ও স্যাক্সনদের মধ্যে ধর্ম প্রচার করেন। পোপ মহান গ্রেগরী রোমের সামরিক ও পুলিশ বাহিনীর অধিনায়কত্ব গ্রহণ করেন। মুদ্রা জারী করা ফৌজদারী ও দেওয়ানী আদালত পরিচালনা, প্রাচীর নির্মাণ, স্কুল ও হাসপাতাল স্থাপনের গুরু দায়িত্ব তিনি সাফল্যের সাথে পালন করেন। রোমের গির্জা-প্রধানদের মিশনারী কার্যকলাপ তাদের মর্যাদাকে সবার উপরে প্রতিষ্ঠিত করেছিল।

একথা পূর্বেই বলা হয়েছে যে, আনুমানিক ৩১১ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট কনস্টান্টাইন খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণ করেন। ৩৯১ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট হিরোডোসিয়াস কর্তৃক রোমান সাম্রাজ্যের বৈধ ধর্মরূপে স্বীকৃত লাভ করে খ্রিস্ট ধর্ম। এ সাফল্য ইউরোপ জুড়ে ধর্মটি প্রসারের পথ প্রশস্ত করে। কিন্তু খ্রিস্ট ধর্মের ইতিহাসে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হচ্ছে প্রচন্ড অনিশ্চয়তা ও প্রতিকূলতার মধ্যেও রোমান গির্জা ও পোপের প্রধান নেতৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত হওয়া।

Dhaka University Institutional Repository

রোম ও রোমান বিশপের শ্রেষ্ঠত্ব লাভের মূলে ছিল যীশুর প্রধান শিষ্যদের মতবাদ। প্রথম দিকে বিশপদের মনে করা হতো যীশুর শিষ্যদের উত্তরসূরী। তাছাড়াও প্রথমদিকে লিখিতভাবে ধর্মগ্রন্থের অনুপস্থিতিতে বিশপরাই মৌখিকভাবে যীশুর উপদেশ বা সুসমাচার প্রচার করে আসছিলেন। এ কারণে বিশপদের পূণ্য ঐতিহ্যের বাহক মনে করা হতো। যদি কখনও যাজক সম্প্রদায়ের মধ্যে মতদ্বৈততা দেখা দিত। তখন তারা যীশুর প্রধান শিষ্যদের প্রতিষ্ঠিত বা তাদের স্মৃতি বিজড়িত ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে উপস্থিত হতেন। কারণ তাদের বিশ্বাস ছিল সেখানেই পাওয়া যাবে প্রকৃত সত্য। এর প্রকাশ দেখা যায় বিশপ ইরেনিয়াস (Ireneus) ও তারিতুল্লিয়ান (Taritullian)-এর বক্তব্য তাঁরা বলেন যে যীশু তাঁর শিষ্যদের কাছে যে সত্য উদঘাটিত করেছিলেন এবং প্রকৃত ধর্ম তার খোঁজ পাওয়া যাবে যীশুর প্রধান শিষ্যদের প্রতিষ্ঠিত গির্জা সমূহে। ইরেনিয়াস রোমান গির্জার শ্রেষ্ঠত্ব ও বিশপ পিটারের বিশেষ স্থানের কথা বলেছিলেন। রোমের যাজক সম্প্রদায় রোমের প্রধান্যের কারণ হিসেবে যীশু কর্তৃক পিটারের উপর বিশেষ আস্থা স্থাপন, রোমের গির্জার সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ যোগাযোগের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন।

৩৮১ খ্রিস্টাব্দে কনস্টান্টিনোপালে খ্রিস্টানদের একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন.
অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, কনস্টান্টিনোপলের বিশপের স্থান রোম বিশপের পূর্বেই নির্ধারিত হয়। তাই সম্মেলন থেকে পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যকে 'নতুন রোম' (গনং ছনলন) আখ্যা দেয়া হয়। এ সিদ্ধান্ত-বিতর্ক সৃষ্টি করে। পোপ প্রথম ড্যামাসাস (৩৬৬-৮৪ খ্রিঃ) উল্লেখিত সিদ্ধান্তকে অগ্রাহ্য করেন। তাঁর মতে রোমের শ্রেষ্ঠত্ব ও অন্যান্য অবস্থান কোন সম্মেলনে সিদ্ধান্ত দ্বারা নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। তাঁর মতে যীশু কর্তৃক পিটারকে দেয়া ক্ষমতাই প্রমাণ করে বিশ্বব্যাপী প্রধান্য রক্ষার ক্ষমতা একমাত্র রোমান গির্জার। এ মত সমর্থন করেন পোপ বেনিকেস (৪১৮-২২ খ্রিঃ)। পোপ লিওর সময়ে খ্রিস্টান জগতে পোপের স্থান সম্পর্কে এ মতবাদ চালু হয় যে পোপকে অস্বীকার করার অর্থ হচ্ছে পিটারকে অস্বীকার করা, আর পিটার কে অস্বীকার করার অর্থ যীশুকে অস্বীকার করা। তথাপি দেখা যায় সমস্ত খ্রিস্টান জগতে এককথার শুরু থেকেই পোপের উপর পূর্ণ আনুগত্য প্রদর্শন করেনি। পোপের কর্তৃত্ব মানতে বিশেষ করে কুণ্ঠিত ছিল এন্টিয়োক, আলেকজান্দ্রিয়া ও কনস্টান্টিনোপালের বিশপরা। বাইজানটাইন সম্রাট জাস্টিনিয়ান গির্জাকে সম্পূর্ণ সম্রাটের নিয়ন্ত্রণে রাখতে চেয়েছিলেন। এ নীতি নির্ধারণ রোমান গির্জা ও পোপের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠায় বাধা স্বরূপ ছিল। সম্রাট জাস্টিনিয়ানের নীতি নির্ধারণ সাফল্য লাভ না করায় পোপের পক্ষে সম্ভব হয়েছিল নিজ ক্ষমতাকে প্রতিষ্ঠিত করা।

পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীর বর্বর আক্রমণ সভ্যতার ইতিহাসের গতি নিয়ন্ত্রণে বিশেষ ভূমিকা রাখে। বর্বর আক্রমনের প্রতিক্রিয়ায় রোমান সাম্রাজ্যের পূর্বে ও পশ্চিমাংশের মধ্যে বিভেদ স্পষ্ট হয়। এ স্পষ্টতা বৃদ্ধি পায় সপ্তম শতাব্দীতে। এ সময় ক্রমাগত মুসলিম অভিযান এন্টিয়ক, আলেকজান্দ্রিয়া ও জেরুজালেমের ধর্মকেন্দ্রগুলোর কর্মতৎপরতা প্রায় বন্ধ করে দেয়। এরপর দু'টো কেন্দ্রই অবশিষ্ট থাকে খ্রিস্ট ধর্ম প্রচারের জন্য এর একটি রোম, অন্যটি কনস্টান্টিনোপাল।

পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্য ধ্বংস হওয়ার পর গুরুত্ব বৃদ্ধি পায় কনস্টান্টিনোপলের, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নতুন মাত্রা যুক্ত হয় ষষ্ঠ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে। এ সময় জাস্টিনিয়ান ইতালির কিছু অংশ জয় করে নেন। অধিকৃত অঞ্চলের রাজধানী হয় র‍্যাভেনা। এসময় পোপ নির্বাচিত হন বেশ ক'জন গ্রীক। তখন ও পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যের সাথে পোপের একটি সম্পর্ক ছিল। কিন্তু বর্বর আক্রমণ ও আভ্যন্তরীন নীতি নির্ধারণের দ্বন্দ্ব এ সম্পর্কে ফাটল ধরায়।

আগেই বলা হয়েছে বর্বর আক্রমনে ইউরোপের সমাজ জীবনে বিরাট পরিবর্তন আসে। এ সময় রোমে যে রাজনৈতিক বিপর্যয় আসে তার সবটুকু সুযোগ গ্রহণ করেন পোপ। ক্ষমতায় দক্ষ শাসক না থাকলে রোমের ধ্রুপদী সংস্কৃতি ও খ্রিস্ট ধর্মকে রক্ষার দায়িত্ব অর্পিত হয় পোপের উপর। অর্থাৎ মানুষের শেষ আশার স্থল হিসেবে পোপই বিবেচিত হন। অনগ্রসরমান বর্বরদের চোখে রোমের উন্নত সংস্কৃতি ও ধর্মের একটি বিশেষ আকর্ষণ ছিল। এ জন্যই

Dhaka University Institutional Repository

বর্বর গোত্র ফ্রাংক ও এ্যাঙ্গলো-স্যাক্সনরা দ্রুত খ্রিস্ট ধর্মে দীক্ষিত হয়। ধ্বংসোম্মুখ পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যে যখন রাষ্ট্র ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়েছিল, তখন ধর্মীয় নেতৃত্বের পাশাপাশি প্রশাসন পরিচালনার দায়িত্ব ও গ্রহণ করে যাজক সম্প্রদায় পোপতন্ত্রকে শক্তিশালী অবস্থায় এনে দাড় করাতে এ পোপগনের বিশেষ অবদান রয়েছে। পোপ প্রথম গ্রেগরি বা মহান গ্রেগরি (৫৯০-৬০৪খ্রি:) এদিক থেকে উজ্জল হয়ে আছেন ইতিহাসের পাতায়।[৪]

সন্ন্যাসবাদ বা মঠতন্ত্র ঃ

খ্রিস্টীয় যাজকতন্ত্রের পাশাপাশি আরেকটি সংগঠন মধ্যযুগে ইউরোপে ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছিল। এটা ছিল সন্ন্যাসীদের সংঘ বা মঠ। গির্জা ও মঠ এ দু'টি প্রতিষ্ঠান মধ্যযুগে খ্রিস্টধর্মের প্রচার ও প্রসারে ব্যাপকভাবে সাহায্য করেছিল।

সন্ন্যাসীদের জীবন যাপন, পদ্ধতিকে বলা হত সন্ন্যাসবাদ (monasticism)। এটা একটা জীবনদর্শন ও বটে। সন্ন্যাসীরা পৃথিবীর যাবতীয় সুখ সম্ভোগ ও ভোগবিলাসের জীবন পরিত্যাগ করে বনে জঙ্গলে, পাহাড়ের গুহায় বা নির্জন প্রান্তরে একাকী ঈশ্বরের চিন্তায় নিজেদের নিমগ্ন রাখতো। সন্ন্যাসবাদের প্রচলন ইতিপূর্বে ভারতবর্ষ, চীন ও মিশরে দেখা গেলেও ইউরোপে খ্রিস্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর পূর্বে এর আবির্ভাব ঘটেনি।

যীশু খ্রিস্টের বাণীও সন্ন্যাসবাদের উৎপত্তিতে যথেষ্ট অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে। খ্রিস্ট ধর্মের নিংসঙ্গ জীবনকে গার্হস্থ্য জীবন অপেক্ষা অধিকতর গ্রহণযোগ্য বলে মনে করা হয়েছে । আবার দরিদ্র ব্যক্তিকে ধনবান ব্যক্তির তুলনায় ঈশ্বরের কাছে অধিকতর প্রিয় বলে চিহ্নিত করা হয়েছে।

কাজেই কিছু পার্থিব, যা কিছু বস্তুজগতের সাথে সম্পর্কিত, সবকিছু বর্জন করে শুধুমাত্র ঈশ্বর চিন্তার মনোনিবেশ করা এবং সে সাথে আত্মার পরিশুদ্ধি লাভ করাই সর্বোত্তম পন্থারূপে বিবেচিত হয়েছিল।

প্রাথমিক যুগের খ্রিস্টানরা সবাই প্রায় সন্ন্যাসীদের মত জীবন যাপন করতেন। যীশুখ্রিস্ট ও তাঁর অনুসারীরা যাবতীয় ভোগবিলাস ত্যাগ করে অতি সরল ও অনাড়ম্বর জীবন যাপন করে গেছেন। কিন্তু সন্ন্যাসবাদের প্রাথমিক পর্বে আমরা যেসব সন্ন্যাসীদের সাক্ষাৎ পাই তার সবাই অত্যন্ত বর্বর পন্থায় নিতান্ত অমানুষিক উপায়ে নিজ দেহের উপর নির্যাতন চালিয়েছেন। এ ধরণের সন্ন্যাসীদের বলা হত যোগী সন্ন্যাসী (Hermit) বা Anchorite । আত্মার পরিশুদ্ধি অর্জনের জন্য এরা নানা রকম অদ্ভুদ পদ্ধতিতে নিজ দেহকে নির্যাতন করত ।[৫]

দেহকে অযথা কষ্ট না দিয়ে নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে জীবন যাপন করাই শ্রেয় এ ধারণার বশবর্তী হয়ে পরবর্তী সন্ন্যাসীরা একটি সংঘবদ্ধ জীবনযাপনে প্রয়াসী হন। এ সকল সন্ন্যাসীরাই ছিলেন প্রকৃত সন্ন্যাসবাদের এবং মটতন্ত্রের জম্মদাতা। এদের বলা হত সিনোবাইট (Cenobite) বা Monk[৬]

সন্ন্যাসীদের প্রাথমিকভাবে তিনটি প্রতিজ্ঞা নিতে হত (ক) দারিদ্র পালন অর্থাৎ কেউ কোন সম্পত্তির মালিক হতে পারবেনা, (খ) সতীত্ববান অর্থাৎ বিবাহিত জীবনযাপন করবতে পারবে না, এবং (গ) প্রার্থনাও উপাসনা। যেহেতু সবাই সন্ন্যাস জীবনের জন্য উপযুক্ত নয় সেহেতু সন্ন্যাসীদের দু'বছরের জন্য প্রাথমিক নির্বাচনী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হত। যারা সসম্মানে এ প্রশিক্ষণ পর্ব সমাপ্ত করতে পারত শুধু তারাই এ সংঘ জীবনে প্রবেশ করতে পারত। এ সংঘ জীবন ছিল অত্যন্ত কঠোর।

প্রাথমিক যুগে সংঘ বা মঠগুলি অত্যন্ত অল্প পরিসরে গড়ে উঠলেও কালক্রমে এগুলি বিরাট ভূখন্ডের মালিক হয়ে পড়ে। বহু ধনী ব্যক্তি এবং পরবর্তী কালে রাজা মহারাজা ও সামন্ত প্রভূরা পূণ্য লাভের উদ্দেশ্যে গির্জা ও মঠগুলিকে প্রচুর ভূমি দান করেন। মঠের সম্পত্তি বলে বিবেচিত এসব জমি থেকে লব্ধ সম্পদ মঠের সন্ন্যাসীরাই

ভোগ করত। সন্ন্যাসীরা নিজের হাতে জমি চাষ করত, সেচের ব্যবস্থা করত, বীজ বুনত ও ফসল ফলাত। কিভাবে উৎকৃষ্ট রূপে ভূমি চাষ করে উন্নত বীজ ও উন্নত সেচের সাহায্যে অধিক ফসল বোনা যায়, প্রতি নিয়তই তারা সে প্রচেষ্টা চালাত। কাপড় ও উল বুনন, কাঠের কাজ, ধাতুর কাজ ইত্যাদি বিষয়ে তারা শিক্ষালাভ করছিল। ফলে সুন্দর সুন্দর বস্ত্র ও ধাতব দ্রব্য তারা নির্মাণ করত। প্রচুর সম্পদের মালিক হওয়ার ফলে সন্ন্যাসীদের জীবন আর পূর্বের মত সরল অনাড়ম্বর রইলনা। ক্রমশঃ ভোগবিলাস ও পার্থিব সম্পদে তারা লিপ্ত হয়ে পড়ল। তা সত্ত্বেও ইউরোপীয় সভ্যতার ক্ষেত্রে ও মঠগুলির গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

মধ্যযুগের অচল অর্থনৈতিক জীবনকে সচল রাখার অনেকখানি দায়িত্ব তারা বহন করেছিল। খাদ্য সংরক্ষণ, খাদ্য পরিবহণ, বাজারজাতকরণ ছাড়াও বিভিন্ন অর্থনৈতিক কার্যকলাপ তারা নিতান্ত প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও চালিয়ে গেছে। সন্ন্যাসীরা জ্ঞানচর্চা এবং জ্ঞান দানকে তাদের আবশ্যকীয় কর্তব্যরূপে পালন করত। তারা স্কুল ও বিদ্যাপিঠ স্থাপন করেছে। কেবল ধর্মজ্ঞান হলেও, জ্ঞানের আলোকশিখা যে অন্ধকার যুগে একমাত্র মঠগুলিই প্রজ্জ্বলিত করেছে। সন্ন্যাসীরা অত্যন্ত অভিনিবেশ সহকারে প্রাচীন মূল্যবান দলিলপত্র ও গ্রন্থসমূহের অনুলিপি রচনা করেছে। যদিও অনেক ক্ষেত্রেই এগুলির বিষয় বস্তু সম্পর্কে তারা একেবারেই অজ্ঞ ছিল। এ সকল দলিল সংরক্ষিত না হলে মধ্যযুগের ইতিহাস রচনাই সম্ভব হত না।

ধর্মীয় ক্ষেত্রে গির্জার পাশাপাশি মঠগুলিকে খ্রিস্ট ধর্মের প্রসার ও প্রচারে ব্যাপক ভাবে সাহায্য করেছে পোপের আনুকূল্য লাভের ফলে গির্জা সংগঠন গুলির সাথে তারা একটি সোহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলেছিল।

সর্বোপরি অনাথকে আশ্রয়দান, অসহায়কে আশ্রয়দান অসহায়কে সাহায্য দান, দুঃস্থ, বৃদ্ধ ও রোগীর পরিচর্যা প্রভৃতি জনকল্যাণমূলক কাজের জন্য মধ্যযুগের প্রথম দিকের চরম দূর্গতির দিনগুলিতে মঠগুলিই ছিল সাধারণ মানুষের একমাত্র ভরসাস্থল।

কিন্তু একথা অপ্রিয় হলেও সত্য যে এ সকল গুণাগুন থাকা সত্ত্বেও মধ্যযুগের মঠগুলি একে বারে ত্রুটিমুক্ত ছিলনা।

প্রথমতঃ সন্ন্যাসীদের নিঃস্বার্থ কাজ গুলি পুরোপুরি নিঃস্বার্থ ছিলনা। তাদের সর্বাধিক কাজের পশ্চাতে একটি মাত্র লক্ষ্য ছিল পূণ্য অর্জন করা। কাজেই মানবতার জন্য তারা আত্মউৎসর্গ করত এ কথা ভাবা নিতান্ত ভুল।

সবচেয়ে ক্ষতিকর দিক ছিল যে সন্ন্যাসীরা ছিল প্রচন্ড ধর্মোম্মাদ। খ্রিস্ট ধর্ম বিরোধী কোন কিছুই তারা সহ্য করতে পারত না বটে উপরন্তু তা দমন করার জন্য সবচেয়ে নির্মম পদ্ধতির আশ্রয় নিত। পৌত্তলিক গ্রীক ও রোমান সভ্যতার সাথে সংযুক্ত সবকিছুই তাদের কাছে ছিল অসহনীয়। যুক্তি ও বাস্তবতা থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন সন্ন্যাসীরা গ্রেকো-রোমান সাহিত্য, সংস্কৃতি, শিল্পকলা, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি সব কিছুতে নির্মম ভাবে মুছে ফেলার চেষ্টা করত।

এসব অসহিষ্ণু সন্ন্যাসীরা গ্রীক ও রোমান ধর্মমন্দির গুলি ধ্বংস করেছে, প্রাচীন শিল্পকালার অনুপম নিদর্শন গুলি বিনষ্ট করেছে, আলেকজান্দ্রিয়ায় বিখ্যাত গ্রন্থাগারে অগ্নিসংযোগ করেছে, জ্ঞানী ব্যক্তিদের বিতাড়িত করেছে এবং চিরায়ত সাহিত্য গুলির উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। এদের হাতেই আলেকজান্দ্রিয়ার বিখ্যাত গণিতবিদ হাইপোসিয়া নির্মমভাবে নিহত হন (৪১৫ খ্রিঃ)।

খ্রিস্ট ধর্ম এবং শ্রেণী বিভাগ ঃ

খ্রিস্টীয় ধর্ম (Christianity) ঃ যীশু খ্রিস্টের শিক্ষাদানের উপর নির্ভরশীল যাবতীয় ধর্মীয় মতবাদ খ্রিস্ট ধর্ম নামে পরিচিত। এরূপ মতবাদী বিশ্বাসীগণ খ্রিস্টান নামে অভিহিত ।

Dhaka University Institutional Repository

রোমান ক্যাথলিক ধর্মসমাজ, নিষ্ঠাবান প্রাচ্য গির্জা (অর্থোডক্স ইস্টার্ন গির্জা) প্রভৃতি 'ঐতিহ্যবাহী' খ্রিস্টীয় সমাজ আদি কালের ধর্মমত, আচার ও অনুষ্ঠান সমূহের রীতিমতভাবে সম্প্রসারিত ও উন্নত করে অনুসরণ করেন বলে দাবি করেন।

অপরদিকে 'সংস্কারকৃত' (Reformed) ধর্মযাজক বৃন্দ প্রটেস্ট্যান্টরা (Protestantizm) দাবী করেন যে তারা যাবতীয় মিথ্যা সংযোজন ও উদ্ভাবন বাদ দিয়ে আদি খ্রিস্টীয় মতবাদ ও ধরণ ধারনাসমূহকে পূনঃ প্রতিষ্ঠা করেছেন। প্রারম্ভ হতেই খ্রিস্ট ধর্মে অত্যাধিক সংগঠনশীলতার প্রবণতা দৃষ্ট হয়। এ প্রবণতা দু'প্রকার বিরূপতা সৃষ্টি করে -রোমান সম্রাটরা মাঝে মাঝেই খ্রিস্টানদেরকে উৎপীড়ন করেন এবং অন্যদিকে খ্রিস্টীয় সমাজের মধ্যেই নানাবিধ পার্থক্য নিয়ে বিরোধের সংগ্রাম শুরু হয়। ১ম কন্সটানটীন (রোমান সম্রাট)‾ সহনশীলতার নীতি ঘোষণা করলে সরকারী উৎপীড়ন হ্রাস পায়। আদিকালের আভ্যন্তরিণ পার্থক্যগুলি কেন্দ্রীভূত ছিল খ্রিস্টীয় ত্রিত্ববাদের অন্তর্ভূক্ত অপর সত্ত্বাদ্বয়ের সম্পর্কে খ্রিস্টের প্রকৃতি সম্বন্ধে তর্ক বিতর্কের উপর। এ সকল প্রশ্নের মীমাংসার জন্য কাউন্সিল (পরিষদ) আহুত হত। গৃহীত উত্তরগুলি নিষ্ঠাবান (Orthodox)-দের অভিমত এবং পরিত্যাক্ত উত্তর গুলো ধর্মমত বিরোধী (Heretical) বলে বিবেচিত হত। প্রথম বিরোধী মতগুলোর মধ্যে ছিল অ্যারিয়ানবাদ (Arianizm), নেসটোরীয়বাদ (Nestorianizm) এবং একক প্রকৃতিবাদ (Ronophysitizm) আদিকালের কাউন্সিল গুলোর মধ্যে নাইসিয়ার কাউন্সিল (৩২৫) সম্ভবত ঃ সর্বাধিক খ্যাত ছিল। প্রাচ্যে বাইজানটাইন সম্রাটরা গির্জা বা খ্রিস্টীয় ধর্মসমাজের উপর অধিক পরিমানে নিয়ন্ত্রন প্রয়োগ করতেন, অন্যদিকে পাশ্চাত্যে পোপের শক্তি বর্ধিত হয়। উভয় কেন্দ্র হতে খ্রিস্টীয় ধর্ম সম্পসারিত হয় এবং পরিশেষে ইহা ইউরোপের সর্বত্রই প্রচারিত হয়। খ্রিস্টীয় সাধুরা প্যাগান বা হীন ধর্মাবলম্বীদের ধর্মান্তরন সম্পর্কীয় মিশনারী কার্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। ইসলামের অভ্যুদয়ের পূর্ব পর্যন্ত এশিয়া মাইনর ও উঃ আফ্রিকাতেও খ্রিস্টধর্মই প্রধান ধর্ম ছিল। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য খ্রিস্টানদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা ধীরে ধীরে গড়ে উঠে এবং ১০৫৪ এর পর ইহা স্থায়ী রূপ লাভ করে। উভয় অঞ্চলেই খ্রিস্টধর্মের বিকাশে প্রধান ধারার মধ্যে ছিল ধর্মনিরপেক্ষ ও রাজকীয় কর্তৃপক্ষের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব। ঐতিহাসিক 'Reformation' বা ধর্মসংস্কার উপস্থিত হলে তাই খ্রিস্ট ধর্মের আদিকাল হতে তৎকাল পর্যন্ত সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ একক ধর্মীয় আন্দোলন বলে স্বীকৃত হয়। খ্রিস্ট ধর্মের বহু সম্প্রদায়ের সঙ্গে ইহা একটি নতুন সংযোজনরূপে দেখা দেয়। আধুনিক খ্রিস্ট ধর্মের নতুন বৈশিষ্ট্যের অন্তর্ভূক্ত রয়েছে বিভিন্ন ধর্মীয় দলের মধ্যে মতবিরোধী মতানৈক্যের সম্মিলন প্রচেষ্টা এবং রাষ্ট্র ধর্মের মধ্যে স্থায়ী ও যুক্তি সংগত সম্পর্ক স্থাপনের জন্য সংগ্রাম। খ্রিস্টান ধর্মীয় সম্প্রদায় গুলোর মধ্যে ক্যাথলিক অ্যাপাসটালিক গির্জার অনুসারীরা উল্লেখ্যযোগ্য। এডওয়ার্ড আর্ভিং কর্তৃক ইংল্যান্ডে প্রতিষ্ঠিত (আনু ঃ ১৮৩১) এ ধর্মীয় সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠাতা আভিংয়ের নামানুসারে আভিংপন্থি নামে পরিচিত। প্রতীক বাদ, রহস্য ও খ্রিস্টের দ্বিতীয়বার আগমনের উপর জোর দেওয়া এ সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য।

ইউরোপে তুর্কীদের অগ্রগতি বিশেষতঃ হাংগেরীর রাজা সিগিসামানড-এর পরাজয়ে (১৩৯২) আতংকিত হয়ে পোপ নবম বনিফেস তুর্কীদের বিরুদ্ধে ক্রুসেড ঘোষণা করেন। এ ক্রুসেড ক্যাথলিক ক্রুসেড নামেও পরিচিত। ফ্রান্স জার্মান রোডস ও স্টাইরিয়ার ক্যাথলিকেরা এতে যোগদান করে। বুলগেরিয়া ও অলেকিয়ার স্লাভরা তাদের সাথে যোগ দেয়। এরা একটা সম্প্রদায়রূপেও পরিচিত।

বহু খ্রিস্টান সম্প্রদায় কর্তৃক অনুসৃত সার্বজনীন খ্রিস্টীয় ধর্মমত। ইংল্যান্ডের প্রাক সংস্কার যুগের খ্রিস্টান নিষ্ঠাবান সম্প্রদায়, সংস্কারোত্তর যুগের রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায় এবং কখনও কখনও নিষ্ঠাবান প্রাচ্যদেশীয় খ্রিস্ট ধর্মের সম্প্রদায় খ্রিস্টধর্মের সম্প্রদায় গুলোর মধ্যে অন্যতম।

Dhaka University Institutional Repository

ক্যাথলিক ধর্ম সংস্কার ঃ

১৬শ শতকে রোমান ক্যাথলিক ধর্ম সম্প্রদায়ের (গির্জা) আভ্যন্তরিণ সংস্কার শুরু হয় । প্রটেস্টান্টরা প্রায়ই ইহাকে প্রতিসংস্কার বলে থাকেন, কিন্তু ক্যাথলিকরা ইহাতে আপত্তি করেন এ জন্য যে, রেফরম্যাশন প্রথম গুড়গুড় ধ্বনি উচ্চারিত হওয়ার পূর্বেই ধর্ম সমাজের অভ্যন্তরে সংস্কার কার্য শুরু করে। প্রাচীন গির্জা সংগঠনকে উৎখাত করার লক্ষ্য নিয়ে উদ্ভূত প্রটষ্টান্টবাদ, আর সংগঠনের অভ্যন্তর হতে দূর্নীতি দূরীকরণের লক্ষ্যে নিয়ে উদ্ভূত প্রতি সংস্কার এ দুটি আন্দোলন স্বতন্ত্র ব্যাপার। দূর্নীতি ছিল প্রধানত অর্থের বিনিময়ে গির্জার পদ ক্রয় বিক্রয় বৈষয়িকতা, উর্ধ্বতন যাজকদের মধ্যে দূর্নীতি, নিম্নতম যাজকদের অজ্ঞতা এবং মূলনীতি গত ব্যাপারে, বিশ্বাসীদের কল্যাণের প্রতি সাধারণ উপেক্ষা। ১৪শ শতকে সীত্রনার সেন্ট ক্যাথরিন ও অন্যান্য ব্যক্তিত্ব এ সমস্ত দুর্নীতির বিরুদ্ধে বিক্ষুদ্ধ হয়ে উঠেন। কিন্তু গির্জার অভ্যন্তরে বিরোধী রাজাও প্রিন্সদের প্রাধান্য এবং প্রতাপশালী বিশপদের কর্মরত তৎপরতার দরুন সংস্কার কার্য ব্যবহৃত হয়। রেনেসাঁস-এর -স্রোতে পোপের দরবারে বৈষয়িক দুর্নীতি ও শিল্পাড়ম্বর প্রচেষ্টা শুরু করে। ১৫শ' শতকের শেষ ভাগে কার্ডিন্যাল ফারাকা ও কার্ডিন্যাল ক্যাজিটানের উদ্যোগ রোমে একটি ক্ষুদ্র দল সংস্কার প্রচেষ্টা শুরু করেন। ৫ম ল্যাটারান কাউন্সিলের ব্যর্থতার ফলে রিফ,রমেশনের ঝড় হ্রাস পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এদিককার সংস্কারকদের সংখ্যাও বাড়তে থাকে। সম্রাট ৫ম চার্লস কেবলমাত্র উৎসাহ দান করেই নয়, বরং নিজের সৈন্য দ্বারা রোম নগর লুণ্ঠন করে (১৫২৭) সংস্কারে সাহায্য করেন। তার এ কার্যে আত্মতুষ্ট কার্ডিন্যালরাও বিচলিত হয়ে পড়েন। ১৫৩৪ খ্রিঃ ৩য় পল পোপ নির্বাচিত হন। সেন্ট ইগনেশান অব লইডলা ও সোসাইটি অব জীসাস তাদের কাজ শুরু করে। ১৫৪৫ খ্রিঃ আহত ট্রেন্ট কাউন্সিল ২য় পল, ২য় জুলিয়াস ও ৪র্থ পাইয়াসের নেতৃত্বে সংস্কার কার্যের প্রধান উদ্যোক্তা ছিল। ৪র্থ পক্রন পোপতন্ত্রেরই সংস্কার সাধন করেন এবং একটি অর্ধ সন্ন্যাসশ্রম পদ্ধতি প্রবর্তন করেন। এ পদ্ধতিই বর্তমান কাল পর্যন্ত ভ্যাটিকানে অব্যাহত রয়েছে। ১৫৫৬ খ্রিঃ কাউন্সিলের পরিসমাপ্তি ঘটলে ৫ম সেন্ট পাইয়াস, ১৩শ গ্রেগরি এবং ৫ম সিবসটাস উহার সাফল্যকে সুসংহত করেন। যাজকীয় ক্রয় বিক্রয়ের মূল্যাচ্ছেদ হয়, আদর্শ উপাসনা পদ্ধতি নির্ধারিত হয়, ধর্ম সমাজের পরিচালন ব্যবস্থা পূণঃর্গঠিত হয়, পাদরীদের প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত যোগ্যতা নির্ধারিত হয় এবং বিশপদের নৈতিক জীবন সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের ব্যবস্থা করা হয়। এ নব উদ্যমে কাজ করে ধর্ম সমাজে যারা স্মরণীয় হয়ে রয়েছেন তন্মধ্যে কতিপয় হলেন ঃ সেন্ট চার্লস বরোমীও, সেন্ট ফিলিপ নেরি, সেন্ট টেরীসা অব আভীলা ও সেন্ট জন অব দি ক্রস (স্পেন), সেন্ট ফ্রানসিস অব সোলস ও সেন্ট ভিনসেন্ট দ্যা পল (ফ্রান্স) এবং ইংল্যাণ্ডে জেসুইস্ট মিশনারিরা (যেমন ঃ এডমান্ড ক্যামপিঅ রবার্ট পারসনস)

৮ম হেনরির সময় হতে সূচিত ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের রোমান ক্যাথলিকদের নাগরিকত্বের পক্ষে অন্তরায় অপসারণের জন্য সংগঠিত আন্দোলনের নামস ক্যাথলিক মুক্তি আন্দোলন। রোমান ক্যাথলিকদের নাগরিকত্ব দানের প্রথম পর্যায়ের আলোচনার ফলে প্রটেস্টান্ট আধিপত্য বিপন্ন হয়। ডানিয়েল ও কর্নেলের নেতৃত্বে পরিচালিত ক্রমবর্ধমান আন্দোলনের ফলে ১৮২৯ খ্রিঃ ক্যাথলিক মুক্তি আন্দোলন পাস হয়। অবশিষ্ট ধারা বিঘ্নের অধিকাংশ ১৮৬৬, ১৮৯১ ও ১৯২৬ অপসারিত হয়। 'সেটেলমেন্ট আইন' অনুযায়ী অদ্যাবধি রোমান ক্যাথলিকরা ব্রিটিশ রাজসিংহাসন, বিশেষ বিশেষ সরকারী ও ধর্মীয় পদ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে কতিপয় বিশিষ্ট মর্যাদা লাভের অধিকারে বঞ্চিত হয়েছেন।

প্রটেস্টান্ট ঃ

গোড়ার দিকে (খ্রিস্ট ধর্ম বিভক্ত হয়ে যখন প্রটেষ্টান্ট শাখার উদ্ভব হয়) প্রটেষ্টান্ট (Protestant) শব্দটি দ্বারা এমন ব্যক্তিকে বুঝাতো যিনি ক্যাথলিক মন্ডলীর ভুল ত্রুটির বিরুদ্ধে প্রটেষ্ট (Protest) বা প্রতিবাদ করেন। ১৫১৭ খ্রিঃ জার্মানীর আগাষ্টিনিয়ান যাজক সংঘের ফাদার মার্টিন লুথার তৎকালীন রোমান ক্যাথলিক মণ্ডলীর কিছু

Dhaka University Institutional Repository
কিছু ভুল ত্রুটি ও অন্যান্য নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ পূর্বক কর্তৃপক্ষের কাছে মন্ডলীর সংস্কার সাধনের আহ্বান জানায়। এসময় অর্থাৎ ষোড়শ শতাব্দীতে ক্যাথলিক ও মন্ডলীর নেতৃবর্গ উচ্চাকাংখা, ইন্দ্রিয়পরায়ণতা এবং ধন সম্পদের মোহে বিভিন্ন অপকর্মে লিপ্ত হয়ে পড়েন। বিশেষতঃ সে সময়ে সাধু পিতরের মহামন্দিরের নির্মাণ কাজে সাহায্যের নামে মুক্তিপন বিক্রির যে ব্যবসা শুরু হয় তার বিরুদ্ধে তিনি তীব্র প্রতিবাদ জানান।

মার্টিন লুথার ১৫১৭ খ্রিঃ মন্ডলীর বিভিন্ন অনাচারের বিরুদ্ধে ৯৫টি ধারা সম্বলিত এক প্রতিবাদ পত্র জার্মানীর ইউটেনবার্গের গির্জার দরজায় টাঙ্গিয়ে দেন। তাঁর প্রতিবাদের ফলে যে নতুন ধর্মতত্ত্বের সৃষ্টি হয় তা 'প্রটেষ্টান্টইজম' (Protestintizm) বলে পরিচিত।

মন্ডলী কর্তৃপক্ষ সংস্কার সাধনের পরিবর্তে মার্টিন লুথার ও তাঁর অনুসারীদের স্তব্ধ করে দিতে উদ্যত হন। এর ফলে মন্ডলীতে বিভেদ সৃষ্টি হয় এবং লুথারসহ সংস্কার আন্দোলনকারীদেরকে ক্যাথলিক মন্ডলীচ্যুত করা হয়। এ সংস্কার আন্দোলন (Reformation Movement) থেকেই পরবর্তী কালে বিভিন্ন দেশে তিনশরও অধিক প্রটেষ্টান্ট দল ও উপদলের সৃষ্টি হয়। এদের প্রধান প্রধান দলগুলোর মধ্যে আছে - লুথেরান, প্রেসবাইটারিয়ান, এঙ্গলিকান, মেথডিস্ট, ব্যাপ্টিস্ট ইত্যাদি। (রোমান ক্যাথলিকদের বিপরীতে প্রটেস্টান্টদের কতিপয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে)ঃ (১) মানুষের যোগ্যতা বিচার না করে তাদের বিশ্বাস দেখে ঈশ্বর তাদের কৃপা করেন, (২) মানুষের আধ্যাত্মিক পরিচালনার জন্য বাইবেলই যথেষ্ট, অন্য কিছুর প্রয়োজন নেই, তাই তারা তাদের মন্ডলীগুলোতে পোপ সম্প্রদায়ের কর্তৃত্বের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে না, (৩) তারা জাগতিক ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে স্বাধীনতায় বিশ্বাসী তাই তাদের কাছে মন্ডলীর ঐতিহ্য (পরম্পর গত শিক্ষা ও আচার অনুষ্ঠান) এবং কর্তৃত্বের প্রয়োজন নেই, (৪) তাদের বিশ্বাস ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের আত্মার সরাসরি ও ব্যক্তিগত সম্পর্ক স্থাপন সম্ভব, এর জন্য কোন মধ্যস্থতাকারীর (যেমন ঃ কুমারী, মারীয়া, সাধসাধ্বীরা ও যাজকবর্গ) প্রয়োজন নেই, লুথার শুধুমাত্র দু'টি সাক্রামেন্ট স্বীকার করেছেন। 'দীক্ষা' ও 'প্রভূর ভোজ', কেননা এ দু'টি সংস্কারের অস্তিত্ব সম্বন্ধে বাইবেলে যুক্তি সংগত প্রমাণ লিপিবদ্ধ রয়েছে। (৫) তারা পবিত্র সংস্কার (সাক্রামেন্ট) সমুহকে স্বীকৃতি দেন, কিন্তু এগুলোকে পরিত্রাণ লাভের জন্য অত্যাবশ্যক বলে মনে করেন না।[৭] খ্রিস্টানদের উৎসবের মধ্যে খ্রিস্টমাস বা বড়দিন উল্লেখযোগ্য।

পাশ্চাত্যের খ্রিস্টধর্ম সমাজগুলিতে যীশু খ্রিস্টের জন্মদিনে ২৫শে ডিসেম্বর এ তারিখে যে উৎসব অনুষ্ঠিত হয় তাই বড় দিন বা খ্রিস্টমাস নামে অভিহিত। খ্রিস্টের জন্মের পরবর্তী ২শত বৎসরের মধ্যে এ উৎসব প্রতিপালিত হয়নি। কিন্তু পরে মধ্যযুগে তা অত্যন্ত জনপ্রিয়তা লাভ করে। ইংল্যান্ডে এ উৎসবের বিশেষ আচার অনুষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে ইউললগ (Yule Log) শীতে আগুন জ্বালানোর আনুষ্ঠানিক কাঠখন্ড, হোলি ও মিসেলটো দ্বারা ঘরবাড়ী সাজান, ক্যারল সংগীত, উপহার আদান-প্রদান, শুভেচ্ছাসূচক কার্ড প্রদান ইত্যাদি। এ উপলক্ষে বড়দিন বৃক্ষ (Christmas Tree) অনুষ্ঠানটি জার্মানদের অবদান। আর নিউ ইয়র্কের ওলন্দাজ আচারানুষ্ঠান হতে আমেরিকায় 'সানটা ক্লয (Santa Claus) কে গ্রহণ করা হয়েছে।[৮] খ্রিস্ট ধর্ম সঠিকভাবে পালন করার জন্য খ্রিস্ট মন্ডলী নামে যীশুখ্রিস্ট একটি চিরস্থায়ী সংস্থা গঠন করেন আর এ সংস্থাটিকে বলা হয় খ্রিস্ট মন্ডলী। অর্থাৎ খ্রিস্টকে ঘিরে ও তাঁর উপর বিশ্বাস স্থাপন করে যে ভক্ত সমাজ গড়ে উঠে তাই খ্রিস্ট মন্ডলী।

যীশুর পবিত্র আত্মার অবতরণের দিনকে মন্ডলীর জন্ম দিন বলা হয়।[৯] এদিনে উৎসব পালিত হয়। যীশুর শাশ্বত প্রেমের বাণীই (বাইবেল) মন্ডলীর একমাত্র সংবিধান। যীশুর সংবিধানের মৌলিক বিধানগুলো হচ্ছে ঃ প্রেম, শান্তি, ক্ষমা, দয়া, সহিষ্ণুতা, আনন্দ, সেবা।[১০] খ্রিস্টধর্মের প্রধান ঘটনার মধ্যে ৭০ খ্রিঃ জেরুজালেমের পতন উল্লেখযোগ্য।

পঞ্চাশত্তমী পর্বের দিনটিতে পবিত্র আত্মার অবতরণের মধ্যে দিয়ে খ্রিস্টমন্ডলীর জন্মলগ্নে সূচনা হয়। ইতিহাসবিদদের মতবিচারে মনে করা হয় যে সেই ঘটনাটি ঘটেছিল ৩০ খ্রিস্টব্দের দিকে।

Dhaka University Institutional Repository

খ্রিস্ট মন্ডলীর ইতিহাসে জেরুজালেমের পতন ও মন্দির ধ্বংস এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। প্রভু যীশুর সময় থেকে প্যালেস্টাইন এবং জেরুজালেম ইহুদীদের মধ্যে রোমান সাম্রাজ্যে বিরোধী বিদ্বেষ দানা বেধে উঠতে থাকে এবং পরবর্তী কালে তা বিদ্রোহের রূপ নেয়। এ বিদ্রোহ দমন করার জন্য তৎকালীন সম্রাট তাঁর সেনাপতি তিতাসের নেতৃত্বে জেরুজালেম অবরোধ করেন এবং তাঁকে ধ্বংস করে ধুলিস্যাৎ করে দেয়া হয়।

জেরুজালেমের পতন প্রকৃত পক্ষে খ্রিস্ট ধর্মের ক্ষতি না করে বরং বিভিন্নভাবে সাহায্য করেছিল। এর ফলে অনেক ভক্তরা ইহুদী সাম্রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছিল। যাদের মাধ্যমে খ্রিস্ট ধর্মের প্রসার ঘটে এবং রোম খ্রিস্ট ধর্মের প্রাণকেন্দ্ররূপে জেরুজালেমের চেয়ে প্রাধান্য পেতে শুরু করে। অতঃপর ৩১৩ খ্রিঃ খ্রিস্টানদের নির্যাতনের সমাপ্তি ঘটে ।

রোমান সম্রাট কনস্টানটাইন খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণ করেন এবং মিলান নগরী থেকে ৩১৩ খ্রিস্টাব্দে এক অনুশাসন জারী করে খ্রিস্ট ধর্মকে রাজধর্মের মর্যাদা দান করেন। এর ফলে পৃথিবীব্যাপী এক বিশাল সাম্রাজ্যের সাথে খ্রিস্ট মন্ডলীর সংযুক্তি ঘটা শুরু হয়।[১১]

তথ্য সূত্র ঃ

১। Atlastair M. Taylor, Civilization (Past and Present), New York, Copyright 1949, P-223.

২। এ কে এম শাহনেওয়াজ, বিশ্ব সভ্যতা, মধ্যযুগ, প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা, সূত্রাপুর, ঢাকা - ডিসে-১৯৯৭, পৃঃ-১৬-১৮।

৩। Atlastair M. Taylor, Civilization (Past and Present), New York, Copyright 1949, P-224.

৪। এ কে এম শাহনেওয়াজ, বিশ্ব সভ্যতা, মধ্যযুগ, প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা, সূত্রাপুর, ঢাকা - ডিসে-১৯৯৭, পৃঃ-২০-২২।

৫। নূরুন নাহার বেগম, মানুষের ইতিহাস মধ্যযুগ, জাতীয়সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা-১৯৮৩, পৃঃ-২৪।

৬। নূরুন নাহার বেগম, পূর্বোক্ত, পৃঃ-২৫।।

৭। বঙ্গীয় খ্রিস্ট মন্ডলীর ইতিহাস, রেডা, পিকে বারুই, ঢাকা-১৯৭৩, পৃঃ-

৮। বাংলা বিশ্বকোষ, ক-দ, ৩য় খন্ড, পৃঃ-১৯৮।

৯। খ্রিস্টীয় গঠন ও প্রশিক্ষণ সহায়িকা, ঢাকা, জুন-১৯৯৩, পৃঃ-১৬৩।

১০। খ্রিস্টীয় গঠন ও প্রশিক্ষণ সহায়িকা, ঢাকা, জুন-১৯৯৩, পৃঃ-১৬৩।

১১। পূর্বোক্ত, পৃঃ-১৬৩-১৬৪।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

গির্জার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

বাংলা শব্দ গির্জার ইংরেজী প্রতিশব্দ চার্চ (Church) গ্রীক ভাষার অন্তর্গত Kuriako শব্দ থেকে এর উৎপত্তি হয়েছে। শাব্দিক অর্থে এটা প্রভুর ঘর বা বাড়ী হিসেবে পরিচিত। প্রথম দিকে যে ঘরগুলো পূজার কাজে খ্রিস্টান সম্প্রদায় ব্যবহার করত সেগুলোকে গির্জা বলা হত। কিন্তু পরবর্তীতে সেগুলোর ব্যবহার ব্যাপক আকার ধারণ করে।

প্রাথমিকভাবে এগুলো ঃ (১) বিশ্ব খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের উপাসনালয় বা গির্জা, (২) জাতীয় আঞ্চলিক, ব্রক্ষক্ষিয়া বিষয়ক গির্জা, নিয়মনিষ্ঠ গ্রীক মৌলবাদী (গোড়া) সম্প্রদায়ের গির্জা বা ইংল্যান্ডের গির্জা, (৩) গ্রীসের করিনথ প্রদেশ অঞ্চলের স্থানীয় গির্জা।

Plan of the basilican church of San elements, Rome.

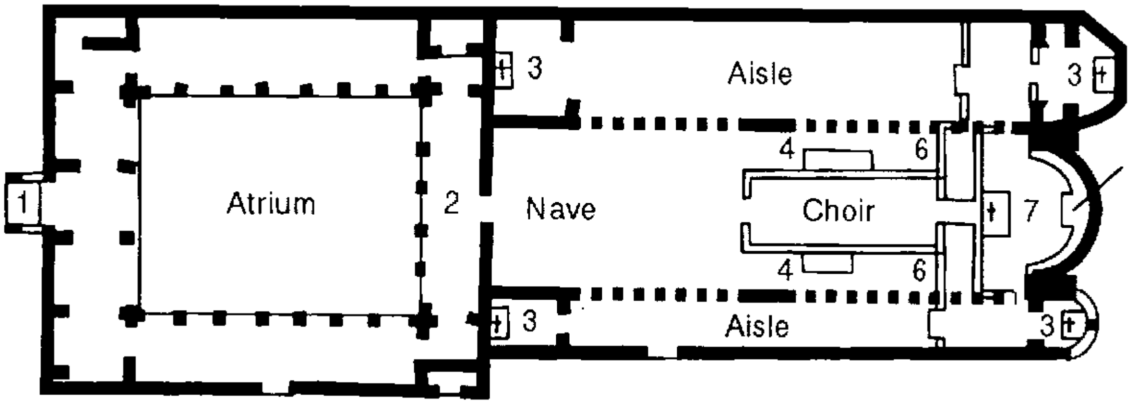

Church Figure : 1

1 Entrance
2 Narthex
3 Chapels
4 Ambones (pulpits)
5 Bishops Seat
6 Marble Screens (cancelli)
7 Apse
t Altars

পরবর্তীকালে খ্রিস্ট সম্প্রদায় তাদের বিভিন্ন ধরণের উপাসনার জন্য পাকা বাড়ী নির্মাণ করে। সেগুলোর বর্ণনা নিম্নরূপ ঃ

খ্রিস্ট সম্প্রদায়ের মধ্যে যখন রোমান সম্প্রদায়ের ধর্মীয় কারণে নিপিড়ন বা হত্যা প্রচলিত ছিল তখন স্বল্প সংখ্যক লোক রোমের বাইরে গোপনে ব্যক্তিগত বাড়ীতে অথবা মাটির নীচে গুপ্ত কোঠায় বা কক্ষে একত্রিত হয়ে উপাসনা করত। রোমে সবচেয়ে পুরাতন গির্জা তৈরীর অস্তিত্ব পাওয়া যায় সম্রাট কন্সটান্টটাইনের সময়, তখন প্রথমবারের মত সমস্ত রাজ্যে উপাসনার জন্য গির্জা নিমার্ণের অনুমতি দেওয়া হয়। ঐ সময়ে তৈরী গির্জা গুলোকে ব্যাসিলিকান (basilican) গির্জা বা খ্রিস্টান ব্যাসিলিকা বলা হয়। কারণ সেগুলোর নির্মাণ শৈলী তৎকালীন রোম, পোম্পাই এবং অন্যান্য জায়গায় ব্যাসিলিকান অর্থাৎ লম্বা হল ঘরের আদলে তৈরী হত। সেখানে নৈতিক ও ব্যবসায়িক কাজ হত।

Dhaka University Institutional Repository

প্রাথমিক ব্যাসিলিকান (Basilican) গির্জাগুলোতে ছিল কেন্দ্রের চারিদিকে বসার আসন। আসনগুলোর মধ্যে চলাচলের জন্য পথ। বৃত্তাকার আসন গুলির মধ্যে সরাসরি মোটা পিলারের অস্তিত্ব থাকত। দেওয়ালের জানালা গুলোর উপরিভাগ ছিল গোলাকার, জানালার উপরিভাগে আলো জ্বালানোর জন্য কুলঙ্গী, পূর্ব প্রান্তে ধনুকাকৃতির কুলঙ্গি, পূর্বপ্রান্তে ধনুকাকৃতির খিলান দরজা, পশ্চিম প্রান্তে Narthex বা প্রবেশ কক্ষ বা বারান্দা। রোমান আমলে এ ধরণের নকশা মাঝে মধ্যে প্রশস্ত খিলান দরজা ও তার উপর ল্যাটিন ক্রস বা ক্রসবিদ্ধ নকশা সংযোজন সমগ্র পশ্চিম ইউরোপীয় অঞ্চলে প্রচলিত হয়েছিল। এ সময় রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের পূর্ব ইউরোপীয় অঞ্চলের লম্বা কুলঙ্গী ছোট খিলান দরজার পরিবর্তে বাইজানটাইন ক্যাথলিক গির্জা পূর্ব-ইউরোপে গ্রীক ক্রুশ কেন্দ্রে ১টি গম্বুজ ও চারিদিকে বারটি সমান বাহু খাজ বিশিষ্ট নকশার প্রচলন হয়।

ল্যাটিন শব্দ Cancelli হতে Chancel শব্দের উৎপত্তি। এর অর্থ গির্জার পূর্ব পার্শ্বের অর্ধবৃত্তাকার যাজক বা পুরোহিতদের বসার স্থান বা নিরাপদ বেষ্টিত স্থান । এ নিরাপদ স্থান হতে যাজকদের আক্রমন করা সম্ভব ছিল না। প্রথম দিকে ব্যাসিলিকান খ্রিস্টানদের মধ্যে গির্জার পূর্ব প্রান্তের ধনুকাকৃতির বসার জায়গায় কয়েক সারি আসন থাকত। এ স্থানটি উচ্চ পদস্থ ধর্ম যাজকদের বেষ্টন করে পাদ্রীদের বসার জন্য ও ধর্মসভার জন্য নির্দিষ্ট ছিল। গির্জার সেবা কার্যক্রম বৃদ্ধির ফলে গায়কদল (choir) ও পাদ্রীদের (clergy) বসার জন্য অতিরিক্ত জায়গার প্রয়োজন হওয়ায় গির্জার পূর্বপ্রান্তের ধনুকাকৃতির বসার জায়গা (chancel or presbyters) বাড়ান হয় এবং সামনের দিকে পর্দা দিয়ে পৃথক করা হয়। প্রাথমিক অবস্থায় এ বর্ধিত স্থান মার্বেল পাথরে তৈরী করা হয়, পরবর্তীতে এখানে গোথিক traceried কাঠের কাজ ছিল। এখানে সামনের জায়গা টুকু এক ধাপ নীচু করে নির্মাণ করে সভায় আগত জনগণকে পৃথক করে রাখা হত যাতে জনগণ ও যাজকদের মধ্যে একটা পরিস্কার পার্থক্য দৃশ্যমান হয়। এসময় জনগণ শুধু মূল বেদীটি দেখতে পারত।

'Chancel' কে অনেক সময় 'Choir' (ঐক্যতান গায়ক মন্ডল) বলা হয়, যদিও ওয়েষ্ট মিনিষ্টার এ্যাবেদের মত অনেক গির্জায় ঐক্যতান গায়ক মন্ডলী (choir) নেভে স্থাপন করা হত এবং পরবর্তীতে আরও কিছু গির্জায় choir পশ্চিম পাশের গ্যালারীতে স্থাপন করা হয়। শেষ অবধি ইংল্যান্ড গির্জার পূর্ব প্রান্তের রোমক ধাচের ধনুকাকৃতির ধারা-বাদ দেয় এবং ১২০০ খ্রিস্টাব্দের পরবর্তীতে ইংল্যান্ডের প্রায় গির্জারই পূর্ব প্রান্ত বর্গাকার হয়ে যায়।

ইংল্যান্ডের বড় গির্জাগুলো যদিও ক্রুশবিদ্ধ যীশুর মুর্তি স্থাপন করত কিন্তু কিছু সংখ্যক ছোট গির্জা সেরকম ছিল না। সেগুলোতে প্রায়ই পাদ্রী যাজকদের বসার অর্ধবৃত্তাকার পূর্ব প্রান্তের জায়গা (chancel) এবং কেন্দ্র থাকত। কিন্তু বারান্দার (porch) সরু চলার পথ (aisles) অথবা প্রশস্ত পথ (transept) থাকত না। আস্তে আস্তে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে গির্জার আয়তনও বৃদ্ধি পেয়েছে। সাধারনত একটি বা দু'টি চলার পথ অথবা একটি বা দু'টি বারান্দা (porch), পশ্চিমে একটি বুরুজ (tower), মাঝে এক বা একাধিক প্রশস্ত পথ (transept) তদুপরি যাজকদের বসার জায়গা বর্ধনের জন্য পূর্বাংশের বর্গাকৃতি অংশ পরিবর্তন করে নরম্যান পদ্ধতির অর্ধবৃত্তাকার (apse) পদ্ধতি ব্যবহার করা হত। যাজকদের মাঝে মধ্যে গণ কীর্তনের জন্য দানশীল ব্যক্তি অথবা অনুশাসনকারী যাজক পল্লীর বাসিন্দাদের টাকায় বিশেষ কোঠা নির্মিত হয় এবং এ বিশেষ কোঠা নির্মাণের ফলে যাজকদের বসার মূল আসন ও চলাচলের বড় রাস্তার মধ্যবর্তী কোনগুলো ভরাট হয়ে যেতো। এর ফলে গির্জার সম্পূর্ণ নকশা পরিবর্তিত হয়ে যায় নরম্যান ও টডুর সময়ে।

Dhaka University Institutional Repository

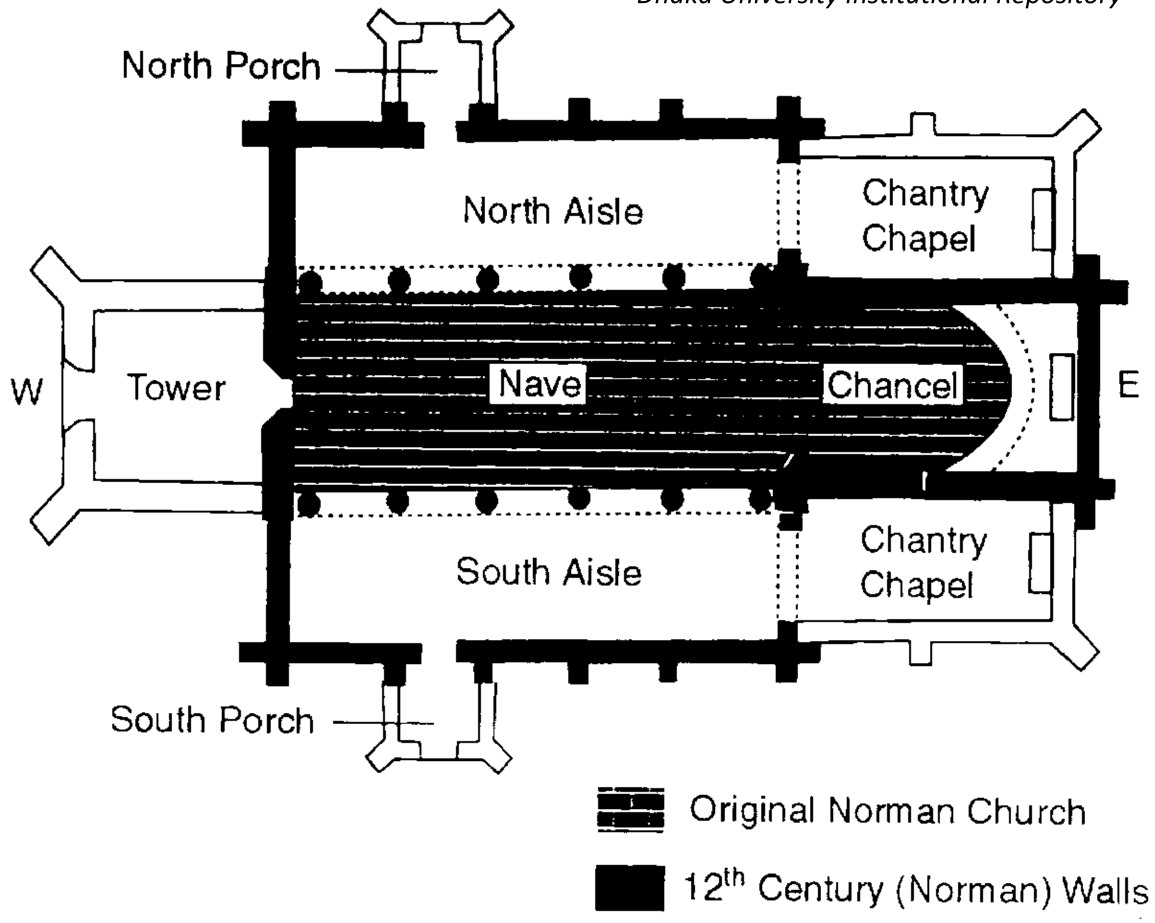

Church Figure-2 : Plan showing the development of a typical English Parish Church

গির্জার মাঝামাঝি পর্যায়ে দন্ডায়মান থাকত গির্জার মধ্যে দীক্ষা মন্ত্রের পানি পাত্র রাখার জন্য স্থায়ী স্তম্ভ অথবা তৈরী হতো মধ্যযুগে। কিন্তু অর্গ্যান বাদ্য যন্ত্রটি প্রায় অপরিচিত ছিল।এমন কি ১৭শ খ্রিস্টাব্দে লন্ডনের গির্জায় উহা কদাচিৎ দেখা যেত। এ পর্যন্ত বর্নিত সাধারণ ধরণের গির্জাগুলি ছাড়াও বৃত্তাকার আকৃতির গির্জা ইংল্যান্ড সহ পশ্চিম ইউরোপীয় অঞ্চলে তৈরী করা হয় এবং এগুলো সাধারণত তৈরী করান সম্ভ্রান্ত বংশীয় সামরিক এবং ধর্মীয় সংঘের সদস্যরা এবং এগুলো স্থাপনের ভিত্তি ছিল জেরুজালেমের পবিত্র সমাধি স্তম্ভের উপর তৈরী গির্জার আদলে। কিন্তু হল ঘর আকৃতির গির্জা তৈরী হয়েছিল গির্জাবাসী সন্ন্যাসীদের দ্বারা। যার মধ্যে যাজকদের বসার আসন বা চলাচলের পথ এসব কিছু ছিল না এবং শুধুমাত্র ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যেই এগুলো তৈরী করা হয়েছে।

ইংল্যান্ডের অষ্টম হেনরী ১৫৩১ খ্রিঃ নিজেকে গির্জার প্রধান হিসেবে ঘোষণা জারী করার পর রোমান সম্পৃক্ততা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং গির্জার স্থাপনা শৈলীর ক্রমবিকাশ বন্ধ হয়ে যায়। পরবর্তী সোয়াশ'বছরে খুব কম গির্জাই নির্মিত হয়েছে এবং ইতোপূর্বে নির্মিত গির্জা গুলোর অভ্যন্তরীণ অনেক কিছুরই ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হয়েছে। ইংল্যান্ডের পুর্নঃগঠিত গির্জার প্রধান হিসেবে থমাস ক্রমওয়েল সরকারীভাবে সংস্কারবাদী আন্দোলন শুরু করেন যার উদ্দেশ্য ছিল ধর্মীয় বিজ্ঞজনদের মতানুযায়ী ধর্মীয় পৌত্তলিকতা নির্মূল ও ধবংস করা। এ সংস্কারের উদ্দেশ্য ছিল ঈশ্বর যীশু মেরী এবং সাধু সন্তদের প্রতিমুর্তি ধবংস করা। ধর্মীয় উপদেশাবলী, নির্দেশাবলী এ সময় কাচ বা প্লাষ্টারের উপর চিত্রায়িত হত, পাথর কাঠ অথবা ধাতুর উপর ক্ষোদিত হত। পৌত্তলিকতা বা প্রতিমা ধবংসের এ প্রক্রিয়া চলছিল ষষ্ঠ এডওয়ার্ড এবং প্রথম এলিযাবেথের রাজত্বকালে। কিন্তু রানী মেরীর সময়ে পৌত্তলিকদের একটি মৃদু প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়। ফলে ভাস্কররা অতিরিক্ত পরিশ্রম করে যে প্রতিমুর্তি গুলি তৈরী করেছিল তা পুনঃস্থাপন করা

Dhaka University Institutional Repository

হয়। যেগুলোর মধ্যে অনেক গুলি ছিল খুব সুন্দর। আর্চ বিশপ লর্ড পরবর্তী শতকে গির্জার সৌন্দর্য শালীনতা ফিরিয়ে আনার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। কিন্তু অন্যান্য বিষয়ে তারা গোড়ামীর ফলে কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলিতে পৌত্তলিকতা বিরোধী আন্দোলন পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

১৬৬৬ খ্রিস্টাব্দে লন্ডনে এক অগ্নিকান্ড সংগঠিত হয়, ফলে গির্জার ব্যাপক পুনঃনির্মাণ কাজ শুরু করেন। তিনি রোমানদের ধর্মীয় ব্যবস্থাপনা ও প্রচলিত গোথিক রীতি বর্জন করে সম্পূর্ণ একটি নতুন ধর্মীয় স্থাপত্য ধারা প্রচলন করেন। এভাবে প্রটেস্টান্টদের দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করে লন্ডনের গির্জা গুলির নকশা অবলম্বনে নতুন গির্জা স্থাপত্য গড়ে উঠে। কারুকার্যময় নকশা সম্বলিত গির্জাগুলিতে গ্যালারী স্থাপন করার ব্যবস্থা করেন।

ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সময় সমবেত জনগণের নিকট প্রচারকের কণ্ঠস্বর পৌছানোর উদ্দেশ্যে তিনি এ ধারার গির্জার নকশা তৈরী করেছিলেন এবং এ ধারা উনবিংশ শতকের প্রথমকাল পর্যন্ত অনুসৃত হয়েছিল। তবে ১৭২০-১৮২০ পর্যন্ত খুব কম গির্জা নির্মিত হয়েছে।

১৬৮৯ খ্রিস্টাব্দে গির্জা ধর্মীয় উপাসনা গৃহ হিসেবে চালু হয়। তবে ক্যাথলিক মুক্তি আইন ১৮২৯ চালু হওয়ার আগপর্যন্ত কোন রোমান ক্যাথলিক গির্জা তৈরী করার অনুমতি দেওয়া হয়নি।

আঠার খ্রিস্টাব্দে বৃটিশ পার্লামেন্টে গির্জা তৈরীর জন্য এক মিলিয়ন পাউন্ড মঞ্জুরী দেওয়ার রীতি প্রচলিত হওয়ায় ইংল্যান্ডের গির্জা অনুসারীদের ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে নতুনভাবে পুর্নজীবিত গোথিক রীতির গির্জা তৈরীর ধুম পড়ে যায়। পরবর্তী শতাব্দীতে এ গথিক ধারা রীতিতে ছোট বড় সমস্ত গির্জা তৈরী হয়েছে বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত ইংল্যান্ডসহ অন্যান্য জায়গায় গির্জা নির্মাণ পদ্ধতি অব্যহত থাকে। তবে ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দে ক্যাথলিক মুক্তি আইন চালু হলে রোমান ক্যাথলিক গির্জা তৈরীর অনুমতি পায়। চিত্র নং-১ দ্রষ্টব্য।

গির্জার ইতিহাস ঃ

গির্জার ইতিহাস তিনভাগে বিভক্ত।
(১) প্রাচীন যুগ, (২) মধ্য যুগ এবং (৩) আধুনিক যুগ।

প্রাচীন যুগ ঃ

খ্রিস্ট ধর্ম প্রচারকের মাধ্যমে গির্জার প্রথম যুগের ইতিহাস শুরু হয়। এ সময় তিনি ধর্মীয় নীতিবাক্য প্রচার করেন। পঞ্চাশের (৫০) খ্রিস্টাব্দে জেরুজালেমে খ্রিস্ট ধর্মের প্রচার সংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়। এসময়ে গির্জা কেন্দ্রীক অন্তেষ্টিক্রিয়ার জন্য দল গঠন, গরীবদের জন্য সমিতি গঠনের সূত্রপাত হয়। কিন্তু ২৫০ খ্রিস্টাব্দ হতে যাজক শাসিত গির্জা ও উহার নিয়মতান্ত্রিক উপাসনাকে সাম্রাজ্যের সাময়িক ও ধর্মীয় নীতির জন্য পরিপন্থি বিবেচনা করা হয়। খ্রিস্ট সম্প্রদায়কে সম্পূর্ণভাবে নির্মূল করার জন্য কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে সর্বব্যাপী ধবংস লীলা শুরু হয় এবং উহা ডায়োক্লেনটাইনের সিংহাসন ত্যাগ পর্যন্ত চালু থাকে। ৩১৩ খ্রিঃ কনস্টান্টাইন যখন সিংহাসনে আরহন করেন তখন খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের মধ্যে স্বস্তি ফিরেআসে। কারণ সম্রাট ভিন্নমতবালম্বীদের জন্য প্রচলিত সুযোগ সুবিধা খ্রিস্ট সম্প্রদায়ের জন্য প্রসারিত করে দেয়। পরবর্তীতে থিয়োডোসিয়াস দ্যা গ্রেট (৩৭৯-৯৫) এর রাজত্বকালে অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন মোর নেয় এবং খ্রিস্টধর্মকে শেষ পর্যন্ত সাম্রাজ্যের একমাত্র ধর্ম হিসেবে অন্যান্য প্রতিদ্বন্দ্বি ধর্মের সাথে স্থান দেওয়া হয়।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ শতাব্দীতে গ্রীক গির্জার উন্নয়ন, পরিবর্ধন ঘটেছিল শুধুমাত্র বাহ্যিকভাবে ধর্মান্তরকরণ করে নয়, তদুপরি অভ্যন্তরীণভাবে পরিচ্ছন্ন নীতি বিশ্বাস এবং গির্জায় ধর্মীয় প্রচারবিধি উন্নয়ন নিয়ম-শৃংখলা এবং বিধিমালা উন্নত করে। সবচেয়ে প্রধান উন্নয়ন ছিল ধর্ম মতের বিকাশ প্রচলিত জনপ্রীতি নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে এবং এভাবে খ্রিস্ট গির্জাগুলোর মধ্যে ঐক্য সাধনের দ্বারা এ ধর্মমতের বিকাশ হয়।

তৃতীয় শতাব্দীর প্রথম দিকে খ্রিস্ট ধর্ম আরবে, পারস্যে, আর্মেনীয়ায় এবং রোম সাম্রাজ্যের উত্তর এবং পশ্চিম অঞ্চলের প্রসারিত হয়। ফলে চতুর্থ শতকের স্থানান্তরের আগেই নাথ এবং টিটোনিক সম্প্রদায় -এর লোকজন খ্রিস্ট ধর্মের অনুসারী হয়ে পড়ে। আরব, পারস্য এবং অন্যান্য প্রাচ্য দেশে ইসলাম ধর্মের বিজয়ের ফলে খ্রিস্ট ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ বিলুপ্ত হয়ে যায়। কিন্তু পশ্চিমাঞ্চলে বর্বর আক্রমণের ফলে বিশপরা-রোমান শাসকদের দ্বারা ইতোপূর্বে প্রদত্ত সামাজিক ও নৈতিক ক্ষমতা বলে বলীয়ান থাকায় গির্জা ও যাজকদের প্রাচীন রোমের প্রভাব অব্যাহত, যাকে মহামানবের প্রতীক হিসেবে গণ্য হতে থাকে।

বৃটেনে রোমান সৈন্যরা খ্রিস্ট ধর্ম বা খ্রিস্টান হিসেবে বিশ্বাসকে নিয়ে আসে সম্ভবত প্রথম শতকে। গ্লাস্টনবারীর উপকথার কোন ঐতিহাসিক মূল্য নেই।

বৃটেনে প্রথম ধর্ম যুদ্ধে (ক্রুসেড) নিহত সেন্ট আলব্যন ঐতিহাসিকভাবে বৃটেনের ১ম শহিদ এবং বিশেষত (লন্ডন, ইত্তক এবং লিংকন) এ তিনজন ৩১৪ খ্রিঃ কাউন্সিল অফ আর্লেসে (রাজকীয় সভা) যোগদান করে। কিন্তু ইংল্যান্ডের রোমান ক্যাথলিক গির্জা অ্যাংলো স্যাকসন (Saxson) আক্রমণকারীদের দ্বারা প্রভাবিত হয়, যদিও ইহা পশ্চিমে বিশেষ করে ওয়েলসে তখনও সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। সেলটিক গোত্রভুক্ত সেন্ট পেট্রিক নিজে আয়ারল্যান্ড গির্জা স্থাপন করে যায় পঞ্চম শতাব্দির মধ্যভাগে। ৫৯৬ খ্রিঃ সেন্ট দক্ষিণ ইংল্যান্ডে বেনিডিক্টাইন অগাষ্টিন এর নেতৃত্বে একটি ধর্ম প্রচারক দল পাঠিয়ে খ্রিস্ট ধর্ম প্রচলণ করেন এবং সেন্ট আগাষ্টন বেনিডেক্টাইন পরবর্তীকালে ক্যান্টাবাড়ীর প্রথম আর্চ বিশপ নিযুক্ত হন। কিন্তু ইহার পূর্বেই আয়ারল্যান্ডের সেল্টিক গির্জাভূক্ত সেন্ট কস্যোবা এবং অন্যান্য মিশনারীরা আইওনাতে, স্কটল্যান্ডের পশ্চিম উপকূলবর্তী অঞ্চলে (৫৬৩খ্রিঃ) বসতি স্থাপন করে খ্রিস্ট ধর্মে দীক্ষা দেওয়া শুরু করে। আয়ারল্যান্ড এবং রোমের দুটি প্রচারক দলের বৈশিষ্ট্য ছিল ভিন্ন প্রকৃতির। রোমানরা বিশপের নেতৃত্বে একটি অতি উন্নত যাজক শাসিত সংগঠন গড়ে তোলেন। সেল্টিক মিশনে এ ধরণের কোন সংগঠন ছিল না। তাদের ক্ষমতার কেন্দ্র ছিল মঠধারী বা মহান্ত এবং তারা ভিন্ন জায়গায় গির্জার শাখা খুলে খ্রিস্টধর্মের প্রসারতা ঘটায় এবং বিশপ শুধুমাত্র ধর্মান্তরিতকরণ বা খ্রিস্ট ধর্মের দীক্ষা দেওয়া ও যাজক ভর্তি করার দায়িত্ব পালন করতে থাকে।

তখন হতে বৃটেনের গির্জাগুলিকে বিচ্ছিন্নতা ছাড়িয়ে পোপের অধীনে ও প্রভাবে আনা হয় এবং তদদ্বারা ইউরোপীয় কৃষ্টিভূক্ত হয়। পরবর্তী ২৫০ বৎসর গির্জাগুলোর প্রভূত্ব উন্নতিকালে জাতি বিভিন্ন রাজ্যে বিভক্ত থাকলেও গির্জা ছিল একীভূত। ফলে সমস্ত জাতিকে একত্রিত করতে গির্জা বড় দায়িত্ব পালন করে। এ গির্জাই এে (৬৭৩-৭৩৫), এ্যালকুইন (৭৩৫-৯৬ খ্রীঃ) এবং আলপ্রেড দ্যা গ্রেট (৮৪৮-৯৯) এর মত পন্ডিত ব্যক্তির জন্ম দেয়। গির্জার ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ বিভিন্নভাবে ঘটতে থাকে। উত্তর ইউরোপে ধর্ম প্রচারক দল প্রেরন বিশেষত (৬৭৫-৭৫৪) খ্রিস্টাব্দের মধ্যে সেন্ট বেনিভেসকে পাঠান, জার্মানীতে প্রচারক দল এবং জার্মানী সমস্ত গোত্রের মধ্যে খ্রিস্ট ধর্ম প্রচারের জন্য প্রচারক দল প্রেরন করে।

মধ্য যুগ ঃ

অষ্টম শতকে দুটি মহাশক্তি খ্রিস্ট ধর্মকে দাবিয়ে দেবার ক্ষমতা রাখে, শক্তি দুটি হলো ইসলাম এবং অখ্রিস্টীয় (non-Christian) স্যাক্সেনে ও অন্যান্য যাযাবর গোত্রগুলো (barbarians)। কিন্তু ফ্রাংকিস (Frankish) নেতা চালর্স ম্যাটেলের ৭৩২ খ্রিস্টাব্দে টুরসের যুদ্ধে বিজয়ের পর পশ্চিম প্রান্তে ইসলামের অগ্রযাত্রা

Dhaka University Institutional Repository

থেমে যায় এবং ৭৭২-৮৫৪ খ্রিঃ পর্যন্ত ৩২ বৎসর যুদ্ধ দ্বারা চার্লস ম্যাগী স্যাক্সনদের দমন করতে সমর্থ হয়। তাদের জোর করে খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণ করান। বিভিন্ন শহর ও দূর্গ নির্মাণ এবং খ্রিস্টীয় ধর্ম প্রচারক সংঘ ও দল গঠন করে খ্রিস্ট ধর্মের উপর হুমকি প্রদান করে। খ্রিস্ট ধর্ম দৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপনের পর পোপের ক্ষমতা পুনঃর্বিন্যাস দ্বারা শক্তিশালী করণের মাধ্যমে ক্যাথলিক গির্জার মধ্যযুগীয় ইতিহাস শুরু হয়।

৭৩০ খ্রিস্টাব্দে ধর্মীয় আইনবিদরা কনস্টান্টাইনের গির্জা নির্মাণ মঞ্জুরী গ্রহণ করে খ্রিস্ট ধর্ম প্রচার করতে থাকে। কিন্তু ১০৫৪ খ্রিস্টাব্দে পূর্বাঞ্চলীয় গির্জা হতে পশ্চিমাঞ্চলীয় গির্জাগুলোর পৃথকীকরণের মধ্যে দিয়ে পোপের ক্ষমতা দৃঢ় হয়। ৪৮৪-৫১৯ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে মনোপসাইড* এবং অন্যান্য ভিন্ন মতবালম্বীদের দ্বারা বিভক্তি তরান্বিত হয়েছিল কিন্তু ইহার মূল কারণ ছিল রোমান গির্জার সার্বভৌমত্ব, কন্সটান্টিনোপালের দেশ প্রেমিকদের স্বীকার করে নেওয়া হয়।

মধ্যযুগে সামাজিক সংস্কৃতিক ও ধর্মীয় বিন্যাসে বেনেডিকটাইন, ডোমিনিকান এবং ফ্যানসিমকোন -এর ধর্মীয় বিধিমালা বিশেষ ভূমিকা পালন করে চতুর্থ শতক হতে পরবর্তীকালে সন্ন্যাসব্রত ক্রমান্বয়ে দৃঢ় ভিত্তি পায়। প্রচলিত জীবন ব্যবস্থা সমসাময়িক সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে অনিরাপত্তা ও দূনীতির কারণে প্রতিবাদের রূপধারন করে এবং গির্জার উপরে প্রভাব বিস্তার করে। ইহার ফলে ক্লুনির ৯১০ সালের তৈরী সন্ন্যাসী সংঘ, ক্লুনির সংস্কার ধর্মীয় কার্যাবলী গুলির পুনর্বিন্যাস এবং সর্বপরি রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রন হতে গির্জার মুক্তি লাভ ঘটে। ১১১২ সালে রাজনৈতিকভাবে পোপের বিজয় হয়। কারণ ১০৯৫-১২০২ এর মধ্যে সংগঠিত চারটি ধর্মযুদ্ধ বা ক্রুসেড। (ঐতিহাসিকরা ক্রুসেডকে তিনটি ভাগে ভাগ করেছেন। ১ম ক্রুসেড ঃ (১১৯৫ খ্রিঃ) খ্রিস্টান যোদ্ধারা মুসলিম রাজ্যের উপর ঝাপিয়ে পড়ে এবং আতাবেগ জঙ্গীর এডিসা পুনঃরুদ্ধার পর্যন্ত। ২য় ক্রুসেড (১১৪৪-১১৯৩খ্রিঃ) মুসলমানদের প্রতিক্রিয়ার যুগ। ইমামুদ্দিন জঙ্গী হতে সালাউদ্দিন আয়ুবীর (আইয়ুবী বংশের প্রতিষ্ঠাতা, তাঁর শাসনকালে মিশরের ইতিহাসে এক গৌরবময় যুগ) বিজয়। ৩য় যুগঃ ১১৯৩-১২৯১ পর্যন্ত। এ পর্যায়ে কয়েকটি যুদ্ধ সংগঠিত হয় এবং পোপের মর্যাদা বাড়িয়ে দেয়।

পোপ ও সম্রাটের মধ্যে এ দ্বন্দ্ব সুদূর প্রসারী ফল দেয়, কারন পোপ সম্রাটের বিরুদ্ধে জার্মানীর সাথে ষড়যন্ত্র করে এবং ইটালীর শহর গুলিকে এ ষড়যন্ত্রে যোগদেবার জন্য উদ্বুদ্ধ করে। শতবৎসর পর্যন্ত জার্মান রাজ্যেগুলোকে একত্রিত করন বাধাগ্রস্থ করে রেখেছিল। ভন্ড সাধুদের উপস্থিতি, গির্জার মধ্যে অনাচারের অনুপ্রবেশ, পোপের ১৩০৫-৭৭ পর্যন্ত এ্যাভিগনোনে অবস্থান ইত্যাদি এবং তথাকথিত ব্যাবিলোনিয়ানদের বন্দীত্ব ভিন্ন ধর্মীয় মতাদর্শ (১৬৩৮-১৪০৯) এবং একই সাথে রোম ও এ্যাভিগনোনে প্রতিদ্বন্দি পোপের উপস্থিতি মানুষের জনমনে বিশ্ব গির্জা এবং বিশ্ব সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা ধারনার উপর বিতৃষ্ণার জন্ম দেয়। এ্যাভিগনোনে শতবর্ষের যুদ্ধ কালে পোপের ক্ষমতা অবসান, বিদেশীদের বিশেষ করে ফরাসীদের ইংরেজ যাজক বৃত্তিতে জোড় করে অনুপ্রবেশ ইংল্যান্ডের বিরক্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। মধ্যযুগীয় দার্শনিকদের মতবাদের বিরুদ্ধে সর্বত্র চিন্তাবিদরা বিদ্রোহ ঘোষনা করে। ধর্মীয় দর্শনের উপরে শ্রদ্ধাভক্তির অবনতি, যাজকদের আলস্য জাতীয়তা বাদের উন্মেষ, এগুলো সাথে পোপের পদমর্যাদার উপর পরিবর্তিত ধ্যান ধারনা ও একটি নতুন যুগের সূচনা করে। চর্তুদশ শতকের শেষদিকে ইটালিতে শুরু হওয়া পুনঃজাগরন মধ্যযুগের সমাপ্তির ঘোষনা দেয় এবং নতুন ইউরোপের অভ্যুত্থানের ফলে সংস্কারের দিকে এগিয়ে যায় এবং গির্জার ইতিহাসে নতুন যুগের সূচনা হয়।

* (The views of the monophysites regarding the theological problem were by no means homogenous).

Dhaka University Institutional Repository

আধুনিক যুগ ঃ

চতুর্দশ শতকের পুর্নগঠন কাজ চালু হবার পর পাশ্চাত্যের খ্রিস্ট রাজত্ব তার ঐক্য হারিয়ে ফেলে। সাধারণ ক্ষমতার দাবী মাথাচারা দিয়ে উঠে। সর্বত্র গির্জার সংস্কারের কারণে লুথার কালভিন এবং প্রটেস্টান্ট মতবাদ চালু হয়। এসকল সংগ্রামের কারনে স্ক্যান্ডিনেভিয়া এবং জার্মানীতে লুথারিয়ানিজম মতবাদের বিকাশ ঘটে। এ মতবাদটি ছিল সাম্রাজ্যবাদ ও রোমক আনুষ্ঠানিকতার প্রতি খুব রক্ষনশীল এবং এ মতবাদ চরম বিশৃংখলা কবলিত রাজ্যগুলিতে কার্যকরী হয়। দক্ষিণ জার্মানী, সুইজারল্যান্ড, স্কটল্যান্ড, নেদারল্যান্ড এসব অঞ্চলে পুর্নগঠিত গির্জাগুলো অধিকতর গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে পরিচালিত হয়। যার ফলে সম্মেলন গুলিতে মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি অতি কঠিন নিয়মানুবর্তীতা পালনকারী বিজ্ঞ ব্যক্তিদের সহ সংখ্যালঘু সংস্কার বাদীরা যেখানে অংশ গ্রহণ করে যাযাবর মতবাদ প্রকাশ করতে পারেন যা খুব ফলদায়ক হয়। জার্মানীতে ওয়েস্টকোলিয়ার ১৬৪৮ খ্রিস্টাব্দের শান্তি চুক্তির পর লুথার মতবাদী ছাড়া বাকী প্রটেস্টান্টরা ধর্মীয় উপাসনার স্বাধীনতা পায়। প্রটেস্টানিজমের (প্রটেস্টান্টবাদ) প্রতি প্রতিক্রিয়া অথবা প্রতি বিপ্লব সর্বত্রই 'সোসাইটি অফ জেসাস' দ্বারা পরিচালিত হয়। ব্রেভারিতে ১৫৬৩ খ্রিঃ শুরু হয়ে এ আন্দোলন দক্ষিণ জার্মানীতে বিস্তার লাভ করে। ফরাসী অঞ্চলে আসে ১৬০০ খ্রিস্টাব্দে এবং ইহার পরিসমাপ্তি হয় ১৬৫০ খ্রিঃ।[১]

এসব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই ষোড়শ শতাব্দীতে খ্রিষ্ট ধর্মে ক্যাথলিক ও প্রটেস্টান্ট প্রধান দুটি ভিন্ন মতাদর্শের জন্ম হয় এবং এরই ফলশ্রুতিতে দুটি ভিন্ন ধরণের গির্জার উদ্ভব হয়।

সামন্ত প্রথায় গির্জার ভূমিকা ঃ

মধ্যযুগের অর্থনৈতিক রূপরেখার পরিচয় পাওয়া যায় সামন্ত প্রথার মাধ্যমে। এর দার্শনিক ও ভাএর্শের রূপ পরিস্ফুট হয়েছে গির্জার মধ্যে দিয়ে। বস্তুত সামন্তপ্রথার ভাবাদর্শ প্রচারের দায়িত্ব নিয়েছিল গির্জা । অবশ্য গির্জা সামন্তপ্রথার বাইরে থেকে একাজ করেনি। গির্জা সামন্তপ্রথার মধ্যেই ঢুকে পড়েছিল। ইউরোপের প্রায় প্রতিটি ছোট বড় গির্জাই ছিল এক একটি সামন্ত প্রভূ। বহু জমি ছিল গির্জার অধীনে। মধ্যযুগের প্রথম দিকের নিদারুন সংকটাপন্ন দিনগুলিতে লোকে আশ্রয়স্থল হিসেবে গির্জাকেই জমিজমা ও অন্যান্য সম্পত্তি দান করেছে। এছাড়া রাজা বা ধনী ব্যক্তিরা ব্যক্তিগতভাবে ধর্মীয় কাজ হিসেবে গির্জাকে বহু জমি দান করেছেন। সেদিক দিয়ে বিচার করলে সমগ্র ক্যাথলিক জগতের এক তৃতীয়াংশ জমির মালিক ছিল গির্জা বা গির্জা। এসকল জমিতে ভূমিদাসদের বসিয়ে গির্জা (Church) তাদের কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ কর আদায় করত। সামন্ত প্রভুর যেসকল কর ভূমিদাসরা দিত সেগুলো ছাড়াও টাইথ (tithe) নামক এক বিশেষ ধরনের কর গির্জা সকলের কাছ থেকে আদায় করত (কিন্তু প্রজা শাসন বা সম্পত্তির আয় নিয়েই গির্জা (Church) তৃপ্ত ছিল না। সামন্ত প্রথা যে সর্বোৎকৃষ্ট এবং এ প্রথার বিরোধী হওয়া যে ঈশ্বরের বিরোধীতাই নামান্তর মাত্র - সেটা প্রচার করাই ছিল গির্জার সর্বপ্রথম কর্তব্য। সামন্ত প্রভূদের সম্পত্তি রক্ষা করাই ছিল গির্জার দায়িত্ব। খ্রিস্ট ধর্ম প্রাথমিকভাবে দরিদ্রের ধর্মরূপে আর্বিভূত হলেও পরে অবশ্য ধনবানদের স্বার্থ রক্ষাই এর প্রধান কাজে পরিনত হয়। প্যাপাসির (পোপতন্ত্রের) উৎপত্তি গির্জার সংগঠনের শক্তি বৃদ্ধি, এর ক্রমবর্ধমান প্রভাব ও প্রসার প্রভৃতি শেষ পর্যন্ত খ্রিস্ট ধর্মকে ধনীর ধনরক্ষার হাতিয়ারেই পরিণত করে। দরিদ্রকে শোষণ ও সেই সঙ্গে শ্রেণী বিভক্ত সমাজকে টিকিয়ে রাখার অপরিসীম প্রয়াসে তাকে লিপ্ত হতে দেখা যায়।

মানুষের প্রতি মধ্যযুগীয় গির্জার দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠেছিল রোমান সাম্রাজ্যের পতনের তমসাচ্ছন্ন যুগে। ক্যাথলিক গির্জা মানুষকে বোঝাতো যে পার্থিব জীবন পরকালের জীবনের প্রস্তুতি মাত্র। ইহকালে দুঃখভোগ করলে, দুঃখ-কষ্ট নীরবে সয়ে গেলে পরকালে অক্ষয় স্বর্গ লাভ ঘটবে নিশ্চয়। তা না হলে অদৃষ্টে আছে অনন্ত নরক ভোগ।

Dhaka University Institutional Repository

গির্জা এভাবে কৃচ্ছ্র সাধনার শিক্ষা দিয়ে ধর্ম ও তিতিক্ষার বাণী প্রচার করে চেষ্টা করেছে জনসাধারণকে শ্রেণী সর্বগ্রাস থেকে বিরত করতে। বস্তুত সামান্ত প্রথাকে টিকিয়ে রাখার জন্য গির্জার প্রয়াস ছিল অপরিসীম।

গির্জা সংগঠনও মোটামুটি সামন্ত সংগঠনের অনুরূপই ছিল। সম্রাট, রাজা, ব্যারন, কাউন্ট, ভাই কাউন্ট ইত্যাদির মত পোপের নীচে ছিলেন আর্চবিশপ, তারপর বিশপ ইত্যাদি। পৃথিবীর মত স্বর্গ লোকেও ছিল নয়স্তরের দেবতা, সেরাফিম, চেরাবিম, থ্রেনে, ডোমিনেশন, ভার্চু, পাওয়ার প্রিন্সিপালিটি, গির্জা এঞ্জেল, এঞ্জেল। জগৎ পরিচালনায় এদের প্রত্যেকেরই নির্দিষ্ট দায়িত্ব পালন করতেন।

গির্জার সুশৃংখল কার্যধারা সামন্ত রাজাদের উচ্ছৃঙ্খল ঝোঁক দূর করে সমগ্র খ্রিস্টীয় জগতে এক সর্বজনগ্রাহ্য কর্তৃত্বের সৃষ্টি করে। যাজকতন্ত্রের সাথে অদম্য সামন্ত প্রভূদের মাঝে মাঝে বিবাদ দেখা দিত। কিন্তু প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থা অটুট রাখতে যে দুয়েরই প্রয়োজন সে সম্পর্কে উভয় পক্ষই সচেতন ছিল।

সম্রাট ও পোপের সংর্ঘষ ঃ

মধ্যযুগে সামন্ততন্ত্রের ভাবাদর্শ প্রচারের দায়িত্ব নিয়েছিলো গির্জা। শুধু তাই নয়, গির্জা নিজেই সামন্তপ্রথার অঙ্গীভূত হয়ে পড়েছিল। খ্রিস্টান গির্জা ও যাজক সম্প্রদায়ের হাতে সমগ্র ইউরোপের এক-তৃতীয়াংশ ভূ-খন্ড চলে গিয়েছিল। গির্জা ছিল ইউরোপের সবচেয়ে বড় সামন্ত মালিক। গির্জার সংগঠনের রূপ ছিল সামন্ততান্ত্রিক। গির্জার শ্রেনীবিন্যাস পোপ, বিশপ, আর্চবিশপ প্রভৃতি ছিল সামন্তশ্রেণী বিন্যাসের অনুরূপ, সামন্তপ্রথার সাথে যুক্ত হয়ে যাওয়ার ফলে ক্রমে ক্রমে গির্জার উপর সামন্ত প্রভূদের আধিপত্য বহাল হয়। দশম একাদশ শতাব্দীর মধ্যে ইউরোপের সমগ্র গির্জা এমনকি রোমের গির্জার উপর পর্যন্ত হোলি রোমান এম্পায়ার, দেশীয় রাজা বা সামন্ত জমিদারদের পরিপূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। রোমের পোপের নিযুক্তি হত কখনও কখনও ইতালীর বড় বড় সামন্ত জমিদারদের দ্বারা, এরা খেয়াল খুশিমতো নিজেদের পছন্দমতো লোককে পোপ নিযুক্ত করতেন। ম্যারোজিয়া নামে একজন রোমান মহিলা এতই প্রভাবশালী ছিলেন যে ৯২৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি নিজের অবৈধ সন্তানকে রোমের পোপ নিযুক্ত করেন। এ মহিলার পৌত্র দ্বাদশ জনই প্রথম অটোকে পবিত্র রোমান সম্রাটরূপে অভিষিক্ত করেন।[২]

জার্মান সম্রাট প্রথম অটো দ্বাদশ জনকে লম্বার্ড রাজার হাত থেকে উদ্ধার করেছিলেন। তার বিনিময়ে তিনি পোপকে বাধ্য করেছিলেন তাঁকে পবিত্র রোমান সম্রাটরূপে ঘোষণা করতে। অটোর পরবর্তী জার্মান সম্রাটরা সকলেই রোমের পোপদের নিযুক্ত করতেন এবং প্রত্যেকেই রোমে গিয়ে পোপের দ্বারা পবিত্র রোমান সম্রাটরূপে অভিষিক্ত হতেন। এভাবে রোমান সম্রাটদের দ্বারা নিযুক্ত হওয়ায় ফলে পোপের স্বাধীনতা বহু ক্ষেত্রে ক্ষুন্ন হত। শুধু তাই নয়, অন্যান্য দেশের গির্জাগুলোর উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় পোপ অসমর্থ হতেন।

খ্রিস্টজগতের ধর্মগুরু পোপের পক্ষে এভাবে সামন্তরাজ্য বা জমিদারদের অধীনস্থ হওয়া রীতিমত অপমানজনক বিবেচিত হওয়ায় পোপ নিজেকে সামন্ত অধীনতা থেকে মুক্ত করতে সচেষ্ট হলেন। সামন্ত প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়ার প্রচেষ্টার অর্থ এ নয় যে, পোপ সামন্তপ্রথাকে আঘাত করতে বা অবসান ঘটাতে চেয়েছিলেন। আপাত বিরোধীতা মনে হলেও এ প্রচেষ্টার পিছনে পোপের আসল উদ্দেশ্য ছিল সামন্তপ্রথাকেই টিকেয়ে রাখা এবং ইউরোপের সবচেয়ে বড় সামন্তপ্রভূ হিসেবে সবার উপরে নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা।

দশম শতাব্দীতে ফ্রান্সের বার্গান্ডি প্রদেশের ক্লুনি নামক মঠে এক সংস্কার আন্দোলন শুরু হয়। যদিও মঠের সর্বপ্রকার দুর্নীতি, কুলুষতা, অনাচার থেকে মুক্ত করা এ সংস্কার আন্দোলনের প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল, কিন্তু এর প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল মঠ ও গির্জাকে সামন্ত প্রভাব থেকে মুক্ত করা। ক্লুনি সংস্কার আন্দোলনের দ্রুত বিস্তৃতি এর প্রভাব রোমের পোপ মিল্ডব্রান্ডকে অনুপ্রাণিত করেছিল সম্রাটের আনুগত্য অস্বীকার করতে।

Dhaka University Institutional Repository

একাদশ শতাব্দীতে হিল্ডেব্রাণ্ড সপ্তম গ্রেগরী নাম ধারণ করে রোমের পোপ নিযুক্ত হন। সামন্তপ্রথা অনুযায়ী নবনিযুক্ত পোপকে সম্রাট অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাঁর পদে অধিষ্ঠিত করতেন এবং কর্তৃত্বের চিহ্নসম্বলিত দণ্ড ও আঙ্গুরী প্রদান করতেন। এ অনুষ্ঠানে পোপকে সম্রাট তাঁর জমিদারীও প্রদান করতেন।

সম্রাটের হাত থেকে কর্তৃত্ব পাওয়ার এ প্রথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে পোপ ঘোষণা করেন তিনি (পোপ) ঈশ্বরের কাছ থেকে সরাসরি ক্ষমতা প্রাপ্ত এবং ঈশ্বরের প্রতিনিধিস্বরূপ পৃথিবীতে প্রেরিত। অতএব তিনি এ পৃথিবীর কারও অধীনস্থ নন এমন কি কারও কাছে স্বীয় কর্মের কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য নন। উপরন্তু তিনি দাবী করলেন পৃথিবীর সকল মানুষ এমন কি সম্রাটও পোপের অধীনে। ইউরোপের সকল গির্জার ধর্মযাজকদের তিনি নির্দেশ দিলেন সামন্ত জমিদার বা রাজার আনুগত্য অস্বীকার করে সরাসরি পোপের অধীনতা মেনে নিতে।

পোপ সপ্তম গ্রেগরীর আচরণে অসন্তুষ্ট হয়ে সম্রাট চতুর্থ হেনরী জার্মানীর বিশপদের নিয়ে একটি সভা আহ্বান করে হিল্ডেব্রান্ডকে পোপের পদ থেকে বহিস্কার করার কথা ঘোষণা করেন। এর প্রতিবাদে হিল্ডেব্রান্ড চতুর্থ হেনরীকে পোপের ক্ষমতা অনুসারে খ্রিস্টান জগৎ থেকে বহিস্কার (excommunicate) করেন। পোপের এ বহিস্কার আদেশের অর্থ হল হেনরীকে ধর্মচ্যুত ঘোষণা করা এবং তার প্রজাদের প্রতি সম্রাটকে অমান্য করার নির্দেশ দেওয়া। পোপের এ ঘোষণায় প্রভাবিত হয়ে জার্মান সামন্তপ্রভুরা হেনরীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। বাধ্য হয়ে হেনরী পোপের কাছে মার্জনা প্রার্থী হলেন। ভয়ংকর শীতের মধ্যে সুউচ্চ আল্পস পর্বত অতিক্রম করে বহু কষ্টে কয়েকজন সঙ্গীসহ হেনরী ইতালীতে পৌছেন। পোপ তখন ক্যানসায় অবস্থান করছিলেন। তিন দিন তিন রাত সেই প্রচণ্ড শীতের মধ্যে খালি পায়ে সম্রাট পোপের প্রাসাদের বাইরে দাড়িয়ে রইলেন সাক্ষাৎ লাভের আশায়। চতুর্থ দিনে পোপ তাঁকে সাক্ষাতের অনুমতি দিলেন এবং পোপের পদপ্রান্তে নতজানু হয়ে ক্ষমা প্রার্থনার পরই শুধুমাত্র পোপ হেনরীর উপর থেকে বহিস্কারাদেশ প্রত্যাহার করে নেন। মধ্যযুগে ধর্মের প্রভাব কতখানি প্রবল ছিল এঘটনা তারই একটি প্রমাণ। দেশে ফিরেও হেনরী কিন্তু এ অপমানের কথা ভুলতে পারেন নি। পর বৎসর সসৈন্যে তিনি রোমে অভিযান প্রেরণ করেন এবং সপ্তম গ্রেগরীকে পদচ্যুত করে সেখানে নিজের অনুগত লোককে বসান। পরাজিত গ্রেগরী দক্ষিণ ইতালীতে পলায়ন করেন। সেখানে নর্মানদের আশ্রয়ে ১০৮৫ খ্রিস্টাব্দে নির্বাসিত অবস্থায় তাঁর মৃত্যু ঘটে।

হেনরী ওহিল্ডব্রাণ্ডের মধ্যকার কলহ তাদের উত্তোরাধীকারীদের মধ্যেও সঞ্চারিত হয় এবং ১১২২ সালে ওয়ার্মস এর চুক্তি (Treaty of Worms) দ্বারা এ সংঘর্ষের সামরিক অবসান ঘটে। এ চুক্তিতে উভয়পক্ষ এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে গির্জার বিশপরা ভবিষ্যতে পোপ বা তাঁর প্রতিনিধিদের দ্বারা অভিষিক্ত হবেন, কিন্তু অভিষেক অনুষ্ঠান জার্মানীতে অনুষ্ঠিত হবে সম্রাট বা তাঁর প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে। সম্রাট তাঁকে সব ভূখণ্ডও দান করবেন অর্থাৎ তাঁর উপর রাজনৈতিক ক্ষমতা আরোপ করবেন।

এ চুক্তির তিন বছর পরই কলহ নতুন পর্যায়ে উপস্থিত হয়। পোপ তৃতীয় আলেকজাণ্ডার ও সম্রাট ফ্রেডারিক বারবারোসার মধ্যে সংঘটিত এ কলহের মূল কারণ ছিল জার্মান সম্রাট কর্তৃক ইতালীর উপর অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা। কিন্তু ইতালীর জনগণের সম্মিলিত প্রতিরোধের মুখে পরাজিত ফ্রেডারিক পোপের কাছে পুনরায় মার্জনা প্রার্থী হন। শুধু তাই নয় অনুষ্ঠিত ও সংগঠিত তৃতীয় ক্রসেডেও তিনি অংশ গ্রহণ করেন।

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে তৃতীয় ইনোসেন্ট এর সময়ে পোপের ক্ষমতা সর্বোচ্চ শিখরে পৌছে। ১২০৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি ফ্রান্সের রাজা ফিলিপ আগাস্টাসকে বহিস্কারাদেশের ভয় দেখিয়ে তার পরিত্যাক্ত স্ত্রীকে ফিরিয়ে দিতে বাধ্য করেন। একই ভাবে ইংল্যাণ্ডের রাজা জনকে তিনি বাধ্য করেন তাঁর (পোপের) মনোনীত স্টিফেন লাংটনকে ক্যান্টটারবেরী গির্জার আর্চ বিশপ নিযুক্ত করতে। পোপ ইনোসেন্ট ইউরোপের প্রায় প্রত্যেকটি দেশের আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতেন। প্রত্যেক দেশের রাজাকে তিনি তাঁর অধীনতা স্বীকারে বাধ্য করেন। তিনি

Dhaka University Institutional Repository

এমন কি দ্বিতীয় ফেডারিককে পবিত্র রোমান সম্রাট নিযুক্ত করেন। দ্বিতীয় ফ্রেডারিক অবশ্য পরবর্তীকালে এ পোপের উত্তরাধিকারী চতুর্থ ইনোসেন্ট এর সাথে সিসিলি ও সার্ডিনিয়ার দখল নিয়ে কলহে লিপ্ত হয়েছিলেন।

চতুর্দশ শতাব্দী থেকে পোপের ক্ষমতা ক্রমশ হ্রাস পেতে থাকে। ক্রুসেডের শোচনীয় ব্যর্থতা এবং পোপ ও ধর্মযাজকদের মাত্রাহীন দুর্নীতি, অনৈতিকতা ও অপরিসীম বিলাসিতা মানুষের মনে বিভিন্ন প্রশ্নের সৃষ্টি করে। বিশেষতঃ শহরবাসীদের মধ্যে পোপের কার্যকলাপের বিরুদ্ধে দারুন ক্ষোভের সঞ্চার হয়। তারা সরাসরি পোপের বিরোধিতা শুরু করে।

এ বিরোধিতা দমন করার উদ্দেশ্যে পোপ এদের বিরুদ্ধে সর্ব প্রকার নির্যাতন মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। শহরবাসীদের হেরেটিক বা ধর্ম বিরোধী আখ্যা দিয়ে পোপ সামন্তপ্রভূদের এদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেন। সসৈন্যে সামন্ত প্রভূরা পোপের বিরোধীদের ধরে ধরে জীবন্ত অবস্থায় পুড়িয়ে মারে। তা সত্ত্বেও পোপের বিরোধীদের অবসান ঘটল না। ইউরোপের বিভিন্ন দেশের রাজন্যবর্গের সাথে পোপের সংঘর্ষ উত্তরোত্তর বৃদ্দি পেতে থাকে।

পোপের কর্তৃত্ব অস্বীকার করে ফ্রান্সের রাজা ফিলিপ দি ফেয়ার ফ্রান্সের গির্জাগুলির উপর কর আরোপ করেন। পোপ অষ্টম বানিফেস ফিলিপকে বহিস্কার করার ভয় দেখালে ফিলিপের সৈন্যদল পোপকে বন্দী করে আনে। বনিফেসের মৃত্যুর পর ফিলিপ পরবর্তী পোপকে নিযুক্ত করেন এবং রোম থেকে পোপের অফিস সরাসরি ফ্রান্সে নিয়ে আসেন। ফ্রান্সের এ্যাভিগনন-এ পোপের অফিস প্রায় ৭০ বৎসর স্থায়ী হয় এবং এ সময়ের মধ্যে নিযুক্ত পোপরা সকলেই ছিলেন ফরাসী। পরে যদিও রোমেই আবার পোপের অফিস স্থানান্তরিত হয় তথাপি কিছুদিনের মধ্যেই সেখানে আবার ধর্মীয় বিরোধ উপস্থিত হয় এবং একই সময়ে তিনজন পোপই নিজেকে সত্যিকার পোপ বলে দাবি করতে থাকেন। ১৪১৮ খ্রিস্টাব্দে কনস্ট্যান্স এর কাউন্সিলের মাধ্যমে এ বিরোধের অবসান ঘটে এবং তিনজন পোপকেই সরিয়ে পঞ্চম মার্টিনকে নতুন পোপ নিযুক্ত করা হয়। এ আভ্যন্তরীণ বিরোধ পোপের প্রভাবকে আরও ক্ষুন্ন করে। যদিও এর পরে প্রায় পাঁচশত বছর পর্যন্ত ইউরোপের রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে ধর্মীয় প্রভাব বিদ্যমান থাকে, তথাপি ইউরোপের সাধারণ মানুষ ক্রমশই পোপের উপর তাদের আস্থা হারাতে থাকে।

<u>তথ্য সূত্র</u> ঃ

১। Editors of the Cothelic Encyclopudia the New Cathelic Dictionary (New York, University College foundation, Vol-7, 1929, P-16-18)

২। এ কে এম শাহনেওয়াজ, পূর্বোক্ত পৃঃ-১৯।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়
উপমহাদেশে বিভিন্ন বনিকদের আগমন ও গির্জা নির্মাণ

পর্তুগীজদের আগমন ও গির্জা নির্মাণ ঃ

এক সময় ভারতবর্ষ মসলা ও ধন সম্পদের জন্য বিশ্ব বিখ্যাত ছিল। ইউরোপীয়দের ভারতবর্ষের ধনসম্পদের প্রতি লোলুপ দৃষ্টি ছিল বলে তারা এদেশে আগমনের সহজ পথ আবিস্কারের প্রচেষ্টা চালায়। এরই ধারাবাহিকতায় ১৪৯৮ খ্রিস্টাব্দে পর্তুগীজ নাবিক ভাস্কো-দা-গামার ভারবর্ষের কালিকটে আগমন ঘটে । পরবর্তীকালে ভারতবর্ষে ইউরোপীয়দের বিভিন্ন বিজয়ের পরে পর্তুগীজদের অভিযানের ইতিহাস শুরু হয়। আর এ জলপথ আবিস্কারের ফলেই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলন ঘটে।

পর্তুগীজ মিশনারীরা ভারতে খ্রিস্টধর্ম নিয়ে আসেন৴ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের খ্রিস্ট মন্ডলীর ন্যায় বঙ্গীয় মন্ডলীও তিনশত বছর যাবৎ পর্তুগালের অভিবাবকত্বে পরিচালিত হয় ।[১]

পঞ্চদশ শতাব্দী হতে পর্তুগীজদের সাথে ফ্রন্সিসকান, আগাস্টিনিয়ান, ডমিনিকান, জেসুইস্ট প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্মের যাজকরা ভারতে আসেন এবং পর্তুগীজ শাসিত জেলা গুলোতে প্রয়োজন অনুযায়ী গির্জা নির্মাণ করেন।[২]

ভাস্কো-দা- গামার জলপথ আবিস্কারের প্রায় ২০ বৎসর পর্যন্ত পর্তুগীজরা বানিজ্যের জন্য বাংলায় আসলে তাদের সাথে ধর্ম প্রচারকরাও ছিল । ১৫১৪ খ্রিস্টাব্দে পর্তুগীজ বনিকরা উড়িষ্যার অন্তর্গত 'পিপলি' নামক স্থানে সর্বপ্রথম বাণিজ্য কুটি নির্মাণ করে । ১৫৩৭ খ্রিস্টাব্দে পর্তুগীজরা চট্রগ্রাম এবং সাতগাঁ হুগালীর কাছে স্বাধীন বসতি এবং স্কুল গৃহ (customhouses) স্থাপনের অনুমতি লাভ করে ।[৩]

বাংলায় পর্তুগীজদের উন্নতিতে অন্যান্য ইউরোপীয় জাতি ওলন্দাজ, ফরাসী, ইংরেজ প্রভৃতি বাংলায় ব্যবসার উদ্দেশ্যে আগমন করে। তবে ধর্ম প্রচার করার আগ্রহ তাদের ছিলনা ।

পর্তুগীজরা একাধারে যেমন সর্বপ্রথম সমুদ্র পথ আবিস্কার করে বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে প্রথম উপমহাদেশে আগমন করে এবং বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করে, তেমনি সর্বপ্রথম এ উপমহাদেশে গির্জাও পর্তুগীজরাই স্থাপন করে। বাংলায় খ্রিস্টান পুরোহিতদের দ্বারা ষোড়শ' শতাব্দীর প্রথম দিকে খ্রিস্টান ধর্মের সূচনা হয়। এসব পুরোহিত গোয়া থেকে পূর্বদিকে অন্যান্য পর্তুগীজ কলোনীগুলোতে পর্তুগীজ ব্যবসায়ীদের সাথে ছিল। কে, এম, রাইজউদ্দিন খান তার 'বাংলাদেশের ইতিহাস পরিক্রমা' গ্রন্থে এভাবে মন্তব্য করেছেন, "পর্তুগীজদের বানিজ্যিক এবং রাজনৈতিক প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে আরো দুটি জিনিস বাংলায় আমদানী হয়-খ্রিস্টান ধর্ম প্রচার ও জলদস্যু।"[৪]

১৫৩৪ খ্রিস্টাব্দে পোপ পল একুয়াম রেপ্তামুস নামক নির্দেশপত্রের মাধ্যেমে গোয়ায় ধর্মপ্রদেশ স্থাপন করেন । ১৫৫৭ সালে খ্রিস্টানরা গোয়াকে প্রধান বা মহাধর্ম প্রদেশে (Metropolitan City) রূপান্তরিত করার পর দক্ষিন পশ্চিম ভারতের (বর্তমান কেরালার) মালাবার উপকূলে কোচিন এবং (বর্তমান মালয়েশিয়ার) মালাক্কাকে এর অধীনস্থ দুটি ধর্ম প্রদেশে পরিণত করে । এ সময় ভারতে ব্যাপকভাবে এবং বিস্ময়কর সাফল্যের সাথে পর্তুগীজরা ধর্ম প্রচার কার্য চালাতে থাকে ।

১৬০০ খিস্টাব্দে গোয়া মহাধর্মপ্রদেশের অধীনে আউগারমলে ধর্মপ্রদেশ (যা ১৬০৫ খ্রিস্টাব্দে ক্রাঙ্গাঁনোর স্থানান্তরিত হয়) এবং ১৬০৬ খ্রি ঃ মাদ্রাজের নিকটবর্তী মাইলাপুরাস্থ রোম ধর্মপ্রদেশ স্থাপিত হয় ।

Dhaka University Institutional Repository

ধর্ম প্রদেশের অধীনস্থ এলাকাসমূহ ছিল ভারতের দক্ষিনাংশ এবং বার্মা ও বঙ্গ সহ পূর্ব উপকূলের অঞ্চল সমূহ। ভারতের অন্যান্য এলাকা গোয়া মহা ধর্মপ্রদেশের অধীন ছিল।[৫]

এছাড়া খ্রিস্টান ধর্ম প্রচার করা তাদের প্রধান কাজ ছিল। তারা হিজলী*, হুগলী**, শ্রীপুর*** প্রভৃতি স্থানে গির্জা স্থাপন করে খ্রিস্টান ধর্ম প্রচার করতে থাকেন। বাংলার নিম্ন শ্রেণীর জনগোষ্ঠি উপর এ ধর্ম প্রভাব বিস্তার করে এবং এ শ্রেণীর অনেকে খ্রিস্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়।

তৎকালীন বঙ্গের সকল ক্যাথলিকরাই ১৫৫৮ খ্রিস্টাব্দে স্থাপিত কোচিন ধর্ম প্রদেশের অধীনে ছিল। কিন্তু কোচিন থেকে কোন নির্দিষ্ট প্রদেশ ধর্মযাজক সরবারহ এবং গির্জা নির্মাণে কোন নিয়মিত ব্যবস্থা ছিলনা।[৬]

চট্টগ্রাম তাদের প্রধান বসতিতে পরিনত হয়। ১৫৬০ খ্রিস্টাব্দে চট্টগ্রাম আরাকান রাজার অধীনে চলে যায় এবং পরবর্তীতে আরাকানীদের সাথে পর্তুগীজদের সুসম্পর্ক গড়ে উঠার সুবাদে ১৫৯০ খ্রিস্টাব্দে তারা চট্টগ্রামের পাহাড়তলীর কাছে এবং দেওয়ানগাতে (দাগনা থেকে) ঘাটি নির্মাণ করে। এ সময় নদীর উপকূলের কাছে একটি ছোট সুরক্ষিত (fortify) বন্দর ছিল এবং এখানেই প্রথম ১৫৯৯ খ্রিস্টাব্দে তারা সেন্ট জন ব্যাপ্টিস্টের নামে এক গির্জা নির্মাণ করে।[৭] চট্টগ্রামে পর্তুগীজদের অন্যান্য বসতিগুলোর মধ্যে কক্সবাজারের কাছে রামু ছিল উল্লেখযোগ্য।

পর্তুগীজদের বিভিন্ন তথ্য থেকে জানা যায় যে, বাকলার বালক রাজা (boy king) বা চন্দ্রদীপের রাজা রামচন্দ্র ছিলেন যশোরের মহারাজা প্রতিপাদিত্যের জামাতা। যীশুর খ্রিস্টান মিশনারী সমাজের সাথে তাঁর সময় সম্পাদিত একটি চুক্তিতে তাঁর রাজ্যে গির্জা ও ধর্মভবন নির্মাণ করার এবং খ্রিস্ট ধর্ম প্রচারের অনুমতি দেওয়া হয়। এ গির্জাটি ১৫৯৯ খ্রিস্টাব্দে যীশুর পবিত্র গির্জা নামে (Christichurch) নির্মিত হয় এবং প্রতাপের প্রতিরক্ষা বাহিনীর পর্তুগীজ অফিসারদের সহায়তায় ১৬০০ খ্রিস্টাব্দে ১লা জানুয়ারী জাঁকজমকপূর্ণভাবে অলংকৃত হয়।[৮] বঙ্গে জেসুইস্ট ফাদারদের এটাই ছিল প্রধান গির্জা।[৯]

মহারাজা প্রতিপাদিত্য ফাদার সেলিচিভোর ডি ফোন্সিকো কে অন্য একটি পাথরের বৃহৎ গির্জা নির্মাণ করার অনুমতি দেন। পাথরের গির্জা কখনও নির্মিত হয়েছিল বলে জানা যায় না। তবে চমৎকার স্থাপত্য শৈলীযুক্ত একটি ইটের গির্জা নির্মিত হয়েছিল। এ গির্জা স্থানীয় জনগনের কাছে একটি বিশেষ আকর্ষনীয় স্থাপত্যে পরিণত হয়েছিল। এ গির্জা সময়ের আবর্তে বিশেষ করে আঞ্চলিক আবহাওয়ার প্রভাবে বিলীন হয়ে গেছে। প্রতাপের রাজধানী ঈশ্বরীপুরের উওর পূর্ব কোনে ইহার স্থান সনাক্ত করা হয়েছে এবং এখন একটি ইটের স্তূপে পরিণত হয়েছে। ইহার কাছে তাদের সমাধিস্থল (graveyard) কলোনী সংযুক্ত ছিল যেখানে এখনও প্রায় ৪০টি সমাধি (grave) দৃশ্যমান।[১০]
[১০]

পর্তুগীজ ধর্মযাজক পেদ্রো তাভারিজ মুঘল সম্রাট আকবরের আমন্ত্রনে ১৫৭৮ খ্রিস্টাব্দে মে মাসে মুঘল সাম্রাজ্য পরিদর্শন করেন এবং এবং সম্রাট তাদের নম্র ব্যবহারে এবং বুদ্ধিদীপ্ত আলোচনায় এত সন্তুষ্ট হন যে, মিশনারিটি ধর্ম প্রচার করার এবং গির্জা নির্মাণ করার অনুমতি লাভ করে। রাজকীয় অনুদানের ফলে পর্তুগীজরা

---

* হিজলীঃ মেদিনীপুর জেলার রসুলপুর নদীর তীরে অবস্থিত প্রাচীন একবন্দর বাংলাদেশ ক্যাথলিক মন্ডল - পূর্বোক্ত - পৃঃ- ১০

** বান্ডেল ঃ পর্তুগীজ ভাষায় (Bandel) শব্দের অর্থ বন্দর। ১৫শ খ্রি ঃ বান্ডেল বন্দরটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। (পূর্বোক্ত- পৃঃ- ১৪)

*** শ্রীপুর ঃ ঢাকা জেলার সোনারগাঁও এর ১৮ মাইল দক্ষিনে মুন্সীগঞ্জ মহকুমার পদ্মানদীর তীরে অবস্থীত বাংলার বার ভূইয়াদের অন্যতম চাঁদ রায় ও কেদার রয়ের - রাজ্যের রাজধানী হিসেবে শ্রীপুর বঙ্গের ইতিহাস এক গুরুত্বপুর্ণ ভুমিকা রয়েছে। (পূর্বোক্ত - পৃঃ -১১)

Dhaka University Institutional Repository

হুগলীতে ১৫৭৯ খিস্টাব্দে একটি কলোনী স্থাপন করে । ১৫৯৯ খ্রিস্টাব্দে এখানে একটি আগাষ্টানিয়ান মঠাশ্রম নির্মিত হয় হুগলীর দু'মাইল উত্তরে বান্ডেল নামে পরিচিত একটি গ্রামে এবং জেসুইস্টের খুব কাছে একটি কলেজ, একটি কুটির (Poor house) এবং অন্যান্য কিছু ধর্মীয় ইমারত নির্মিত হয় ।[১১]

এছাড়া পর্তুগীজ ডমিনিকান ফাদাররা পশ্চিম ভারতের গোয়া ও অন্যান্য অঞ্চল, কোচিন মাইলাপুর, নেগাপত্তম এবং সিংহল ছাড়াও বঙ্গে কর্মরত ছিলেন । এ সকল স্থানে তাদের মঠাশ্রমও গির্জা ছিল । চট্টগ্রামের দিয়াঙ্গাতে (বর্তমানে দিয়াংব) ১৬০১ খ্রিস্টাব্দে তারা ১টি মঠাশ্রম ও গির্জা নির্মাণ করেন । কিন্তু পর্তুগীজদের সাথে আরাকানদের সম্পর্কের অবনতি ঘটলে ডমিনিকান ফাদাররা তাদের নিরাপত্তার অভাব বোধ করায় আরাকান রাজার অনুরোধ উপেক্ষা করে বঙ্গ ছেড়ে স্বদেশে ফিরে যান ।

ইতোমধ্যে (বর্তমান কোরালান্ত) কোচিনের ফ্রান্সিসকান বিশপ দম ফ্রেই আদ্র বঙ্গে ক্যাথলিকদের জন্য একটি ব্যবস্থা গ্রহন করেন । তিনি বঙ্গে প্রচার কাজের একমাত্র অধিকার লাভ করেন ও গির্জাগুলো পরিচালনার দায়িত্ব আগষ্টিনিয়ান যাজকদের হাতে অর্পণ করেন ।

ফলে ১৫৮০ খ্রিস্টাব্দে ফাদার বার্নার্দো দায়েজুস এর নেতৃত্বে পাঁচজন আগষ্টিনিয়ান ফাদার হুগলীতে পদার্পন করেন। নতুন যাজকবৃন্দ সেখানকার গির্জার দায়িত্ব গ্রহণ এবং মঠাশ্রম নির্মাণ করে। ১৬০০ খ্রিস্টাব্দে আগত সাতজন ফাদার কয়েক বৎসরের মধ্যেই পশ্চিমবঙ্গের পিপলি*, হিজলী, তমলুক**, মাইলাপুরে*** নিজেদের দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিতকরে। এভাবে সমগ্র বঙ্গে তারা নিজেদের প্রচারকার্য বিস্তার করেন।

বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত ঢাকা শহরটি ছিল ব্যাপক ব্যবসা বানিজ্যের জন্য বিখ্যাত। এখনে বহু বিদেশী বাবসায়ীদের যাতায়াত ছিল। ১৬০৮ খ্রিস্টাব্দে সুবাদার ইসলাম খাঁ ঢাকাকে সুবে বাংলার রাজধানীতে পরিনত করার পর থেকে ব্যবসা বানিজ্যের জন্য এর গুরুত্ব সবিশেষ বৃদ্ধি পায়। সম্রাটের বদান্যতায় হুগলীতে বসতি স্থাপনের পর পর্তুগীজরা ব্যবসার জন্য ঢাকাতে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করেন। ১৬১২ খ্রিস্টাব্দে আগাষ্টিনিয়ান ফাদাররা ঢাকায় প্রথম খ্রিস্টধর্ম প্রবর্তন করেন। তারা ঢাকার নারিন্দাতে 'স্বর্গোন্নীতা রানী'র গির্জা নির্মাণের পর কিছুকালের মধ্যেই নিকটবর্তী শ্রীপুর ঢাকাজেলার লরিকূল এবং কাত্রাবুতে আরও গির্জা প্রতিষ্ঠা করেন।

১৬২১ খ্রিস্টাব্দে আগাষ্টিনিয়ান ফাদাররা চট্টগ্রামের শহরে একটি গির্জা, আউগারকোলায় একটি বাসভবন এবং বর্তমান বার্মার আরাকানে 'সাফল্যের রাণী' নামে একটি গির্জা নির্মাণ করেন।

১৬২১-১৬৩৪ খিস্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়টি পর্তুগীজদের একটি অন্ধকার যুগ। মগদের সাথে মিলে বিভিন্ন স্থানে (বিশেষ করে উপকূল অঞ্চল গুলিতে) ডাকাতি, লুটতরাজ এবং ধ্বংসাত্মক কার্যকালাপ চালাতে থাকে। এ কার্যকালাপের উপযুক্ত প্রতিশোধ নেবার জন্য মুঘল সম্রাট শাহজাহান বাংলার নবাবকে হুগলিতে পর্তুগীজ কলোনী ধ্বংস করার জন্য আদেশ দেন। ১৬৩২ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট শাহজাহানের নির্দেশে কাশিম খান হুগলি আক্রমন করে পর্তুগীজদের হুগলি থেকে বিতাড়িত করেন। মাত্র এক বৎসর পর অর্থ্যৎ ১৬৩৩ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট শাহজাহানের এক ফরমানের বলে পর্তুগীজরা আবার হুগলিতে ফিরে আসে। তারা ব্যবসা ও ধর্মের ব্যাপারে পুনরায় স্বাধীনতা পায় এবং

---

* পিপলিঃ পুর্তুগীজরা ১৫১৪ খ্রিস্টাব্দে সুবর্নরেখা নদীর মোহনায় চার মাইল দূরে পিপলি শহরের পত্তন করেন। এটিই ছিল বঙ্গোপসাগরের উপকূলে তাদের প্রথম বসতি। এটি ছিল একটি গুরুত্বপূর্ন বন্দর এবং পর্তুগীজ বানিজ্যের একটি বড় কেন্দ্র।পূর্বোক্ত পৃঃ ১০

** তমলুক ঃ মেদিনীপুর জেলার রসুলপুর নদী এবং রুপনারায়ন নদীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত একটি প্রচীন বন্দর পর্তুগীজরা এখানে ব্যবসা করত। পূর্বোক্ত পৃঃ ১০

*** মাইলাপুর ঃ বর্তমানে মাদ্রাজ নগরীর নিকটবর্তী একটি শহর। এর প্রচীন নাম ছিল গালমোনা বা কালামিনা। প্রাচীনকাল থেকে এ স্থানটি পশ্চিম এশিয়া ও ইউরোপের লোকদের কাছে সাধু টমাসের মৃত্যু ও সমাধি স্থান রুপে পরিচিত। (পূর্বোক্ত ঃ পৃঃ ৫০)

Dhaka University Institutional Repository

৭৭৭ বিঘা করমুক্ত জমি লাভ করে।[১২] ১৬৩৩ খ্রিস্টাব্দে তারা বালগাহ বা বর্তমান বান্ডেল নামে পরিচিত স্থানে বসতি স্থাপনের অনুমতি পায়। আগাষ্টানিয়ানরা ৭৭৭ বিঘা জমিতে অবস্থান নেয় এবং ১টি মঠাশ্রম (Monastery) এবং ১টি গির্জা নির্মাণ করে যা পরবর্তীতে বাংলায় তাদের মাতৃভুবনে (Mother house or Mother foundation) এ পরিবর্তীত হয়।[১৩]

জেসুইস্টদের সম্পত্তি তাদের কাছে প্রত্যার্পন করা হয় ১৬৪০ খ্রিস্টাব্দে, কিন্তু তারা হুগলিতে ১৬৬৩ খ্রিস্টাব্দে পূর্বে গির্জা (কুড়েঘর) নির্মাণ করেন।[১৪] ১৬৪০ খ্রিস্টাব্দে আগাষ্ঠিনিয়ানরা বালোঘরে বনজা গ্রামে ও পরবর্তীতে ওসামপুরে নদীর তীরে এবং রাঙ্গাঁমাটিতে গির্জা নির্মাণ করে।

১৬৩২ খ্রিস্টাব্দে পর্তুগীজদের অবস্থান নড়বরে হয়ে যায়। শায়েস্তা খান কর্তৃক চট্রগ্রামের সাথে পূর্ববাংলা জয়করার সাথে সাথে পর্তুগীজ জলদস্যুতার যুগ শেষ হয়ে যায়। অন্যান্য ইউরোপীয়দের আগমনের সাথে সাথে পর্তুগীজদের বিদায় ঘন্টা বেজে উঠে।

১৬৪০ খ্রিস্টাব্দে ফ্রেই ম্যানরিক পূর্ব বাংলায় ঢাকায় (Our lady of the assumption) নামে উৎসর্গকৃত গির্জার কথা উল্লেখ করেন। তিনি দেওয়ানগার গির্জা এবং নদীর দক্ষিণ তীরে পর্তুগীজদের বসতি স্থাপনের কথাও উল্লেখ করেন।

এছাড়াও পর্তুগীজরা তেজগাঁও সি, এস, রোজারীও গির্জার কাছে একটি কবরস্থান স্থাপন করেন। টঙ্গী থেকে ১৬ মাইল পূর্বে নাগরী নামক একটি গ্রামে অদ্যাবধি অক্ষত অবস্থায় দন্ডায়মান তাদের প্রাথমিক সময়কালের একটি গির্জা সনাক্ত করা হয়েছে, এটি ১৬৬৩ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত হয়েছিল বলে ধারনা করা হয়। ১৬৭৭ খ্রিস্টাব্দে পর্তুগীজদের দ্বারা তেজগাঁয়ে আরেকটি (বর্তমানে পুনঃ সংস্কার করা) গির্জা এখনও অক্ষত অবস্থায় দন্ডায়মান।[১৫]

১৬৬৬ খ্রিস্টাব্দে চট্রগ্রাম বিজয়ের বৎসর আসাম মুঘল সাম্রাজ্যভুক্ত হয় । বাকেরগঞ্জ এবং নোয়াখালীতে যেখানে পর্তুগীজদের বসতি ছিল সেখানে গির্জা নির্মাণ করে। যদিও সেগুলো সময়ের আবর্তে অদৃশ্য হয়ে গেছে কিন্তু তা সত্বেও তাদের কিছু কিছু চিহ্ন বা নিদর্শন আজও আছে যা বর্তমান কালে তাদের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

জেসুইস্ট (Gesuits)-দের আগমন ঃ

১৫৯০ খ্রিস্টাব্দে ফাদার ফ্রেন্সিসকো ফার্নান্দেজ এস, আই (SI) এবং তাঁর সহযোগী ফাদার জেমিনগোকে জেসুইস্টদের উদ্যোগে জেসুইস্টদের মধ্য থেকে বাংলার জন্য ধর্মযাজক হিসেবে প্রেরণ করা হয়। ১৫৯৯ খ্রিস্টাব্দে তারা হুগলীতে আসে। সেখানে বিদ্যমান গির্জার দায়িত্ব পালন ও তত্ত্বাবধান করেন। একটি রির্পোট অনুসারে জেসুইষ্ট ধর্মযাজক অ্যান্টোনিয়ো ভাজ এবং পেড্রো ডিয়াস এবং একজন ধর্মনিরপেক্ষ (Secular) ধর্মযাজক ফাদার জুলিয়ানো পেরিয়েরা ১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দে বাংলায় ছিলেন। ইতোমধ্যে বাংলার বিভিন্ন অংশে ক্যাথলিক সম্প্রদায় গড়ে উঠেছিল। ১৫৯৮ খ্রিস্টাব্দে একমাত্র হুগলিতেই ক্যাথলিক ছিল ৫০০০, চট্রগ্রাম ইন্দো-পর্তুগীজদের আদি (origin) ক্যাথলিকরা ছাড়াও দেশীয়রাও ছিল।

চট্রগ্রাম আরাকান রাজার শাসনাধীনে থাকাকালে আরও দু'জন জেসুইস্ট মেলফোর ফ্রেন্সিসকো এবং ফাদার আন্দ্রী বোথস ১৫৯৯ খ্রিস্টাব্দে হুগলীতে আসে এবং রাজার কাছ থেকে খ্রিস্ট ধর্ম প্রচারের প্রয়োজনীয়

লরিকূল ঃ কারও কারও মতে এ স্থানটির নাম লরিকূল। ঢাকা শহরের ২৮ মাইল দক্ষিণে এবং হাসনাবাদ গির্জা থেকে ১০ মাইল দক্ষিণে পদ্মা নদীর তীরে এটি অবস্থিত ছিল। পরবর্তীকালে ইহা নদীর ভাঙ্গনে বিলুপ্ত হয়। (পূর্বোক্ত পৃঃ-১১)
কাত্রাভু ঃ ঢাকা জেলার খিজিরপুরের বিপরীতে শীতলক্ষ্মা নদীর তীরে অবস্থিত। (পূর্বোক্ত পৃঃ)

Dhaka University Institutional Repository

অনুমতি লাভ করে। রাজা তাদেরকে সাহায্য এমন কি ছোট গির্জা নির্মাণে আর্থিক সাহায্য প্রদান করেন। বাকেরগঞ্জ জেলার চান্দিকানে (যশোর ধুমঘাট হিসেবেও পরিচিত) পর্তুগীজদের বসতি ছিল। ফাদার ডি সুজা এখানে আসেন এবং পরবর্তীতে ১৫৯৯ খিস্টাব্দে ফার্নান্দেজ ধর্মপ্রচারে রাজার আনুমতি নিয়ে তাঁর সাথে যোগদেন। তাঁরা এখানে একটি খ্রিস্টান বসতি গড়ে তোলে ও যীশুর পবিত্র ঘর নামে ১৬০০ খ্রিস্টাব্দে একটি নতুন গির্জা উৎসর্গ (consecrate) করে।

বার ভূইযাদের মধ্যে একজন রাজার রাজত্ব কালে বাক্লায় ফাদার মেল চোয়ের ডা ফেলসেকা রাজার অনুমতি লাভ করে এবং ধর্ম প্রচারের বেশ সফলতা লাত করে। সেখানে তিনি একটি পর্তুগীজ কলনী দেখতে পান সেখানে বহুদিন কোন ধর্মযাজক পরিদর্শনে আসেনি বা কলার ফাদার ডাফোনসেকো একটি বসতি এবং ১টি গির্জা নির্মাণ করেন। ফাদার আন্দ্রে বোফেস, ফাদার ফার্নান্দেস ১৬০১ খ্রিস্টাব্দে চট্রগ্রামে একটি গির্জা নির্মাণ করে সেন্ট জন ব্যাপ্টিষ্ঠ এর নামে উৎসর্গ করেন।

পর্তুগীজ ব্যবসায়ীদের সাথে আরাকান রাজার সাথে শত্রুতা সৃষ্টি হওয়ায় আরাকান রাজা চট্রগ্রাম আক্রমন করেন, ফাদার ফার্নান্দেজকে আটক করা হয় ১৬০৬ খ্রিস্টাব্দের ১৪ই নভেম্বর আরাকানদের হাতে তিনি নিহত হন। ফাদার বোফেসও আরাকানদের হাতে নিগৃহিত (victim) হন। জেসুইস্টদের (jesuits) ফিরিয়ে আনা পর্যন্ত পাঁচ বৎসর খুব কষ্টে অতিবাহিত হয়।

১৬০৬ খ্রিস্টাব্দে মাইলাপুরে খ্রিস্টান শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় এবং বাংলাও এ শাসনাধীনে ছিল। জুসেইষ্টরা ১৬১৭ খ্রিস্টাব্দে বাংলায় ফিরে আসে এবং বাংলাসহ সারা হুগলিতে তাদের কাজ কর্ম চালিয়ে যেতে থাকে। তারা একটি গির্জা নির্মাণ করে এবং একটি কলেজ এবং একটি আবাসিক হাসপাতাল চালু করে।

ক্যাটেখিস্ট অ্যান্থনি (Catechist Anthony) ঃ

গ্রীক ভাষায় catechism' অর্থ মৌখিক শিক্ষাদান। ক্যাথলিক মন্ডলীতে এ শব্দটির অর্থ, প্রশ্নোত্তরের মাধ্যেমে শিক্ষাদান। যে ব্যাক্তি এধরনের শিক্ষা দেন তিনিই ক্যাটেখিস্ট নামে পরিচিত। ধর্ম শিক্ষাদান ছাড়াও ক্যাটেখিস্টরা ধর্ম প্রচারও প্রার্থনা অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন। বুসনা অ্যান্থনি একজন ধর্মান্তারিত ধর্মযাজক ছিলেন। এধরনের ধর্মযাজকদের ক্যাটাখিষ্ট (catechist) বলা হতো। তিনি অনেক নিম্নবর্ণের হিন্দুকে খ্রিস্ট ধর্মে দীক্ষিত করেন এবং এসব খ্রিস্টানদের একজন ধর্মযাজকের অধীন অঞ্চলে আনয়ন করেন । এখন রাঙ্গামাটিয়া তুমিলিয়া, নাগরী, মঠবাড়ী মাউসাদ এবং সম্ভবত হাসনাবাদ ও গোয়া একটি অঞ্চল (belt) হিসেবে পরিচিত। বুসনার অ্যান্থনি ছিলেন বুসনার রাজার পুত্র। আরাকানরা তাকে অপহরন করে আনলে ফ্রেই ম্যানুয়েল ডি রোজারিও তাকে ক্রয় করেন এবং তিনি খ্রিস্ট ধর্মে বিশ্বাসী হয়ে পড়েন। পরবর্তীতে তিনি খ্রিস্ট ধর্মের হয়ে কাজ করেন এবং অনেক লোককে খ্রিস্ট ধর্মে ধর্মান্তরিত করেন।

বাংলায় ফরাসীদের আগমন ঃ

বাংলায় ফরাসী আগমন একটি আকস্মিক ঘটনা। হুগলিতে ফরাসী জাহাজ 'ফ্রেসিয়' ডাচরা অবরোধ করে নিয়ে এসেছিল। ফরাসীরা অবরোধমুক্ত হয়ে এখানেই স্থায়ী বসতি স্থাপন করে এবং চন্দন নগরে ফ্যাক্টরী স্থাপন করে। মাইলাপুরের বিশপ মন্সডেন গ্যাসপার আলফোনসো আলফারেজ চন্দন নগরে বিশেষ প্যারিস গঠন করেছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

১৬৩২ খ্রিস্টাব্দে হুগলিতে পর্তুগীজদের অবস্থান নড়বড়ে হয়ে যায়। হুগলির চিনসুরায় ডাচরা এবং ফরাসীরা চন্দন নগরে বসতি স্থাপন করে।

ইংরেজদের আগমন ঃ

ইংরেজরা কলকাতায় ১৬৮৯ খ্রিস্টাব্দে আগমন করে। তারা পর্তুগীজদের কে ফোর্টের (ফোর্ট উইলিয়াম) পাশে মিশন প্রতিষ্ঠা করার জন্য দশ বিঘা জমি দেয়। আগাস্টানিয়ানরা অবিলম্বে সেখানে একটি কাঠের Chapel নির্মাণ করে। ১৭০০ খ্রিস্টাব্দে মুগরাহাট্টায় তারা একটি স্থায়ী গির্জা নির্মাণ করে এবং ১৭২০ খিস্টাব্দে ইহা বর্ধিত করা হয়।

মাইলাপুরের এম জি বিশপ মনস লরেন্স বাংলা (১৭১২-১৫ খ্রিস্টাব্দে) পরিদর্শন করেন। তিনি হুগলি কলকাতা, চন্দননগর, বান্ডেল পরিদর্শন করেন এবং ১৭১৩ খ্রিস্টাব্দে জানুয়ারীতে চট্রগ্রামে আসেন। চট্রগ্রামে খ্রিস্টানদের তিনটি কলোনি ছিল, প্রত্যেকটির সাথে একটি ক্যাপ্টেন, ১টি গির্জা এবং একজন প্রার্থনাকারী বা যাজক ছিল। অধিকাংশ অধিবাসীই (Natives) ছিল দাস বা 'Slave' খ্রিস্টান।

১৭১৩ খিস্টাব্দেই বিশপ লরেন্স প্রথম ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা হন এবং পথে তিনি নোয়াখালীর কাছে একটি ছোট শহর বালুয়া (ভোলা) পরিদর্শন করেন। সেখানে পাঁচ বৎসর যাবৎ কোন ধর্মযাজক পরিদর্শন করেননি। ঐ বছরের শেষেই তিনি ঢাকায় ফিরেন। ফাদার বারবিয়ার ঢাকার পশ্চিমে একটি গির্জার বর্ণনা দিয়েছেন। মূলতঃ ঢাকায় তখন নোংরা এবং দূর্বল ব্যবস্থাপনা ছিল। বিশপ ওসামপুরের এক বিশাল খ্রিস্টান জনগোষ্ঠির সাথে একটি মিলিটারী ষ্টেশন এবং তেজগাঁও গির্জা পরিদর্শন করেন। এরপর যথাযথভাবে ভাওয়ালের নাগরীতে যান। এরপর তিনি ঢাকা এসে হুগলি এবং চন্দন নগরে ফিরে যান। ফাদার বারবিয়ারের রিপোর্ট অনুযায়ী বাংলায় তিন ধরনের খ্রিস্টান ছিল ঃ

(১) ইউরোপীয়-যারা মিল কারখানা এবং ব্যবসা বানিজ্যে নিয়োজিত ছিল।

(২) বনিক শ্রেণী-মুঘলদের কাছে নিয়োজিত সম্ভবত পর্তুগীজ এবং তাদের বংশধরেরা। অধিক সংখ্যক mercenaries হুগলি, পিপলি, চট্রগ্রাম, ঢাকা, ওসামপুর, রাঙ্গামাটি এবং অন্যান্য জায়গায় ছিল।

(৩) ধর্মান্তরিত-খ্রিস্টধর্মে দীক্ষাপ্রাপ্ত (ধর্মান্তরীত) স্থানীয় জনগন।[১৬]

যদিও বিশপ ন্যাস্পি শান্তিপূর্নভাবে বাংলা পরিদর্শন করেছিলেন, কিন্তু বাংলার মিশনগুলো আগাষ্টানিয়ানদের সাথে একচেটিয়া ভাবেই টিকেছিল। বান্ডেল জেসুইস্টদের অধীনে থাকলেও সরাসরি মাইলাপুরের বিশপের কর্তৃত্বাধীনে ছিল। ১৬৯৫ খিস্টাব্দের আগে চন্দন নগরের ফরাসীদের উপরও জেসুইস্টের ব্যাক্তিগত আধিপত্য ছিল। কিন্তু আগাষ্টিনিয়ানদের উপস্থিতিতে আপত্তি উথাপিত হয়। বিশপ বান্ডেল আগাষ্টেনিয়ানদের ফিরিয়ে দিতে অস্বীকার করলে তারা জনগনের কাছে বিষয়টি পুনঃর্বিবেচনার জন্য প্রার্থনা জানায়। বিভিন্ন দিকে বিশৃংখলা দেখা দিলে বিশপ বান্ডেল গির্জা বন্ধ ঘোষনা করেন।

সতের শতকে ফিরিঙ্গি বাজার একটি পর্তুগীজ র‍্যামনান্ট বা ছোট গির্জায় রূপন্তরিত হয়। এখানে পর্তুগীজ বসতি ছিল । চট্রগ্রামে পর্তুগীজদের প্রাথমিক গির্জা এলাকা (Our lady of the immaculate) এখন জামাল খান নামে পরিচিত।

ফ্রেই এ্যামবরোরিয়া সান্ডো অগোষ্টিনো ১৭২৫ খ্রিস্টাব্দে ভাওয়ালের নাগরী গির্জার ভাইকার ছিলেন। ১৭৫০ খ্রিস্টাব্দে তিনি বিপুল সংখ্যক নবীন এবং বৃদ্ধ উভয় শ্রেনীর খ্রিস্টানদের কথা এমনকি গোড়া (occult) খ্রিস্টান, যারা মুসলমান ছিলেন তাদের কথা বলেন এবং মুঘল শাসকরা মুসলমানদের খ্রিস্টধর্মে ধর্মান্তরিত হওয়ার ব্যাপারে বাধা দান করেন। ফ্রেই অ্যামবারাদিয়ে প্রায় তিনশত লোক খ্রিস্ট ধর্মে দীক্ষিত করেন।

Dhaka University Institutional Repository

মানসপুরে তিনি ২৫০ জন ব্যক্তি এবং তাদের সন্তান-সন্তাতিদের ধর্মান্তরিত করেন এবং ২৫ জন ক্যাটেখ্রিস্টদের তাদের ধর্ম বিশ্বাসে অবিচল থাকতে দেন। ঢাকার নবাব তাদের ভৎসর্না করেন এবং সকল খ্রিস্টানদের বন্দী করতে এবং তাদের গির্জা ধ্বংস করতে নির্দেশ দেন। কিন্তু; পর্তুগীজরা ধ্বংস করে প্রতিশোধ নিতে পারে এ ভয়ে শাস্তি প্রত্যাহার করা হয়। ১৭৫০ খ্রিস্টাব্দে আগাষ্টিনোর অধীনে ১৭২৩ জন খ্রিস্টান ছিল। যাদের অধিকাংশই ছিল গোড়া বা occult খ্রিস্টান।

বাংলায় ডাচদের আগমনঃ

ডাচরা বাংলায় ১৬১৫ খিস্টাব্দে আসে, প্রথমে তারা এখানে স্থায়ীভাবে বসবাস না করলেও ১৭শ শতকের মাঝামাঝি সময়ে তারা হুগলিতে স্থায়ী বসতি স্থাপন করে। ১৭৪০ খিস্টাব্দে প্রথম তারা তাদের 'Chapel' নির্মাণ করে।

ইংরেজরা ১৭৫৭ সালে যখন কলকাতায় ফিরে আসে তারা মুগরা হাট্রা গির্জায় অবস্থান গ্রহন করে এবং চার বৎসরের জন্য ইহা প্রটেস্টান্টদের প্রার্থনা কেন্দ্রে পরিণত হয়। ১৭৬০ সালে একটি নতুন গির্জা নির্মাণ করা হয় এবং পূর্বভারতীয় বনিক সমিতি এ মর্মে স্বীকৃতি প্রদান করে যে পর্তুগীজদের গির্জাটি পাদ্রী ক্যাইটেনো ম্যাডরি দিয়াস (Caietano de Madre de Deus) এর কাছে প্রর্ত্যাবর্তন করা উচিত। এভাবে গির্জাটি ক্যাথলিকদের কাছে প্রর্ত্যাবর্তন করা হয়।

১৭৫৭ সাল পরে রাজা বল্লব সেনকে তাঁর প্রজাদের নানা প্রকার উৎপীড়ন দমনের ব্যাপারে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে আগাষ্টানিয়ানরা একটি তালুক লাভ করে। তদানুযায়ী বল্লব সেন ব্যানডেলের মিশনারীর কাছে কিছু লোক চেয়ে পাঠান এবং তারা চার জন লোককে প্রেরণ করে। তারা ধর্মীয় কার্য পরিচালনার জন্য চার খন্ড ভূমি বরাদ্দ করেন। বল্লবসেন তাঁর রক্ষনাবেক্ষনের জন্য ভাওয়াল নামে অভিহিত চারখন্ড জমি দান করেন। ভাওয়ালগুলো চারজন খ্রিস্টানের অধিনে রাখা হয় কিন্তু তারা এগুলোর প্রশাসন কার্য পরিচালনায় অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করলে ভাওয়ালগুলোকে একটি তালুকে রূপান্তরিত করে একজন ধর্মযাজকের অধীনে ন্যাস্ত করা হয়।

১৭৭৭ খ্রিস্টাব্দে সম্ভবত আগাষ্টিনিয়ানদের দ্বারা (our lady of the Rosary) আমাদের লেডি অব দি রোজারীও গির্জাটি নির্মিত হয়। গির্জার দলিল দস্তাবেজ হতে প্রমাণিত হয় যে হাসনাবাদের মিশনারীরা তিনশত বৎসর পূর্বে হাসনাবাদে এসেছিল। অত্র অঞ্চলের মুঘল জমিদার (zamindar) তার প্রজাদের মধ্যে ধর্মযাজকের সফলতা লক্ষ্য করে তাঁকে বধ কল্পে একটি কূপের মধ্যে নিক্ষেপ করেন। কিন্তু পুরোহিত এ দূর্ঘটনা থেকে দৈব ক্রমে বেঁচে যান। পরবর্তীতে উক্ত ধর্মযাজককে একটি গির্জা নির্মানের অনুমতি দেওয়া হয়।

হুগলির জেসুইষ্ট (Jesuits) গির্জা ধ্বংস স্তুপে পরিণত একটি নারিকেল বাগান গড়ে ওঠে। ১৭৪০ খিস্টাব্দে ফ্রান্সে এবং ১৭৭৩ খ্রিস্টাব্দে বাংলায় যীশুর সমাজ নামের সংগঠনটির বিনাশ করা হয়। আগাষ্টিনিয়ানরা সংখ্যায় যথেষ্ট না হওয়ায় গোয়া হতে ধর্মনিরপেক্ষ যাজক প্রেরণ করা হয়। কিন্তু তাদের প্রশাসনিক কাজের প্রস্তুতি না থাকায় তারা প্রশাসনিক দক্ষতা দেখাতে পারেনি। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে ধর্মীয় বিশ্বাসের ক্ষেত্রে একটি দূর্বলতার লক্ষণ সুস্পষ্ট হয়ে উঠে এবং খ্রিস্টধর্মের জন্য একটি অন্ধকার যুগের আবির্ভাব হয়। খ্রিস্টানরা হুগলি পরিত্যাক্ত করে। উড়িষ্যার একটি বিরাট খ্রিস্টান বসতি বিতাড়িত করা হয় এবং বলাসর পরিত্যাক্ত হয়। ১৭৮০ সালের দিকে হুগলিতে পাঁচ জন, কলকাতায় দুই জন, শ্রীরামপুরে একজন, চিনসুরা এবং বান্ডালে একজন করে আগাষ্টিনিয়ান ছিল। আসামে কোন পুরোহিত বাস করত না। পূর্ব বাংলায় ৮ জন আগাষ্টানিয়ান ছিল, চট্রগ্রামে দু'জন, নাগরীতে ২ জন এবং হাসনাবাদ, তেজগাঁ, পাঞ্জরী এবং শিবপুরে একজন করে।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলায় প্রটেস্টান্টদের আগমন ঃ

কলকাতায় ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের পতনের সময় ঘনিয়ে এলেও প্রটেস্টান্টদের সংখ্যা সেখানে দ্রুত গতিতে বাড়তে থাকে। প্রথম প্রটেস্টান্ট অষ্টাদশ শতাব্দীর শুরুতে বাংলায় আসে। কিয়ারনান্দার একজন অ্যামুলিকান মিনিষ্টার কলকাতায় ১৬৮৫ - ১৭০৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত কাজ করেছে। তার সময়ে ৫ হাজার লোক খ্রিস্ট ধর্মে দীক্ষিত হয়। (তার মধ্যে তিন হাজার জন পূর্বে ক্যাথলিক ছিল) তিনি বিদ্যালয় এবং এতিমখানা প্রতিষ্ঠা করেন।

ধর্মান্তরিত (Baptists) খ্রিস্টানরা ১৭৯৯ খ্রিস্টাব্দে বাংলায় আসে এবং শ্রীরামপুরে বসতি স্থাপন করে। প্রটেস্টান্টদের মধ্যেও যে বিভিন্ন শ্রেণী বিভাজন (একেক শ্রেণীর বিশ্বাসে কিছুটা প্রার্থক্য পরিলক্ষিত হয়) রয়েছে তারা পরবর্তী বৎসর গুলোতে বাংলায় এসেছিল। তারা বিদ্যালয়, দাতব্য প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে। ইহার ফলশ্রুতিতে ক্যাথলিকরা তাদের (প্রটেষ্টানদের) বিদ্যালয় যোগাদান করতে বাধ্য হয়।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে কলকাতা একটি বড় রকমের গির্জার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। মুগরা হাট্টায় ভারতের সবচেয়ে সমৃদ্ধশালী গির্জাটি নির্মিত হয় এবং একই বৎসর ১৭৯৭ নভেম্বর মাসে ফাদার ফ্রেই ফ্রেন্সিসকো ডি সান্তা ম্যারিয়া কর্তৃক আশীবাদিত হয় এবং 'আওয়ার লেডি অব দি রোজারিও' (Our lady of the Rosariy) সম্প্রতি উৎসর্গকৃত হয়।

তারা এসে মুর্গাহাট্টায় প্রথম বসতি স্থাপন করার পর কলকাতার অন্যান্য এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। এসময় মুর্গাহাট্টার গর্ত ভর্তি করে সার্কুলার রোড নির্মিত হয়। তারা ধর্মতলা এবং বড় রাজপথের চতুস্পার্শে বাস করত। ক্যাথলিকরা বয়টাখানার কাছে বসতি স্থাপন করেছিল। তারা একটি গির্জার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ১৮০৪ খিস্টাব্দে বয়টখানার কাছে একটি গির্জা নির্মানের অনুমতি প্রদান করে। চারজন পর্তুগীজ ব্যবসায়ীর সহায়তায় সেনহোরা গ্র্যাটিয়ো এলিজাবেথ নামক এক মহিলা গির্জাটি স্থাপন করে। ১৮১০ সালে 'আওয়ার লেডি অব দি ডোলোমার' (Our lady of the Dolomer) এর প্রতি গির্জাটি উৎসর্গীত হয়।

১৮১৩ সালে মুর্গাহাট্টা গির্জাটি তাদের ধর্মযাজকদের নাম করন নিয়ে সমস্যার সম্মুখীন হয়।

আর্মেনিয়ানদের আগমন ঃ

আর্মেনিয়ানরা ঢাকায় কবে এসেছিল জানা যায়নি। তবে ধরে নিতে পারি, মুঘল আমলে ভাগ্য এলাতে দেশ বিদেশে থেকে যখন অনেকে এসেছিল ঢাকায়, আর্মেনিয়রাও এসেছিল তখনই । ১৮শ শতকের প্রথম দিকে আর্মেনিয়ানরা ঢাকায় একটি কলোনী সথাপন করে। তারা এখানে পাট কাপড়, লবন, শুপারী ব্যবসা করতঃ এমনকি তাদের মধ্যে অনেকের জমিদারীও ছিল। তেজগাঁতে 'আওয়ার লেডি অব দি রোজারিও' ক্যাথলিজ গির্জায় আর্মেনিয়ানদের কিছু পুরাতন সমাধি রয়েছে, যাদের মৃত্যু হয়েছিল ১৭১৪ থেকে ১৭৯৫ সালের মধ্যে[১৭]। সুতরাং ধরে নিতে পারি সপ্তদশ শতকেই আর্মেনিয়ানরা দু'একজন করে আসতে থাকেন ঢাকায় এবং বসবাস শুরু করেন। তাঁরা যে অঞ্চলে বসবাস করে সে সময় থেকে সে অঞ্চল আর্মেনীটোলা নামে। পরিচিত।[১৮] বর্তমানে বিদ্যমান Holy Resurrection বা পবিত্র আত্মার পুনরুত্থান গির্জাটি পুরাতন ধ্বংসপ্রাপ্ত চ্যাপেল (chapel) এর উপর নির্মাণ করা হয়েছিল ১৭৮১ খিস্টাব্দে নির্মিত এই গির্জা আর্মানিটোলা গির্জা নামেও পরিচিত ।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রীকদের আগমন ঃ

১৮শত শতকের দ্বিতীয়ার্ধে গ্রীকরা ঢাকাতে প্রথম বসতি স্থান করে। Alenis Argyree পূর্ব পুরুষদের দ্বারা কলকাতাতে গ্রীক কলোনীর প্রতিষ্ঠাতা। তারা তাদের বসত বাড়ী ঢাকা এবং বাকেরগঞ্জে স্থাপন করে। তাদের প্রথম গির্জা তৈরী করেছিলেন ঢাকাতে। ১৮২১ খ্রিস্টাব্দে তাদের গির্জাটি ১৮৯৭ সালে ভয়াবহ ভূমিকম্পে ধ্বংস হয়ে যায়।[১৯]

তথ্য নির্দেশিকা ঃ

১। জেরোম.ডি.কস্তা, বাংলাদেশ ক্যাথলিক মন্ডলী, বাংলা বাজার (১৯৮৩, ঢাকা), পৃঃ-১

২। Father Poulinus Cortes, The Catholic Church in Indian Subcontinent. (Dhaka, 1990), P-19

৩। Ibid -

৪। পূর্বোক্ত, পৃঃ-৫১২

৫। Manuscript - "The Church of the Augustenians in Dacca" Father Admond. N. Goadert, C.S.C. (Dhaka, 1998), PP-10-12.

৬। The Catholic Church in the Indian Subcontinent, Op cit, P-9.

৭। Bengal Past and Present, (1916), P-261-162.

৮। The Catholic Church in the Indian Subcontinent, Opcit, P-5

৯। বাংলাদেশ ক্যাথলিক মন্ডলী, পূর্বোক্ত, পৃঃ-৮

১০। Du Jarrics Historedes Indes Oriental P-832-34. Sir Jaderalts Sarker's Tr. Prabari-1328-Ararh, P-323, Boveridge's Bakarganj 31, S.C. (Satis Chandra) Mitrws Khulnar Itihash P-298-302 and 303-304, Dr. Nazimuddin Ahmed এর Buildings of the British Raj-P-5 থেকে উদ্ধৃত।

১১। Op cit - P-6

১২। বাংলাদেশের ইতিহাস পরিক্রমা, পূর্বোক্ত, পৃঃ-৫১৩

১৩। The Catholic Church in the Indian Subcontinent, Op cit, P-11

১৪। Ibid

১৫। The Catholic Church in the Indian Subcondinent, Op cit, P-7

১৬। Op cit, P-14-15

১৭। Buildings of the British Raj-Op cit, P-9

১৮। মুনতাসীর মামুন, পূর্বোক্ত, পৃঃ-১৬

১৯। Buildings of the British Raj-Op cit, P-10

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

বঙ্গে খ্রিস্টানদের আগমন এবং খ্রিস্ট ধর্ম প্রবর্তন

১৫০০ খ্রিস্টাব্দ হতেই পর্তুগীজ বনিকরা ভারতের গোয়াতে নিয়মিত যাতায়াত শুরু করে। ১৫১৭ খ্রিস্টাব্দে থেকে তারা নিয়মিত পশ্চিমবঙ্গে ও চট্রগ্রামে বসতি স্থাপন করে। আরাকান রাজাদের অনুমোদনক্রমে তারা ধর্ম প্রচারের কাজও শুরু করেন। সম্রাট আকবরের অনুমোদনে ১৫৭৯ খ্রিস্টাব্দে হুগলীর সন্নিকটে সাতগাঁয়ে বঙ্গে প্রথম গির্জা নির্মিত হয়। ১৫০০ খ্রিঃ হতেই বিভিন্ন যাজক সংঘ যেমন ঃ ফ্রান্সিসকান, ডমিনিকান, আগাস্টানিয়ান প্রভৃতি সংঘ ভারতবর্ষে খ্রিস্টধর্ম প্রচার শুরু করে। ১৫৯৮ খ্রিস্টাব্দে চট্রগ্রাম উপকূলে স্থানীয় খ্রিস্টান ছাড়াও ২৫০০ পর্তুগীজ ইন্দো-পর্তুগীজ বংশোদ্ভূত ক্যাথলিক ছিলেন।

ঢাকায় খ্রিস্টধর্মের প্রবর্তন ঃ

খ্রিস্টানদের বিভিন্ন ধর্মপল্লী অর্থাৎ কোন ধর্মযাজকের শাসনাধীন এলাকা নিয়ে (যেখানে তাদের গির্জা নির্মাণ করা হয়েছে) গঠিত অঞ্চলকে মহাধর্মপ্রদেশ বলা হয়। ঢাকার মহাধর্ম প্রদেশের অধীনে রয়েছে তেজগাঁও, লক্ষীবাজার নাগরী, তুমুলিয়া, রাঙ্গামাটি, হাসনাবাদ, গোয়া, মাউসাদ ইত্যাদি ধর্ম পল্লী।

ঢাকায় প্রথম ক্যাথলিক গির্জা নির্মিত হয় সপ্তদশ শতকের গোড়ার দিকে। মুঘল সুবেদার ইসলাম খান ঢাকা শহরকে ১৬১০ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গের রাজধানীতে পরিনত করেন। তখন থেকে বিদেশী বনিকদের কাছে ঢাকার গুরুত্ব বেড়ে যায়। পর্তুগীজসহ বিদেশী ব্যবসায়ীরা বুড়ীগঙ্গা নদীর তীরে একটি বসতি গড়ে তোলে। পর্তুগীজ বনিকদের সাথে মিশনারীরা ঢাকার আসেন। আগাস্টিয়ান ফাদাররা ১৬১২ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা খ্রিস্টধর্ম প্রচার শুরু করেন। সম্ভবত ১৬১৫ খ্রিস্টাব্দে তারা ঢাকা শহরের নারিন্দা অঞ্চলে একটি গির্জা নির্মাণ করেন কিন্তু গির্জাটি বর্তমানে ধ্বংসপ্রাপ্ত। ঢাকা শহরের দ্বিতীয় গির্জাটি ১৬৭৭ খ্রিস্টাব্দে তেজগাঁও এলাকায় নির্মিত হয় যা "হলি রোজারীও গির্জা" বা জপমালা রানীর গির্জা নামে কালের সাক্ষী হয়ে এখনও দন্ডায়মান।

ফাদার গেডার্ট সি এস সি র মতানুযায়ী ১৬৩২ খ্রিস্টাব্দে মুঘল সৈন্যদের দ্বারা যখন হুগলী নগরী সম্পূর্ন ধ্বংস হয় তখন অনেক ক্যাথলিক হুগলী ছেড়ে বিভিন্ন জায়গাতে আশ্রয় নেয়। সম্ভবতঃ সে সময় হাসনাবাদ হতে ১০/১২ মাইল দূরে ফরিদপুরের লরিকূল ও মুন্সিগঞ্জের শ্রীপুরে কিছু ক্যাথলিক আশ্রয় নেয়। কিন্তু ঐ সময় কোন স্থায়ী পুরোহিত ঐ অঞ্চলে ছিলেন না। কোন গির্জাও নির্মিত হয়নি। কয়েক দশকের মধ্যে নদী ভাঙ্গনের কারনে তা'রা আঠার গ্রাম অঞ্চলে ছিলেন না। তখন গির্জাও নির্মিত হয়নি। তাঁরা আঠার গ্রাম অঞ্চলে আবাস গড়ে। ১৬৪২ খ্রিঃ জেসুইস্ট পুরোহিতদের পত্রালাপে এবসতি সম্পর্কে জানা যায়। ১৬৮২ খ্রিস্টাব্দে আগাস্টানিয়ানদের তালিকানুযায়ী প্রায় ২০০০ ক্যাথলিক লরিকূল অঞ্চলে বাস করত। এ সময় সমগ্র পূর্ববঙ্গে ক্যাথলিক খ্রিস্টানদের সংখ্যাছিল ৭১২০ জন।

সম্ভবত ঃ ১৬৬৩ খ্রিস্টাব্দে ভূষনার রাজার এক ছেলে খ্রিস্টধর্ম গ্রহন করেন এবং ঐ অঞ্চলে খ্রিস্টধর্ম প্রচার করেন। ভূষণা লরিকূল হতে কয়েক মাইল দূরে অবস্থিত ছিল। তিনি আন্তইন দ্যা রোজারিও নাম গ্রহন করেন। অনেকে তখন খ্রিস্টধর্মে বিশ্বাসী হয়। তাঁর নিজের অঞ্চলে তিনি তেমন সফলতা অর্জন না করায় বর্তমান ভাওয়াল অঞ্চলে তিনি প্রচার কাজ করেন। ১৬৯৫ খ্রিস্টাব্দে পর্তুগীজ ফাদার লু ই দস আঞ্জুস ভাওয়াল অঞ্চলের নাগরী গ্রামটি ক্রয় করেন এবং সেখানে গির্জানির্মাণ করেন। সেখান হতে ভাওয়ালের অন্যান্য অঞ্চলে খ্রিস্টধর্ম প্রচারিত

Dhaka University Institutional Repository

হয়। নাগরী থেকে ফাদাররা ঢাকার দক্ষিণে হাসনাবাদে যাওয়ার পর সেখানে বর্তমান গির্জাটি নির্মিত হয়। ১৬০৬ খ্রিস্টাব্দে ভারতের দক্ষিণে মাইলাপুর ধর্মপ্রদেশ উন্নিত হয় এবং সমগ্র বঙ্গের মিশন গুলির এর অধীনে ন্যাস্ত হয়। ১৮৩৪ খ্রিস্টাব্দে এ অঞ্চলের জন্য এক তাৎপর্যপূর্ন বছর। এ বছর বঙ্গকে ভিকারিয়েট এপোসটলিক হিসেবে ঘোষনা দেওয়া হয়। এ সময়ে বিশ্বাস বিস্তার সংস্থার সাথে মিশনারী গুলি নিয়ে পর্তুগীজ মিশনারীদের এক টানাপোড়ন শুরু হয়। অনেক বছর পর এর সুরাহা হয়। ১৮৫০ খ্রিঃ অবিভক্ত বঙ্গকে বিভক্ত করে পশ্চিম বঙ্গ ও পূর্ব বঙ্গ নামে দু'টি ভিকারিটের এপোসটলিক গঠন করা হয়। ঢাকাতে সদর দপ্তর স্থাপন করে পূর্ব বঙ্গের ভিকারিয়েটের দায়িত্ব প্রদান করা হয় পবিত্র ক্রুশ সম্প্রদায়ের মিশনারীদের উপর। ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দ সব হলিক্রুশ মিশনারীরা ফ্রান্সে ফিরে যায়। ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে তারা আবার পূর্ববঙ্গে ফিরে আসেন।

<u>ঢাকা ধর্মপ্রদেশ যাত্রা</u> ঃ

ঘোষণাপত্র দ্বারা ক্যাথলিক ধর্মপ্রদেশ হিসেবে ঢাকার যাত্রা শুরু হয় ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে ১লা সেপ্টেম্বর। পোপ ১৩শ যীশু কর্তৃক ঘোষিত। সে সময়ের ঢাকা ধর্মপ্রদেশ বর্তমান ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশ চট্টগ্রাম ও ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশ, আসাম ও ত্রিপুরা (ইন্ডিয়া) এবং আরাকান (বার্মা) ধর্মদেশ মিলে মোট ৫৯,০০০ হাজার বর্গমাইল জুড়ে বিস্তৃত ছিল। সর্বমোট লোক সংখ্যা ছিল প্রায় দুই কোটি কিন্তু ক্যাথলিক সংখ্যা ছিল ১৫,০০০ এর মত।

১৯২৭ খ্রিঃ চট্রগ্রাম পৃথক ধর্মপ্রদেশ রূপে উন্নীত হয়। পরবর্তীতে ভারতবর্ষ ভাগ হওয়ায় ১৯৪৭ খ্রিঃ পর অন্যান্য অঞ্চল ঢাকা হতে বিভক্ত হয়। ঐ সময় সিলেট অঞ্চলের পালকীয় দায়িত্ব ঢাকার উপর ন্যাস্ত হয়। ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দের ১৫ই জুলাই ঢাকাকে মহাধর্মপ্রদেশে উন্নীত করা হয় এবং আর্চ বিশপ লরেন্স গ্রেনার সি এস পি ঢাকার প্রথম আর্চ বিশপ নিযুক্ত হন। ১৯৬০ খ্রিঃ ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের জন্য এক স্মরনীয় বছর। এবছর প্রথম বাঙ্গালী বিশপরূপে অভিষিক্ত হন বিশপ থিওনিয়াম অমল গাঙ্গুলী সি এস সি। অদ্যাবধি তিনি ঢাকা মহা ধর্ম প্রদেশের বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দিয়ে চলেছেন।

১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দে ময়মনসিংহ একটি নতুন ধর্ম প্রদেশে উন্নীত হয়। ১৯৮৬ খ্রিঃ বর্তমান পোপ ২য় জন পলের বাংলাদেশ সফর ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। এ সফর এক ঐতিহাসিক ঘটনা। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর দেশের রাজধানী ঢাকা হওয়ায় ঢাকা মহাধর্ম প্রদেশের গুরুত্ব ও ভূমিকা বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে এ মহাধর্মপ্রদেশে মোট ২০টি ধর্মপল্লীতে ৬৮,০০০ এর মত ক্যাথলিক আছে দেশ গড়ার কাজে শিক্ষা ও সেবাদানের মাধ্যমে ঢাকা মহা ধর্মপ্রদেশ বিরাট ভূমিকা রেখে যাচ্ছে।[১]

<u>তথ্য সূত্র</u> ঃ

১। ফাদার ডেভিড গোমেজ স্মরণিকা খ্রিস্ট জন্ম জয়ন্তী - ২০০০', ৬১/১ সুভাস বোস এভিনিউ লক্ষ্মীবাজার ঢাকা - পৃঃ ১০

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তদশ-উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যে ঢাকায় নির্মিত গির্জাগুলোর স্থাপত্যিক বর্ণনা

স্বর্গোন্নীতা রাণীর গির্জা

নারিন্দা, ঢাকা (১৬১৫)

পর্তুগীজ ব্যবসায়ীদের সাথে ক্যাথলিক বাণী প্রচার করা ও ঢাকায় এসে ধর্ম প্রচার শুরু করেন এবং গির্জা নির্মাণ করতে থাকেন। ঢাকায় সর্বপ্রথম ক্যাথলিক যাজকদের সন্ধান পাওয়া যায় ১৬১৫ খ্রিঃ যখন – সন্দীপের পর্তুগীজ শাসক গণ-জালেস সেবাস্তিরাও গণসালভেস্ তিবার্ড) ঢাকাস্থ মুঘল দরবারে একজন জেসুইস্ট যাজকসহ একটি পর্তুগীজ প্রতিনিধি দল প্রেরণ করেন। গণসালেজের উদ্দেশ্যে ছিলো আরাকানের মুঘলদের আক্রমণের বিরুদ্ধে মুঘলদের সাহায্য লাভ। ঢাকার নবাব গণজালেজেকে সাময়িকভাবে সহায়তা না করলেও জেসুইস্ট যাজককে কয়েক বছর যাবৎ সম্মানজনক আতিথ্যে রেখেছিলেন। এর কিছুকাল পরে পর্তুগীজ আগাস্টিনিয়ান যাজকরা ঢাকার একটি গির্জা নির্মাণ করেন।

পর্তুগীজ পর্যটক ও যাজক সেবাস্তিয়াও মনেরিক তাঁর লিখিত বিবরণে উল্লেখ করেন যে, ১৬২৮ খ্রিঃ ঢাকার নারান্দিয়া (নারিন্দা) পাড়ার স্বর্গোন্নীতা রাণীর নামে এ গির্জাটি অবস্থিত ছিল এবং ক্যাথলিকদের বসতি ছিল নারান্দিয়া ও পুলগাড়িয়া (ফুলবাড়িয়া) পাড়ায়। এসব পর্তুগীজ ক্যাথলিকের সম্ভবতর নবারের অধীনসহ ভাড়াটিয়া সৈন্য ও তাদের পরিবারবর্গ ছিলেন। ১৬৩২ খ্রিঃ এ গির্জার পালক ফাদার বার্নাদো দায়েজুস কিছু সংখ্যক উগ্রপন্থী মুসলমান মোল্লার হাতে মারাত্মকভাবে প্রহৃত হয়ে কয়েকদিনের মধ্যে প্রাণ হারান। তিনিই ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশ এলাকায় প্রথম ধর্মশহীদ (সাক্ষ্যময়)। মুঘল সে বছর হুগলীস্থ পর্তুগীজ ঘাটি মুঘল সেনাদের হাতে বিধ্বস্থ হলে ঢাকাস্থ – এসব উগ্রপন্থী ব্যক্তি পর্তুগীজ ফাদারকে আক্রমণ করেছিলেন। এ ঘটনার পর কয়েক বছরের জন্য সাবাস্টিনিরান ফাদাররা ঢাকা ত্যাগ করে চলে যায়।

১৬৩৫–১৬৪০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে মাত্র একজন যাজক ঢাকায় ছিলেন। ফাদার কারিনাহ নামক এ পর্তুগীজ জেসুইস্ট যাজক বাণী প্রচারক রূপে চট্টগ্রামের কাছে দিয়াং এ কর্মরত ছিলেন। একদিন প্রচারকালীন ভ্রমণকালে তিনি ও তাঁর সঙ্গীরা মুঘলদের হাতে বন্দী হয়ে ঢাকায় নীত হন।

১৬৪০ খ্রিঃ লাহোরের পি. দা ফাক্সোর হস্তক্ষেপে ফাদার ফারিনাহ মুক্তি পান এবং দিয়াং এ প্রত্যাবর্তন করেন।

১৬৪২ খ্রিস্টাব্দের পর আগষ্টিনিয়ান যাজকরা পুনরায় ঢাকায় প্রত্যাবর্তন করেন। ১৬৬৬ খ্রিঃ ফরাসী মনিকার ও পর্যটক জ্যা বাতিস্তে নিয়ে তাঁর Travels in India নামক পুস্তকে স্বর্গোন্নীতা রাণীর ইউ-নির্মিত গির্জাটির নির্মাণ শৈলীর প্রশংসা করেন। ১৬৮২ খ্রিঃ আগাস্টিনিয়নে ফাদারদের 'Relatio' নামক বার্ষিক রিপোর্টে দেখা যায় যে, তখন ঢাকার ক্যাথলিক জনসংখ্যা ছিল ২০,০০০ এবং তেজগাঁয়ে ৭০০। বঙ্গের রাজধানী ১৭০৩ খ্রিঃ ঢাকা থেকে মুর্শিদাবাদে স্থানান্তরের ফলে নবাবের অধীনস্থ সেনারা স্বভাবতই নতুন রাজধানীতে পাড়ি জমান। এ কারণে ঢাকাস্থ ক্যাথলিকদের সংখ্যা দ্রুত হ্রাস পেতে থাকে। বঙ্গের গির্জাগুলো তখন দক্ষিণে ভারতের মাইলাপুর ধর্ম প্রদেশের অধীনে ছিল বলে সেখানকার বিশপ ফ্রান্সিসকো লেইন এস,জে, ১৭১২ খ্রিঃ বঙ্গ পরিদর্শনে আগমন করেন। তাঁর সহকারী ও বিবরণীকার ফাদার আন্ডনী ক্লাদিয়াস বার্বিয়ের লিপিবদ্ধ করেন যে, ঢাকার পূর্বদিকে ক্যাথলিকদের একটি গির্জা ছিল। কিন্তু এতো অপরিচ্ছন্ন ও অপরিকল্পিত এলাকা তাঁরা আর কোথাও দেখেননি বলে জানান। অযত্ন ও অবহেলার কারণে ১৭১০ থেকে ১৭৮৯ খ্রিঃ কোন এক সময়ে হয়তো এ গির্জাটির বিলুপ্তি ঘটে। কারণ আগষ্টিনিয়ান সংঘের প্রাদশিক পরিচালক ফাদার যোসেফ গুইলার্সে ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দের ৩রা ডিসেম্বর রিপোর্টে বঙ্গে কর্মরত যাজকদের একটি তালিকা দেন। উক্ত তালিকায় তেজাগাঁও সম্বন্ধে বলা আছে, কিন্তু ঢাকায় (নারান্দিয়ার) গির্জার কথা উল্লেখ নেই। এ গির্জাটি হয়তো ভূমিকম্প, ঘূর্ণিঝড় বা বয়সের ভারে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং ক্যাথলিক লোকসংখ্যার স্বল্পতার কারণে আর পুনঃ নির্মিত হয়নি।[১]

বর্তমানে নারিন্দায় খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বীদের যে সমাধিক্ষেত্রটি বিদ্যমান আছে, সে স্থানেই কি প্রাথমিক গির্জাটির স্থান ছিল কি-না এটা গবেষণার বিষয়। এটাকে ঢাকার প্রাচীনতম সমাধিক্ষেত্র বলা হয়।

১. [Manuscript, "The Churches of the Aguntinians in Dacca", Father Edmond N. Goedert, CSC., (Dacca : 1958) pp. 2-3]

Dhaka University Institutional Repository

জপমালা রানীর গির্জা

(হলি রোজারিও গির্জা)

তেজগাঁও (১৬৭৭ খ্রিঃ)

ঢাকা মহানগরীর তেজগাঁও এলাকায় ফার্মগেট ব্রীজের পূর্ব দিকে তেজকুনী পাড়ায় হলিক্রস কলেজের পিছনে "জপমালা রানীর গির্জাটি" অবস্থিত।

ভের্তোমানুসের* সফরকালীন সময়ে মুঘল সম্রাটরা ভারত শাসন করছিলেন এবং তখন ঢাকা ছিল সমগ্র বঙ্গের রাজধানী। তৎকালীন তেজগাঁও ছিল ঢাকা থেকে চার মাইল দূরে। সেখানে মুঘল শাসকদের পদাতিক ও অশ্বারোহী সেনাদের শিবির ছিল। তাছাড়া সেখানে ধনী ব্যবসায়ীদের আবাস ছিল।[১]

'জপমালা রানী' নামটি মাতা মেরীর একটি গুন বাচক নাম। যার অর্থ তাঁরই উদ্দেশ্যে উৎসর্গকৃত। অর্থাৎ গির্জাটি মাতামেরীর উদ্দেশ্যে তাঁরই নামে নামকরণ করা হয়েছে।

নির্মাণ কাল ঃ

ঢাকায় দন্ডায়মান গির্জাগুলোর মধ্যে তেজগাঁও গির্জাটি হচ্ছে সবচেয়ে পুরাতন। কিন্তু গির্জাটি কত সালে এবং কারা নির্মাণ করেছিল এ নিয়ে যথেস্ট সংশয় রয়েছে। কেননা মহা সামুদ্রিক বানিজ্যে গতি পরিবর্তনে পর্তুগাল হতে দুঃসাহসী ও ভাগ্যান্বেষী নাবিক ও বনিক সম্প্রদায়ের নিরবচ্ছিন্ন স্রোতধারা প্রাচ্য মন্ডলের দিকে প্রবাহিত হতে লাগল। এ স্রোতধারার মধ্য হতে কোন একটি দল তেজগাঁও এর পবিত্র জপমালা রানীর গির্জাটি প্রতিষ্ঠিত করেছিল। ডঃ পারভীন হাসান বলেছেন, যদিও লিপিতে নির্মাণ কাল ১৬৭৭ সাল রয়েছে, তা ঠিক নয়। তবে উহার কাছাকাছি কোন এক সাল হবে বলে বিশ্বাস করা যায়। তেজগাঁও অবস্থিত গির্জাই ১৬৭৮ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত হয়েছিল বলে উল্লেখ করা যায়।[২] তবুও প্রশ্ন থেকে যায় কোন দল এবং কখন নির্মাণ করেছিল গির্জাটি। মোঃ শামসুল হক বিভিন্ন তথ্য ও যুক্তির মাধ্যমে নির্দিষ্ট তারিখ উল্লেখ করার চেষ্টা করেছেন, নিম্নে তাঁর সে আলোচনা উল্লেখ করা হলঃ

১। ভার্থেমিনুস ১৫০৩ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশ পরিভ্রমন করেন। তিনি বেঙ্গলা নগরী সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিত বর্ণনা রাখেন। তিনি বলেছেন, "এখানে আমরা বহু খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী বনিকদের সাক্ষাত পাই। তাদের বর্ণনা মোতাবেক তারা সার্নান শহরে জন্ম গ্রহন করেছে। তারা তথাকার বিরাট বাণিজ্য বন্দরে রেশমের বস্ত্র, ঘৃতকুমারী বা মুসুরের (aloes), লেজার (Lazer) কাঠের ব্যবসা করত। লেজার থেকে এক ধরনের মিষ্টি অচার জাতীয় পদার্থ তৈরী হত যা লেসার পেটিয়াম (Laser Petium) নামে পরিচিত। এক শ্রেণীর সুগন্ধি নির্যাস হওয়াতে এটাকে সাধারনতঃ বেলদুই (Belzoi) নামে অভিহিত করা হয়। দক্ষিন ভারতের নেস্টোরিয়ান খ্রিস্টানদের প্রার্থনাগারের সাথে এ গির্জার ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য লক্ষ্য করে জেমস টেইলর অনুমান করেন যে, আদি সূত্রে এ গির্জাটি ভার্থোমাননুস কর্তৃক উল্লেখিত খ্রিস্টান বনিকদের দ্বারা নির্মিত হয়েছিল।[৩]

২। এশিয়াটিকস (১৮০৩ খ্রিঃ) এ এরূপ বর্ণনা রয়েছে, "হুগলীতে পর্তুগীজ গির্জা স্থাপিত হওয়ার পূর্বেই আগস্টিয়ান পাদ্রীরা চট্টগ্রাম, তেজগাঁও এবং বালাসরের গির্জা নির্মাণ করেন, কিন্তু এদের প্রতিষ্ঠা সমন্ধে আমি কোন বিস্তৃত বিবরণ দিতে পারবনা।[৪]

৩। আগাষ্টিয়ানদের দাবী এ যে, তারা ১৫৯৯ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে ঢাকার উপকণ্ঠে তেজগাঁও এর গির্জাটি নির্মাণ করেছিলেন।[৫]

---

* ইউরোপীয় পরিব্রাজক

Dhaka University Institutional Repository

৪। বি. সি. আলেন বান্দেল বা হুগলীর গির্জা নির্মানের অব্যবহিত পরে তেজগাঁও গির্জা নির্মিত হয়েছে বলে মনে করেন। তিনি কোন সঠিক তারিখ দিতে পারেন নি।[৬]

৫। ডঃ আহমেদ হাসান দানী এবং ডঃ নাজিমদ্দিন ১৬৭৭ খ্রিস্টাব্দে এর নির্মাণকাল বলে ধরে নিয়েছেন।[৭]

৬। জে. জে. এ. ক্যামপস ও জে. টি.ল র‍্যাংকিন মনে করেন ১৬৭৯ খ্রিঃ এ গির্জাটি নির্মিত হয়।[৮]

৭। মাদ্রাজ ক্যাথলিক ডাইরেক্টরীতে এর নির্মাণকাল ১৭১০ খ্রিস্টাব্দের কথা উল্লেখ রয়েছে।[৯]

প্রাচ্য বিশ্বের ইন্দ্রজালিক উজ্জ্বল্য ও রত্নাকরী প্রভা, বিশেষতঃ ভারতবর্ষে উৎপন্ন উৎকৃষ্ট মসলা মহামূল্যবান প্রস্তর মসলিন সুতীবস্ত্র এবং অন্যান্য দুস্প্রাপ্য পন্য সম্ভারে জম জমাট বাজার এবং এতে অতিমাত্রিক লাভজনক ব্যবসা ইউরোপের প্রধান প্রধান সামুদ্রিক জাতিকে এদেশে আসতে এবং পঞ্চদশ শতাব্দী হতে এ দেশের সম্পদ শোষন করতে আকৃষ্ঠ করে।[১০] একথা সত্য যে, এ ব্যাপারে পর্তুগীজরাই অগ্রনী ভূমিকা পালন করেন।

প্রায় ১৫৩০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে পর্তুগীজরা সর্বপ্রথম বাংলার বুকে আনাগোনা শুরু করে। ১৫৩৭ খ্রিস্টাব্দে তারা চাটগায় ও হুগলীতে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকে।[১১] বাংলার সর্বপ্রথম ধর্মজাযক যাদের আমরা নামানুসারে জানি তারা হলেন জেসুইস্ট।[১২] তাদের বর্ণনা অনুসারে ১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দে ফাদার আন্তনী ভাজও ফাদার পাদ্রো ডায়াস বাংলায় আগমন করেন। ফাদার দেলাননস্টব সময়কে ১৫৭৯ খ্রিস্টাব্দে বলে উল্লেখ করেছেন।[১৩] ১৫৭৯ খ্রিস্টাব্দেও আন্তনী ভাজ বাংলায় ছিলেন। ১৫৭৮ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে সাতগাঁও এর উপচার্য হিসেবে ফাদার পাদ্রো জুলিয়ানো পেরেইরা নামক একজন ঐহিক যাজককে কোচিন হতে বাংলায় প্রেরণ করা হয়। মনযারেট তাঁকে গঙ্গঁরীদস আর্কিমিসটেস বলে উল্লেখ করেছেন। ১৫৭৮ সালে তিনি সাতগাঁয়ের পালক পুরোহিত ছিলেন। সাতগাঁয়ের গির্জাই ছিল অভিবক্ত বাংলার প্রথম গির্জা[১৪] তাহলে ১৫৯৯ খ্রিস্টাব্দে আগস্টিনিয়ান যাজকদের দ্বারা হুগলীর নিকটবর্তী বান্দেল গ্রামে নির্মিত রোমান ক্যাথলিক গির্জাটিকে বাংলার খ্রিস্টানদের প্রাচীনতম প্রার্থনাগার হিসেবে চিহ্নিত করার প্রসংগটি[১৫] ঐতিহাসিক সত্যের পরিপন্থি।[১৬] সম্ভবত ১৫৯৮ খ্রিস্টাব্দের ২৮শে সেপ্টেম্বর জেসুইস্ট ফাদার ফ্রান্সিস ফারনানদেজ ও জেমিনিক দ্য সোমা এবং ১৫৯৯ খ্রিস্টাব্দের ফাদার এনড্রুবড়স ও মেলচির্ডর ফৌসেকা তাদের পদাঙ্ক অনুসরন করে বাংলায় আগমন করেন। শীঘ্রই সাতগাঁও, হুগলী, চান্দেকা, শ্রীপুর, বাকলা, চাটগাও, দিয়াজ অঞ্চলে পর্তুগীজদের বাসস্থান জোরদার হয়ে উঠতে থাকে। কিন্তু ১৫৯৮ সালের আগে এ সমস্ত জায়গায় স্থায়ী ভাবে মিশন কেন্দ্র স্থাপিত হয়নি। তখন মিশনারীরা পর্তুগীজ বাণিজ্য জাহাজের সঙ্গে এসে এ সমস্ত পর্তুগীজ খ্রিস্টানদের দেখাশুনা করতেন।[১৭] এ সমস্ত মিশন কেন্দ্র হিসেবে তেজগাঁও এবং প্রার্থনাগার হিসেবে তেজগাঁও গির্জার কোন বর্ণনা মিলেনি বলেই তেজগাঁয়ের গির্জাটি ১৫০৩ খ্রিস্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে ভার্তমাননুস কর্তৃক উল্লেখিত খ্রিস্টান বনিকদের দ্বারা নির্মিত হয়েছিল ডঃ জেমস টেইলরের এ বর্ণনা কিংবা বাংলাদেশে প্রথম আগমন করেন আগাষ্টিনিয়ান মিশনারীরা এবং তারাই ১৫৯৯ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে তেজগাঁও গির্জাটি নির্মাণ করেন। আগষ্টিনিয়ানদের এ দাবী গ্রহনযোগ্য বলে বিবেচিত হতেপারে না। বস্তুত পক্ষে জেসুইস্টরা ১৫৯৯ খ্রিস্টাব্দের সাতক্ষীরা শহরের ৫০ মাইল দক্ষিণে ঈশ্বরীপুরের চান্দেকায় একটি গির্জা নির্মাণ করেছিলেন। এ গির্জাটি ছিল পূর্ব বাংলার প্রথম গির্জা।[১৮]

মানসারেটের বর্ণনা অনুযায়ী ১৫৭৮ হতে ১৫৮৩ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে পর্তুগীজ দূত ও ডরেজ মুঘল সম্রাট মহামতি আকবরের নিকট হতে রাজকীয় ফরমান লাভ করলে ১৫৮০ খ্রিস্টাব্দের পরে তারা বাংলার মাটিতে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে। কাজেই ১৫৮০ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে সাধারনত বাংলাদেশে বিশেষত তেজগাঁও এ পর্তুগীজদের গির্জা নির্মাণের যে বর্ণনা রয়েছে তা সত্য বলে গ্রহন করা যায়না। দ্বিতীয় কথা হল এ যে, ভারতবর্ষ তথা বাংলাদেশে সর্বপ্রথম যে পর্তুগীজরা আগমন করেছিল তারা হল পর্তুগীজ বনিক সম্প্রদায়। তাই গির্জা নির্মানের ইতিহাস যদি একান্তই সত্য বলে ধরে নেওয়া যায় তাহলে সে গির্জাটি হবে পর্তুগীজ বনিক সম্প্রদায়ের দ্বারা নির্মিত আগাষ্টিনিয়ানদের দ্বারা নয়। ১৫৯৮ খ্রিস্টাব্দে এ সমস্ত জনবসতির আধ্যাত্মিক প্রয়োজনীয়তার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষন

Dhaka University Institutional Repository

করা হলে[১৯] বাণিজ্য রেখার ছত্রছায়ায় আসল গির্জা তথা যাজক সম্প্রদায়, যারা ছিলেন ধর্মান্তকরন প্রক্রিয়ায় অত্যন্ত সিদ্ধহস্ত এবং পৌওলিক বিশ্বে খ্রিস্টান ধর্ম প্রচারের তীব্র উম্মাদনায় উদ্দীপিত।[২০] কিন্তু সরকারী অনুমোদনের পূর্বে এদেশে পাদ্রীদের আনাগোনা শুরু হয়ে গিয়েছিল বলে ইতিহাস সাক্ষ্য দিচ্ছে।[২১] কেননা জেসুইস্টদের আগমনের পূর্বে বাংলা, আরাকান এবং বার্মাতে তারা কর্মরত ছিলেন। কিন্তু এসমস্ত যাজকদের অধিকাংশই ছিলেন ধর্মনিরপেক্ষ পার্থিব পাদ্রী যারা কোন গির্জা নির্মাণ পরিকল্পনা গ্রহন করেননি।

একফোর্ড লুয়ার্ড অবশ্য বলেছেন যে এ পথে আগাষ্টিনিয়ানরা বিলক্ষন পূর্বে উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু কোন উল্লেখ করেননি।[২২] তারা কেবল মাত্র ১৫৬২ খ্রিস্টাব্দে ভারতবর্ষে এসেছিলেন বলে জানা গেছে। মানরিক উল্লেখ করেছেন যে, পর্তুগীজরা হুগলীতে বসতি স্থাপনের পরে ১৫৮০ খ্রিস্টাব্দে তারা বাংলায় এসেছিলেন।[২৩] সিকারদে ও অন্যান্য আগাষ্টিনিয়ান ঐতিহাসিকরা বলেছেন যে, তারা ১৫৯৯ খ্রিস্টাব্দে বাংলায় এসেছিলেন।[২৪] ১৫৯৯ খ্রিস্টাব্দে পাঁচজন আগষ্টিলিয়ান ধর্মযাজক হুগলীতে পৌছেন। ফাদার বার্ণাড দ্য জেসাসকে বাংলার প্রধান উপাচার্য নিযুক্ত করা হয়। পরবর্তী বৎসর অর্থাৎ ১৬০০ খ্রিস্টাব্দে আরও সাতজন আগাষ্টিনিয়ান এদেশে প্রেরণ করা হয়। তাই বাংলাদেশে আগাষ্টিনিয়ানদের এ দাবী অসংগত বলে পরিত্যাজ্য।[২৫] এ সময়ে অর্থাৎ ১৬০০ খ্রিস্টাব্দে ডোমিনিয়ানরা ডিয়াঙ্গাতে কর্মরত ছিলেন। তিন বৎসর পর ১৬০৩ খিস্টাব্দে তাদেরকে প্রত্যাহার করা হয়। এ সময়ের মধ্যে বাংলা পর্তুগীজদের পদধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠে। ১৬১৬ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ঢাকা কাতরাভূসহ শ্রীপুর, হিজলীসহ হুগলী এবং বানজাসহ পিপলি সরকারী দফতর সংক্রান্ত মিশনারী কেন্দ্রে পরিনত হয়।[২৬]

১৬০২ খ্রিস্টাব্দে বাংলায় দু'জন জেসুইস্ট ছিলেন বলে জানাযায়। কিন্তু পর্তুগীজদের সাথে বিরোধে আরাকানদের রাজা চাটগায়ের গির্জা ধ্বংস করে দিয়ে সেখানকার ফাদার ফ্রান্সিস ফারনান্দজকে হত্যা করেন। ১৬০৪ সালে অবশিষ্ট জেসুইস্ট পুরোহিত বাংলা ত্যাগ করেন।[২৭]

সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে ১৬০৭ খ্রিস্টাব্দে ফতেহখান[২৮] পর্তুগীজদের সঙ্গে প্রথম প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অবতীর্ন হলে মুঘল বাহিনী নাজেহাল হল। এবিপর্যয়ের পর ১৬০৮ খ্রিস্টাব্দে ইসলাম খান মুঘল রাজপ্রতিনিধিরূপে বাংলায় এলেন। এ সময়ে সন্দ্বীপের তথাকথিত ''লর্ড প্রোটেকটর'' সেবা মতিয়াও গনজালেস আরাকানের রাজার সাথে মিত্রতা স্থাপন করে তাদের সাধারন শত্রু মুঘলদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হলেন।[২৯] ইসলাম খান তখন আরাকানী মগ ও ফিরিঙ্গিয়ান - ই -হারমাদদের[৩০] উপর চূড়ান্ত বিজয় লাভ করেলেন। ১৬১৩ খ্রিস্টাব্দে আবার পর্তুগীজরা সম্রাট জাহাঙ্গীরের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। ইংরেজ পরিব্রাজক ও কুটনীতিগ্রি স্যার টমাসরো এ সুযোগের বিলক্ষন সদ্ব্যবহার করে পর্তুগীজদের কোনঠাসা করে ফেলেন। ১৬১৫ খ্রিস্টাব্দে সন্দীপ পতনের পর পর্তুগীজ সর্দাররা সালভেজ নামক একজন জেষুইটকে আরাকানী মগদের বিরুদ্ধে মুঘলদের সাহায্য প্রর্থনা করে ঢাকার নবাবের কাছে প্রেরণ করেন।[৩১] তিনি ছিলেন প্রথম পুরোহীত যিনি ঢাকার বুকে প্রথম পদার্পন করেন। কিন্তু ঢাকার নবাব তাঁকে সসম্মানে ঢাকায় বন্দী করে রাখেন।[৩২] ১৬১৬ খ্রিস্টাব্দে অবশ্য ঢাকাতে পর্তুগীজদের মিশন প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে ঢাকার ইসলামপুর সড়কের যে স্থানে শিশুভবন অবস্থিত সেখানে ১৬২৮ খ্রিস্টাব্দে আগস্টিনিয়ানদের একটি গির্জা ছিল বলে জানা যায়।[৩৩] ১৬২৯ খ্রিস্টাব্দে আবার পর্তুগীজ সেনানায়ক দিয়াগো দ্যা সা তাঁর নৌবহর সহ ঢাকার উপকণ্ঠে আগমন করে একটি গ্রাম আক্রমন করে।[৩৪] আর্থিক সুযোগসুবিধার অপব্যবহার, ক্রীতদাস ব্যবসায়ের নামে তাদের অত্যাচার ও নিষ্ঠুরতা, তাদের ধর্মান্ধতা, জোরপূর্বক ধর্মান্তরকরন প্রক্রিয়া ইত্যাদি উদ্ভুত জটিলতার কারণে বাধ্য হয়ে সম্রাট শাহজাহান ১৬৩১ খ্রিস্টাব্দে বাংলার রাজপ্রতিনিধি কাশেম খানকে পর্তুগীজদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা গ্রহণ করতে নির্দেশ দেন। ১৬৩২ খ্রিস্টাব্দে কাসিম খান হুগলীর ধ্বংস সাধন করে সেখানকার মঠ ও গির্জা ধূলিসাৎ করেন। ঢাকাতে গণ আক্রোশের বহ্নি শিখা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌছলে হুগলী অবরোধকালেই এখানে ইসলামপুর গির্জার ফাদার ফ্রেই বার্নাডোজ যীশুকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়।[৩৫] মুঘল পর্তুগীজ সম্পর্কের এ তিক্ততম অধ্যায়েও তেজগাঁও এ খ্রিস্টান গির্জা ও তার পুরোহিত সম্পর্কে কিছু জানা যায়নি। আরাকান মগ ও ফিরিঙ্গী

Dhaka University Institutional Repository

পর্তুগীজদের সঙ্গে মুঘলদের সর্বশেষ সংগ্রাম বাধে বাংলার শাসনকর্তা শায়েস্তা খানের আমলে ১৬৬৬ খ্রিস্টাব্দে। এ অভিযানে আরাকানী মগ ও পর্তুগীজ ফিরিঙ্গীদের বিতাড়িত করে শায়েস্তা খান বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন।

১৬৬৩ খ্রিস্টাব্দে পরিব্রাজক মানুচী ঢাকা পরিদর্শন করেন। তার বর্ণনা মোতাবেক ঢাকাতে তখন দু'টি কারখানা ছিল। একটি ইংরেজদের ও অন্যটি ওলন্দাজদের।[৩৬] বস্তুতপক্ষে ইংল্যান্ড ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ১৬৫৬ খ্রিস্টাব্দে তেজগাঁওতে কুঠি, ওলন্দাজ, ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ১৬৬৮ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজ কুঠি এবং ১৬৭১ খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্স ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ফরাসী কুঠি স্থাপন করে। মানুচী ঢাকা বা তেজগাঁও একোন পর্তুগীজ বাণিজ্য কুঠি দেখেননি। এর থেকে প্রমানিত হয় যে, পর্তুগীজরা ১৬৬৬ খ্রিস্টাব্দের পরে শায়েস্তা খানের সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তির ফলে ঢাকাতে তাদের বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করে। এসময়ে তেজগাঁও এ ওলন্দাজদের উদ্যান কুঠি, ফরাসীদের বাণিজ্যকুঠি ও বাগানবাড়ী, পর্তুগীজ ইংরেজ গ্রীক ও আর্মোনিয়ানদের বাণিজ্য কুঠি ও বাসভবন প্রতিষ্ঠিত হওয়ায়[৩৭] তেজগাঁও ইউরোপীয় ও এদেশীয় খ্রিস্টানদের পদচারণ দ্বারা মুখর হয়ে উঠে এবং এসময়েই তেজগাঁও এ পর্তুগীজ গির্জা নির্মাণের প্রশ্নটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে পড়ে। একাজে পর্তুগীজ বনিকরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

সাধারণতঃ বাংলাদেশ বিশেষতঃ ঢাকাতে পর্তুগীজদের আগমন তাদের গতিবিধি ও কর্মকান্ড সম্পর্কে আমাদের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য তথ্য ও তত্ব পরিবেশনকারী হলেন ফ্রে-সেবাষ্টিয়া ও মানরিক যিনি ১৬৪০ খ্রিঃ বাংলা পরিদর্শনে আসেন এবং ১৬৪১ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে নির্মিত আগষ্টিন গির্জা সমূহের একটি তালিকা দেন। এচ, হুস্টিন ম্যানরিকের 'Travels of Fray Scbastiert Manique' গ্রন্থে লক্ষ্য করেছেন যে, মানরিকের লেখনিতে তেজগাঁও (ঢাকা) অথবা বালাসর কোন গির্জাই ধরা দেয়নি।[৩৮] ঢাকাতে আগাষ্ঠিনিয়ানরা কোন সময় বসতি স্থাপন করেছিল যে সম্পর্কে আমাদের কোন জ্ঞান না থাকলেও ১৬৩২ খ্রিস্টাব্দে যে সেখানে তাদের একটি দুতাবাস ছিল[৩৯] ইতিহাস তার সাক্ষ্য দিচ্ছে। মানরিক দূতাবাস সংলগ্ন গির্জাটি বলতে এ গির্জাটিরই ইঙ্গিত দান করেছেন। ১৬১২ খ্রিস্টাব্দে আগাস্টিনিয়ান ফাদাররা ঢাকাতে একটি গির্জা নির্মাণ করেছিল। ১৬৬৬ খ্রিস্টাব্দে ফরাসী পর্যটক ও মনিকার ব্যাপ্তিস্ত তাভানিয়ে তাঁর Travel of India তে এর উল্লেখ করেছেন। জে সি র‍্যাঙ্কিন জোড় দিয়ে বলেন যে, তাভার্নিয়ে কর্তৃক উল্লেখিত এ গির্জাটি নারায়নদিয়াতে অবস্থিত ছিল।[৪০] মানরিক - ও তাভার্নিয়ে উভয়েই এ গির্জাটির সৌন্দর্যের প্রশংসা করেছেন। মানরিক ও সেডেন্ট ঐ সেন্ট আগাস্টিন মঠের কথা উল্লেখ করেছেন। জেমস টেইলরের হিসাব মোতাবেক ঢাকা ভাওয়াল ও হাসনাবাদে বিরাজমান তিনটি পর্তুগীজ গির্জার অন্তর্গত খ্রিস্টানদের সবশুদ্ধ সংখ্যা ছিল ১০১৫০।[৪১] মানরিক, সেডেন্ট ও তাভারনিয়ে কারো লেখায় তেজগাঁও এর গির্জার কথার উল্লেখ হয়নি এবং সেখানে খ্রিস্টানদের বসবাস দেখতে পাননি বলেই জেমস টেইলর তাদের সংখ্যা এখানে তুলে ধরেননি।

বস্তুত পক্ষে তেজগাঁও তে পর্তুগীজদের প্রাচুর্য লক্ষ্য করা যায় ১৬৭৯ খ্রিস্টাব্দে। এ সময় ইউরোপীয়দের দ্বাদশ খ্রিস্টান কেন্দ্র ছিল। তেজগাঁও ঐ পরিবার পরিজনসহ সাতজন পর্তুগীজ মিলিয়ে তখন এখানে ৭০০ খ্রিস্টান বসবাস করত।[৪২] ১৬৮২ খ্রিস্টাব্দে আগাস্টিনিয়ান ফাদারদের 'Relatio' নামক রিপোর্টে তেজগাঁও এ পর্তুগীজ এবং তাদের পরিবার ছাড়াও ৭০০ জন ক্যাথলিকের উল্লেখ আছে।[৪৩] কাজেই ১৭১৪ খ্রিস্টাব্দে তেজগাঁও এর গির্জাটি নির্মিত হয়েছিল বলে মাদ্রাজ ক্যাথলিক ডাইরেকটরী যে তথ্য পরিবেশন করছে তা একটি ঐতিহাসিক ভ্রান্তি। জে,জে,এ, ক্যামপস ১৭০৬ খ্রিস্টাব্দে চিহ্নিত এখানকার একটি অনুলিপির কথাও উল্লেখ করেছেন।[৪৪]

১৭০৩ খ্রিস্টাব্দে বাংলার রাজধানী ঢাকা হতে মুর্শিদাবাদে স্থানান্তরের ফলে তেজগাঁও তার গুরুত্ব হ্রাস পায়। এজন্যই ১৭১২তে বাংলা সফরকারী মাইলাপুরের বিশপ লেনিস তাঁর সফরনামা তেজগাঁও এর গির্জার কোন বিবরণ তুলে ধরেন নি।[৪৫] সম্ভবত ঃ গির্জাটি তখন বন্ধ ছিল ১৭১৪ খ্রিস্টাব্দে গির্জাটি আবার বাণীবন্দনাতে মুখর হয়ে ওঠে। ১৭২৬ খ্রিস্টাব্দে ফাদার আন্তনিও দ্য এস ফ্রান্সিসকো এবং ১৭৭৪ খ্রিস্টাব্দে সেন্ট রীতার ফ্রেই রায়মন্ড তেজগাঁও এর পালক পুরোহিত ছিলেন।[৪৬] কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে আবার গির্জাটির গুরুত্ব হ্রাস পায়। এটা কেবল তেজগাঁও এর বেলায়ই ঘটেনি; কেননা তখন তেজগাঁও, শ্রীপুর শ্রীরামপুর, কাসিম বাজার, হুসেইনবাদ,

Dhaka University Institutional Repository
নাগরী ও পাঙ্গোরাকে প্যারিশ প্রিস্ট এর তত্ত্বাবধানে আনয়ন করা হয়েছিল।। ১৮০৩ খ্রিস্টাব্দে জুলাই মাস পর্যন্ত ফ্রে - ই - গসপার দ্যা নসা সেনহারা দাসডস এরূপ পদে নিয়োজিত ছিলেন। ১৮১৫ খ্রিস্টাব্দে ঢাকার আমপট্রিতে ডক্তিরানীর গির্জাটি নির্মিত হলে আমপট্রির ফাদার তেজগাঁও গির্জাকে আবার চট্টগ্রাম, জাবালকাট শিবপুর হুসাইনবাদ,পাঙ্গোরা,চুচুরা,শ্রীরামপুর,কাসিম বাজার,চন্দন নগর গির্জা সমূহের সাথে একই নিয়ন্ত্রনীধীনে আনা হয়েছিল।[৪৭]

জানুয়ারী মাস পর্যন্ত কলকাতা গির্জার সহযোগী যাজক ফ্রেই জোয়াকুইবা দ্য ত্রিনদাদকে এসব গির্জার পালক পুরোহিতরূপে কর্মরত দেখা গিয়েছে। ১৮৩৬ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা ভিক্টোরিয়েটের ফাদার ঢাকা সফরকারী হিপোলইট মুর তাঁর রিপোর্টে উল্লেখ করেন যে, তখন অবহেলার কারনে তেজগাঁও এ মাত্র ১০ জন ক্যাথলিক ছিল।[৪৯]

কিন্তু ১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দে হতে তেজগাঁও গির্জার প্রাণ চাঞ্চল্য অনুভূত হতে থাকে। এর কারন এ যে, ঐ সময় তেজগাঁও এর বিশিষ্ট ক্যাথলিক ডাঃ ক্লেমন্ত ফ্রান্সিসকো দম আঞ্চুস ১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দের ২১ শে ফেব্রুয়ারী গির্জার ভরন-পোষনের উদ্দেশ্যে ব্রাহমুন্ডি, করকমোরা ও অন্যান্য গ্রাম এবং ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে ২৬শে মার্চ তাঁর পুত্র বড্রিকস্ তেজকুনী পাড়ার অর্ধাংশ উইল নামার মাধ্যমে দান করেন।[৫০]

এ অবস্থায় তেজগাঁও পর্তুগীজের পবিত্র জপমালা রানীর গির্জা নির্মাণের সঠিক তারিখ নির্ধারন করতে হলে ১৬৬৬-৬৭ খ্রিস্টাব্দে (শায়েস্তা খান ও পর্তুগীজদের মধ্যে যুদ্ধ ও শান্তি সন্ধির বৎসর) এবং ১৬৭৯-৮০ খ্রিস্টাব্দের (তেজগাঁও এ পর্তুগীজদের অধিক সংখ্যায় আবির্ভাবের বৎসর) মধ্যকার কোন একটি খ্রিস্টাব্দকে চিহ্নিত করতে হবে। ভারতের ইসলামী ও খ্রিস্টান স্থাপত্য শিল্প হিসেব করলেও এ তথ্যটি অধিকতর শক্তিশালী হবে বলে মনে হয়। গির্জাতে ব্যবহৃত জাহাঙ্গীরী (কাসপড়) সাঁজকাটা খিলান, দু পার্শ্বে পল তোলা যুগল স্তম্ভসহ (কাসপড়) সাঁজকাটা খিলান বিশিষ্ট প্রবেশপথ) মুঘল স্থাপত্যের কথাই স্মরন করিয়ে দেয়। এতে করে গির্জার সময়কালকে ১৬০৫-২৭ খ্রিস্টাব্দের (সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্বকাল) মধ্যে বা তারপরে আশা যেতে পারে।

ম্যারিও তাভারেস চিকো পর্তুগীজ ভারতবর্ষ তথা গোয়ার খ্রিস্টান ধর্মীয় স্থাপত্য শিল্পের বিকাশকে কালের নিরিখে তিনটি ঐতিহাসিক পর্যায়ে বিভক্ত করেছেন। প্রথম পর্বটি পর্তুগীজ গথিক রেনেসাঁ স্থাপত্যের সাথে জড়িত। তা মধ্যযুগের প্রান্তবিন্দুর শিল্পকলার প্রভাবের আগমনী বার্তার ঘোষনা দেয় এবং পর্তুগালের মানুরেলাইন আর্চের সমপর্যায়ে অবস্থান করে। এ শিল্পধারাটি অবশ্য ষষ্টদশ শতাব্দীর প্রথম দশক গুলিতে বহুল প্রসারিত ছিল। এর অব্যবহিত পরে দ্বিতীয় সাময়িক পর্ব সূচিত হয় এবং ষষ্ঠদশ শতাব্দীর শোষার্ধে ও পুরো সপ্তদশ শতাব্দী অর্থাৎ দেড়শত বৎসর কাল পর্যন্ত তা স্থায়ী হয়। ইউরোপে ধর্ম সংস্কার আন্দোলন যখন প্রতিধর্ম সংস্কার বিপ্লবের সামনে প্রচন্ড বাধার সম্মুখীন হল তখন ধর্মীয় নীতিতে পরিবর্তন আসার ফলে স্থাপত্য ও শিল্পকলার প্রকৃতিতে পরিবর্তন সূচিত হল যার অর্থ এ দাড়াল যে, কলা ও স্থাপত্যের রীতি ও কৌশল কিছুটা অবনমিত হয়ে পড়ল। জন্ম হল বারোকা স্থাপত্য রীতির। এতে যে সমস্ত গুরুত্বপূর্ন বৈশিষ্ট্য ধরা দিল তা হল নেভের উলম্ব অভিক্ষেপনে অধিক সংখ্যক মেঝের ব্যবস্থাপনা গির্জাভবনে উচ্চ বক্তৃতামঞ্চের ব্যবহার, প্রধান ফাসাদ ও অন্যান্য পার্শ্ব গাত্রে জানালার কাঁচের পাতের বিন্যাস, ত্রিভুজাকার নকশাকৃত অংশ (পেডিমেন্ট) অভগ্ন কানিসের নীচের কারুকার্য করা অংশ এবং গোলককৃৎ অলংকরনে বিশুদ্ধ ক্লাসিসিজম সংরক্ষন। এতে ক্লাসিক্যাল ম্যানরিজম এবং বিশেষ ক্ষেত্রে ভগ্ন সম্মুখভাগসহ উপাদানে বারোকা শিল্পরীতির সাক্ষাৎ পরিচয় রয়েছে। প্রধান ভজনালয়ে বহু ধাপ বিশিষ্টবেদীর পিঠোপরি উত্তোলিত তাক (retable)এর পরিবর্তে শীর্ষে ভগ্ন মুখমন্ডলসহ একধাপ বিশিষ্ট উত্তোলিত তাক সালোমোনিক স্তম্ভের উপর স্থাপিত হয়। এতে কেন্দ্রীয় অংশটি উম্মুক্ত থাকে যাতে করে সিংহাসন বা বেদী গোচরীভূত হয়। তিনটি নেভের একই উচ্চতা ও একই শীর্ষবিন্দু থাকে, আর পার্শ্ববাহু সহযোগী ভজনালয় সমূহ অধিকাতর নীচু থাকে। অট্টালিকার প্রান্ত বিন্দুর মতই এরা একটি আর একটির সাথে সংযুক্ত থাকে। অলংকৃত গাত্রে

Dhaka University Institutional Repository
সম্প্রসারিত ভগ্ন ললাট কুলঙ্গির মুখমন্ডলে এবং স্তম্ভে হিন্দু মুসলিম স্থাপত্য উপাদান বিশিষ্টভাবে অনুসৃত হয়। অভ্যান্তরীন অলংকরনে যে দেওয়াল চিত্র এবং আলংকারিক ভাস্কর্য থাকে তাতে হয়তো ইউপরোপীয় নয়ত উভয় উপাদানই বিদ্যমান থাকে। যাবতীয় আলংকারিক এবং স্মারক শক্তি প্রধান ফাসাদেই কেন্দ্রীভূত থাকে।[৫১]

স্থাপত্য কলা বিকাশের তৃতীয় ধাপ অষ্টদশ শতাব্দীতে আরম্ভ হয় এরং বর্তমান যুগ পর্যন্ত এটা চালু রয়েছে।[৫২]

তেজগাঁও এর পবিত্র জপমালা রানীর গির্জাতে দ্বিতীয় সাময়িক পর্ব হতে যেসমস্ত স্থাপত্যগত বৈশিষ্ট্য অনুসৃত হয়েছে তাদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ন হল গির্জাতে উচ্চ বক্তৃতা মঞ্চের উপস্থিতি, দেওয়াল গাত্রে জানালার কাচের পাত্রের বিন্যাস ত্রিভুজাকার নকশাকৃত অংশ (Padement), উম্মুক্ত কেন্দ্রস্থল আইল (Aisle) ও নেভের (Nave)সমউচ্চতা, পার্শ্ববর্তী ভজনালয়ের নীচুতা এবং স্থাপত্য উপাদান ও আলংকারিক কারুকার্যে প্রধান ফাসাদের নেতৃত্ব। বস্তুতপক্ষে একটি ক্ষেত্রে এ গির্জাটি বিশেষ কৌতুহলের উদ্রেক করে। "এটা হিন্দু, মুসলিম ও খ্রিস্টান - এ তিনটি স্থাপত্য রীতির সমন্বয়। এজন্যই বাংলাদেশের স্থাপত্যে এটা অতুলনীয়। এখানে উল্লেখযোগ্য হিন্দু স্থাপত্য উপাদান হল পদ্ম ও কলসের প্রতীকধর্মী ব্যবহার, বেদী ধারনকারী খাঁজকাটা খিলান বিশিষ্ট কুলঙ্গী, যুগল পল তোলা স্তম্ভসহ খাঁজ কাটা খিলান বিশিষ্ট প্রবেশপথ আমাদেরকে শায়েস্তা খানের স্থাপত্যের কথাই স্মরন করিয়ে দেয়। ধনুকাকৃতির বক্রছাদ কার্নিস বা ছাইচ বিশুদ্ধভাবে বাংলাদেশীয় কিন্তু সুবৃহৎ এ্যাপ্‌স্ (apse) ও দেওয়ালে শিশু যীশু ক্রোড়ে নিয়ে দন্ডায়মান মাতা মেরী ও জোসেফ, তিন কোন ছাদ ত্রিভূজাকার নকশাকৃত আকাঁ বাকাঁ নকশা সহ স্তম্ভ নিশ্চিত ভাবে খ্রিস্টান।[৫৩]

উপরোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে ১৬৭৭ খ্রিস্টাব্দে এর নির্মাণ কালকে সত্য হিসেবে গ্রহন করার বিরুদ্ধে কোন আপত্তি থাকতে পারেনা। বস্তুত পক্ষে গির্জার সম্মুখে ও পিছনে খোদিত এ খ্রিস্টাব্দে এবং ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে অতিজাঁকজমকতার সাথে গির্জার ত্রি-শতবার্ষিকী পালনের উৎসব পর্বটি এ সত্যটিকে আরো জোরদার করে তুলেছে।

এতদসত্বেত্ত মাদ্রাজ ক্যাথলিক ডাইরেক্টরীতে উল্লেখিত তারিখটি এত শক্তিশালী যে তাকে অস্বীকার করার মত উপাদান আমাদের হাতে অত্যন্ত সীমিতদ্ধ। তবে এর একটি ব্যাখ্যা দেওয়া যেতে পারে। গির্জাটি সতর্ক পর্যাবেক্ষনের পর মনে হয় যে, যে মঞ্চের উপর বেদীটি উত্তোলিত হয়েছে তা সম্পূর্ন গির্জার মধ্যে প্রাচীনতম ইমারত; কেননা মঞ্চ পরিবেষ্টনকারী দেওয়ালটি গভীরতায় ৪১/২ ফুট, আর দেওয়ালের অন্যান্য অংশ ২১/২ ফুট গভীর। এর চেয়ে আরও গুরুত্ব পূর্ন তথ্যটি হল এ যে, গির্জার প্রান্তিক অংশের বিন্যাস এ কথা স্মরন করিয়ে দেয় যে আদি ইমারতের ছাদ খন্ড বিশেষ ত্রিভূজাকার ছিল যা পরবর্তীকালে সমতল ছাদ দ্বারা স্থানান্তরিত হয়। এতে এ অনুসিদ্ধান্তে আসা যায় যে, মধ্যস্থল বেদী ধারনকারী উন্নত মঞ্চ ও তা পরিবেষ্টনকারী দেওয়াল ১৬৭৭ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত হয়েছিল; আর গির্জার অপরাপর অংশ পরবর্তী কালে ১৭১৪ খ্রিস্টাব্দে গড়ে উঠেছিল। পরবর্তীস্তরে আরও কয়েকবার এর সংস্কার ও পূর্নগঠন কার্য চলে। ১৯৪০ সালে একবার[৫৪] এবং পরবর্তীতে সর্বশেষ সংস্কারন হয় ২০০০ সালে।

সুতরাং যেহেতু গির্জা নির্মাণ কাল সম্পর্কে নিশ্চিত কোন প্রামাণ পাওয়া যায়না, সেহেতু নানা তথ্যাদির ভিত্তিতে ১৬৭৭ খ্রিঃ কে গির্জা নির্মাণ কাল বলে ধরে নেওয়া যায়। তবে বর্তমানে পাকা যে গির্জাটি দন্ডায়মান সেটি সম্ভবত ১৬৭৭ খ্রিঃ নির্মিত হয়নি। ১৬৭৭ খ্রিঃ প্রাথমিক গির্জাটি সম্ভবত কোন অস্থায়ী উপকরন দিয়ে নির্মিত হয়েছিল। উক্ত গির্জাটি ধ্বংস হয়ে গেলে কিংবা পরবর্তী কালে প্রয়োজনের তাগিদে বর্তমান গির্জাটি নির্মাণ করা হয়েছে, নির্মাণ পরবর্তী সময়ে আদি বা মূল গির্জার নির্মাণ সনটি উল্লেখ করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

স্থাপত্যিক বর্ণনা ঃ

গির্জাটির চারিদি ক দেয়াল দিয়ে ঘেরা, বাহির থেকে গির্জার অভ্যান্তরিন এলাকায় প্রবেশ করলে হাতের ডান দিকে রয়েছে প্রতীকি 'Grotto' বা গুহা। এখানে রয়েছে বার্নারেড নামক এক নারী মুর্তি। যাকে যীশু দর্শন দিয়েছিলেন। তাই তাঁর সম্মানার্থে তাঁর মুর্তি প্রতীক হিসেবে রাখা হয়েছে।

অতি চমৎকার এবং বহু আকর্ষনীয় স্থাপত্য বৈশিষ্ট্যের সমন্বয়ে গঠিত আয়তাকার এ গির্জাটির সম্মুখ অংশ বাদে অন্যান্য দিক সাদামাটা ভাবে নির্মাণ করা । গির্জাটির সম্মুখ অংশে প্রথমেই যে আকর্ষনীয় বৈশিষ্ট্যটি নজরে পড়ে তা এর ত্রিকোনাকার নকশাকৃত অংশ (বাংলার চৌচালা ছাদের পার্শ্ব অংশের সাথে তুলনা করা যায়) যা এ গির্জার ছাদের আকৃতিকে ঢেকে দিয়েছে। এ ত্রিকোনাকৃতির অংশের শীর্ষে রয়েছে ক্রুশ চিহ্ন, যা এ গির্জার অস্তিত্ব ঘোষনা করছে। কোনাকৃতির অংশের পদ্মপাতার মার্লন নকশা এ অংশের সৌন্দর্যকে বহুগুনে বাড়িয়ে দিয়েছে। এ পদ্ম পাতার নকশা প্রাক মুসলিম আমলে বাংলা স্থাপত্যে বিদ্যমান ছিল। চিত্রনং - ২ দ্রঃ

এ গির্জার সম্মুখ অংশে একমাত্র এবং প্রধান প্রবেশ পথ বহুখাজ বিশিষ্ট অর্ধগোলাকার খিলান সহযোগে গঠিত। খিলানটি খাঁজ কাটা স্তম্ভের নীচে কলসি নকসা সহযোগে গঠিত। উভয় পার্শ্বে সংযুক্ত জোড়া খাঁজকাটা স্তম্ভ রয়েছে কলসি নকশা সহ। এ কলসী নকশা ব্যাংলা স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্য। চিত্র - ৩ দ্রঃ

প্রবেশ পথের খিলানের উপর জোড়া স্তম্ভের উপর দিয়ে দো চালা আকৃতির একটি অংশ রয়েছে যা বাংলার একান্ত নিজস্ব স্থাপত্য বৈশিষ্ট্যের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়।

দু'পাশের জোড়া স্তম্ভ দো চালা আকৃতির অংশ ভেদ করে কিছুটা উপরে উঠে গেছে এবং এ স্তম্ভ গুলোর দু'পাশে আয়তাকার ফ্রেমের মত অংশ রয়েছে। এ দো চালা অংশের উপরে ১৯৪০ সনটি লেখা রয়েছে। খুব সম্ভবতঃ গির্জাটি যখন শেষবার সংস্কার করা হয়েছিল সে সংস্কার সময় কাল বা সে সনটিই উল্লেখ করা হয়েছে এখানে বর্তমান ২০০০ সালে গির্জাটি সংস্কার বা পুনঃ নির্মানের কাজ করা হয়েছে। তবে মধ্যবর্তী দীর্ঘ সময়ে গির্জাটি সম্ভবতঃ সংস্কার করা হয়নি।

এ তারিখের একটু উপরে দু'পাশে দুটি (গির্জার সমুখের ত্রিকোনাকার কাঠামোর মধ্যে পড়ে) দেয়ালে নির্মিত ক্ষুদ্র (খাপ বা কুলঙ্গী) এবং ইহাদের উপরে দু'টি অন্ধ বর্গাকার কুলঙ্গীর মত দেয়ালের শোভা বর্ধন করেছে। নীচের ডুরিক স্তম্ভ গুলোর শীর্ষ যেখানে শেষ হয়েছে তার একটু উপরে দু'টো করে কলসি নকশাসহ জোড়া ডুরিক (Duric) স্তম্ভ রয়েছে।আয়তাকার কাঠামোর মধ্যে সেগুলো ত্রিকোনাকার কারুকার্য খচিত অংশের নীচের অংশ পর্যন্ত বলে মনে হলেও মূলত পদ্ম নকশার ত্রি-কোনাকার কারুকার্য খচিত অংশের পিছনে ছাউনীসহ এ স্তম্ভ গুলোর শীর্ষে শোভা পাচ্ছে।

ত্রিকোনাকার কারুকার্য খচিত অংশ যেখানে শেষ হয়েছে তার পাশেই শীর্ষে ক্রুশ চিহ্নসহ রয়েছে পেয়াজ আকৃতির ছোট গম্বুজ ~~যা রয়েছে~~। এ ধরনের গম্বুজ মুঘল আমলের ইমারতেই দেখা যায়। গম্বুজ দু'টো দু'পাশে দু'টো বুরুজের উপর নির্মিত বলে মনে হলেও আসলে সেগুলো গির্জার সম্মুখের পুরু দেয়াল। পুরুত্বের কারনেই দেয়ালের অংশকে বুরুজ বলে মনে হয়। মূলত ভিতর থেকে ফাঁকা রেখে দু'টো দেয়াল নির্মাণ করে সংযুক্ত করা হয়েছে। আর এ পুরুত্বের কারনেই দেয়ালের গম্বুজ দুটো বাইরের দিকে দুটো করে সংযুক্ত কলাম সহযোগে নীচ থেকে উপর পর্যন্ত আয়তাকার কাঠামোর উপর অর্ধবৃত্তাকার খিলান সহযোগে নির্মিত হয়েছে। গির্জার সম্মুখে উভয় পার্শ্বেই সংযুক্ত স্তম্ভের মধ্যবর্তি আয়তাকার অংশের উপরে অন্ধ কুলঙ্গী আছে। নীচের দিকে রয়েছে তিনটি করে বন্ধনী নকশা। মধ্যবর্তি অংশে অন্ধ আয়তাকার কুলঙ্গীর নীচে একটি বন্ধনী নকশা ।

Dhaka University Institutional Repository

এ গির্জার অভ্যন্তরে ব্যাসিলিকান গির্জার যাবতীয় বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। একটি কেন্দ্রীয় প্রশস্ত পথ (nave) দু'পার্শ্বে দুটো খিলান পথ (aisle)দেউরী (narthex) এবং বেদী বেষ্টনকারী ইমারত (bema); তবে পূর্ব দিকস্থ সমবৃত্তাকার উদগত অংশটি (apse) এর ব্যাতিক্রম, কেননা এটা এখানে ক্ষুদ্রাকার বর্গ গঠন করেছে।[৫৬] গির্জায় প্রবেশ পথের সংখ্যা পাঁচটি, দু'টি উত্তরে দু'টো দক্ষিনে এবং একটি পশ্চিম দিকে।উত্তর ও দক্ষিন পার্শ্বে নয়টি করে মোট আঠারটি গবাক্ষ পথ এর গাত্র বিদীর্ন করে অভ্যন্তরে আলো বাতাসের ব্যবস্থা করে দিচ্ছে।

গির্জার অভ্যন্তর ভাগ মোটামুটি চারটি অংশে বিভক্ত। কেন্দ্রীয় প্রশস্ত পথ, দুটি পার্শ্ববর্তী খিলান পথ এবং গির্জার গোলায়িত প্রান্ত (ধনুকাকৃতির খিলানযুক্ত বা গম্বুজাকৃতির ছাদওয়ালা অর্ধ বৃত্তাকার বা বহুভূজবিশিষ্ট নিভৃত স্থান)। প্রতিটি পার্শ্বে ছয়টি করে ইষ্টক নির্মিত গোলাকার স্তম্ভের (তবে স্তম্ভের ভীত চারকোনাকার) দুটো সারি নেভ হতে পার্শ্ববর্তী আইলের সীমানা চিহ্নিত করে দিয়েছে। ফলে জাঁকালো আকৃতির দুটো স্তম্ভসারি এখানে গঠিত হয়েছে। এ বৈশিষ্ট্যটি দামেস্ক মসজিদ সহ আরও কিছু সংখ্যক মসজিদে অনুসৃত হয়েছে। বহু খাঁজ করা সূক্ষ্মাগ্র খিলান বিশিষ্ট একটি সুবৃহৎ তোরনপথের মাধ্যমে চমৎকার এ্যাপস (apse) এ প্রবেশ করা যায় ; গির্জাটির অভ্যন্তরে এটাই সবচেয়ে আকর্ষনীয় অংশ। এ্যাপস এর প্রতিনিধিত্বকারী সুবৃহৎ খিলান বিশিষ্ট অবকাঠামোটির শীর্ষবিন্দুতে ক্রুশ বিদ্ধ অবস্থায় যীশু খ্রিস্টের মূর্তি। বাইরের চক্ষুকে পীড়াদায়ক এবং মস্তিস্কে আলোড়ন সৃষ্টিকারী এ দৃশ্যটি পাষাণ হৃদয়কেও স্নিগ্ধতম করুন রসে সিক্ত করে তোলে। মূল বেদীটি বহু খাঁজ করা সূক্ষ্মাগ্র খিলান বিশিষ্ট একটি কুলঙ্গী। এখানে কুমারী মেরী শিশু ক্রোড়ে দন্ডায়মান। (বর্তমানে এখানে পঞ্চধাতুর তৈরী হোলি স্প্রিড রাখা আছে)। কুলঙ্গীতে উঠার জন্য তিন ধাপ বিশিষ্ট দুটি সিড়ি আছে। মূল ভজনালয়টি (tabernacle) ওপরের দুটো ধাপ পর্যন্ত পৌছে গেছে। কুলঙ্গীটির দুটি খিলান বিশিষ্ট কাঠামো রয়েছে। প্রতিটি পার্শ্বের এ খিলান বিশিষ্ট কাঠামোর উপর ক্রুশ শোভা পাচ্ছে। এর দু'পার্শ্বে দু'টি আঁকাবাকা নকশায় নির্মিত স্তম্ভ দন্ডয়মান। নীচের ভিত্তিমূল হতে এরা শীর্ষবিন্দুতে পৌছে গেছে। সিড়ির প্রতিটি পার্শ্বে বেদীর সামনে দেয়ালে নির্মিত ক্ষুদ্র কুলঙ্গী রয়েছে। সিড়ির ধাপের ঠিক নীচে শোভা পাচ্ছে ফাসতুন বা সোয়াগ। বাংলার স্থাপত্য শিল্পের এ ধরনের অলংকরনের এটাই সম্ভবত প্রথম উদাহরণ বলে এ একান্তই অভিনব। দেয়ালে নির্মিত ক্ষুদ্র কুলঙ্গীর ঠিক নীচে প্রতিটি পার্শ্বে তিনটি করে করিন্থিয়ান বৈশিষ্ট্যমন্ডিত ছয়টি পাল তোলা স্তম্ভ নির্মিত হয়েছে। এভাবে কাসপ বা সূক্ষ্মাগ্র খিলান বিশিষ্ট কাঠামো, আঁকাবাকা নকশা নির্মিত যুগল স্তম্ভ, পাল তোলা নিমগ্ন করিন্থিয়ান স্তম্ভ এবং সম্মুখবর্তী দেয়ালে নির্মিত ক্ষুদ্র কুলঙ্গী খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। যা ইমারতে গাম্ভীর্য ও স্থাপত্য জাকাঁলোতার ইঙ্গিত বহন করে। বর্তমানে কিছুটা সংস্কার করে পরিবর্তন করা হয়েছে। এর ফলে দেওয়াল ও স্তম্ভ শ্রেণীর একঘেয়েমী ভঙ্গ হয়ে গিয়েছে।

গির্জার মোট যে ১২টি স্তম্ভের সহযোগে ছাদ নির্মিত তা মোটা কাঠের ও লোহার বিমের উপর নির্মিত। লম্বালম্বিভাবে স্তম্ভের উপর বিম দু'টি প্রশস্ত চওড়া লোহার। ছাদের মাঝের অংশ সমতল তবে দু'পাশের অংশ ঢালু। ঢালু অংশের টিনের চালায় ব্যবহৃত কাঠের ফ্রেমের অনুরূপ। ছাদের এ আকৃতি এ গির্জার একটি অনন্য সুন্দর বৈশিষ্ট্য। তবে আহমেদ হাসান দানী তার 'Dacca' (Dhaka - 1962) নামক গ্রন্থে গির্জার ছাদটি প্রাথমিক নির্মাণ কালীন সময়ে ত্রিকোনাকার এবং বর্তমানে সমতল বলে উল্লেখ করেছেন। প্রথমদিকে কাঠের ছাদ ছিল। পরবর্তীতে পুনঃ নির্মাণ বা সংস্কারের সময় লোহা ও কাঠের বিমের উপর ইট সুরকীর ব্যবহার করা হয়েছে।

এ গির্জার সবচেয়ে আকর্ষনীয় এবং ব্যতিক্রমধর্মী বৈশিষ্ট্য বলে যে বৈশিষ্ট্যকে মনে হয়েছে তা হল মূল প্রবেশ পথ দিয়ে গির্জার অভ্যন্তরে প্রবেশ করে উভয় দিকে (সম্মুখ দেয়ালের ভিতরের অংশের) প্রশস্ত দেয়ালের মাঝে সরু সিড়ি। (সিড়ি সহ দেয়াল পোড়া মাটির রঙের এবং সিড়ি ও দেওয়াল ইট নির্মিত নয় বলেই ধরে নেওয়া যায়) অর্থাৎ এ সিড়ি দিয়ে উঠে গম্বুজের নীচে যে অষ্টকোনাকার উম্মুক্ত অংশ রয়েছে সেখানে পৌছান যায়, ঠিক মসজিদের মিনারের মত। তবে এ অংশের উচ্চতা মিনারের উচ্চতার মত নয়, তারও কম। তবে এ বৈশিষ্ট্যটি যে মুসলিম স্থাপত্য বৈশিষ্ট্য থেকে নেওয়া হয়েছে তাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।

Dhaka University Institutional Repository

উভয় সিড়ির উভয় পার্শ্বের সম্মুখে অর্ধবৃত্তাকার খিলানাকৃতির উম্মুক্ত অংশ বা প্রবেশ পথ সহ বর্গাকার দুটি অতি ছোট কক্ষ রয়েছে। সেগুলো ষ্টোর রূমের মত মনে হয়। দু'পাশের দুটি কক্ষে রয়েছে পাথরের ব্যাপটিস্ট ফ্রন্ট বা দীক্ষা দানের জন্য পানির পাত্র। অর্থাৎ অতি মনোরম এ গির্জাটি প্রাক মুসলিম, খ্রিস্টান এবং বাংলার স্থাপত্যের একান্ত নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের সুসমন্বয়ে গঠিত।

দানীর অত্যন্ত মূলবান সুচারু বর্ণনাটি প্রদান না করলে এ গির্জার বর্ণনায় যেন অপূর্নতা থেকে যায়। তাঁর বর্ণনায় ''পূর্বদিকের সম্মুখ অংশ খ্রিস্টিয়ান এবং মুঘল উপাদানের সুসামঞ্জস্য সমন্বয়ে গঠিত। সূক্ষ্মাগ্র (cusp) খিলানসহ প্রবেশ পথের দু'পার্শ্বে খাজ কাটা স্তম্ভ দেয়ালে নির্মিত ক্ষুদ্রখোপ বা Panel করা সম্মুখ গভীর খাঁজযুক্ত উদগত ছাদের প্রান্তভাগ শায়েস্তা খানের স্থাপত্যের কথাই স্মরন করিয়ে দেয়। কিন্তু ইহার ত্রি-কোনাকার নকশাকৃত অংশ সহ বক্রছাদ (gable-end), যীশুকে কোলে নিয়ে দন্ডায়মান মাতা মেরী, আঁকাবাকাঁ নকশা করা স্তম্ভের নমুনা অবশ্যাম্ভাবী ভাবে খ্রিস্টান।[৫৬]

এ গির্জায় এলাকার ভিতরে অনেকগুলো সমাধি পাথর রয়েছে তম্মধ্যে অনেকগুলোই আর্মেনিয়ান, পর্তুগীজ এবং ল্যাটিনদের সবচেয়ে প্রাচীন সমাধি এখানে ১৭১৪ খ্রিঃ ৭ই জুন রচিত হয় যা পর্তুগীজ ভাষায় এখানে খোদিত রয়েছে, একই সনের ১৫ই আগষ্ট লাজার অব এরিভানের (Lazar of Erivan) এর পুত্র, বিশিষ্ট বনিক এ্যাডিকেসের সমাধি প্রস্তরটি আর্মেনিয়ানদের সবচেয়ে প্রাচীন প্রস্তর। পর্তুগীজদের নিজস্ব গির্জা তৈরী না হওয়া পর্যন্ত পর্তুগীজরা Chapal এর Cemetery টি ব্যবহার করত এবং ১৭১৪ খ্রিঃ পর্যন্ত তা করে আসছিল।

গির্জা নির্মাণের ইতিহাস ঃ

এ গির্জার পূর্ব এবং দক্ষিনদিকে সমাধিক্ষেত্র রয়েছে । আগাষ্টানিয়ানদের 'Relotio' নামক বিবরনীতে তেজগাঁও এ ১৬৮২ খ্রিঃ ৭০০ ক্যাথলিক ছিলেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ১৭০৩ খ্রিঃ বঙ্গের রাজধানী মুর্শিদাবাদে স্থানান্তরিত করার পর তেজগাঁয়ের ক্রমাবনতি হতে থাকে, কারন সেনারা ও ব্যবসায়ীরা তখন ঢাকা ছেড়ে নতুন রাজধানীর দিকে ধাবিত হতে থাকেন। ১৭১২ খ্রিঃ মাইলাপুরের বিশপলেইন, এস জে কর্তৃক বঙ্গ সফরের পর যে রিপোর্ট প্রকাশিত হয় সেখানে তেজগাঁয়ের কোন উল্লেখ নেই। খুব সম্ভবতঃ তেজগাঁয়ে তখন কোন গির্জার কাজ চলতনা।

১৬৭৭ খ্রিঃ গির্জা নির্মাণের পর সম্ভবত ১৭০৩ খ্রিঃ তা পরিত্যাক্ত হয় এবং ১৭১৪ খ্রিঃ তা পুর্নঃ গঠিত হয়। ১৭৮৭ খ্রিঃ আগষ্টিনিয়ান প্রাদেশীক গভর্নর বঙ্গদেশে সফরের সময় ঢাকায় (নারান্দিয়া) কোন পুরোহিত ছিল না। কিন্তু তেজগাঁয়ে একজন ছিলেন। এক্ষেত্রে অনুমতি হয় যে, ১৭১৪ থেকে ১৭৮৯ খ্রিঃ মধ্যে ঢাকার গির্জাটি অব্যহৃত থাকে এবং তেজগাঁও থেকে ফাদার গিয়ে হয়তো ঢাকার স্বল্প সংখ্যক ক্যাথলিকদের দেখা শুনা করতেন। ১৮১৫ খ্রিঃ ঢাকার আমপট্রিতে ভক্তিরানীর গির্জাটি নির্মিত হলে তেজগাঁয়ে আর কোন যাজক দেখা যায় না। তখন আমপট্রির ফাদার তেজগাঁয়ের কাজ পরিচালনা করতেন। ১৮৩৬ খ্রিঃ কলকাতা, ভিকারিয়েটের ফাদার হিপোলাইট মুর এস জে ঢাকা সফর করে রির্পোট উল্লেখ করেন যে, পালকীয় অবহেলার কারনে তেজগাঁয়ে তখন ক্যাথলিকের সংখ্যা ছিল মাত্র দশ। এ গির্জায় অধিকাংশ সময়ই বসবাসরত যাজক ছিলেন না। ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দের ১৬ই জুন থেকেই কেবল স্থায়ীভাবে আবাসিক যাজক কাজ করে আসছেন। ১৯৩০ খ্রিঃ মাইলাপুরের অধীনাস্থ গির্জাগুলোর সঙ্গে তেজগাঁও কে ঢাকা ধর্মপ্রদেশের অধীনে ন্যাস্ত করা হয়। তেজগাঁয়ের ক্যাথলিকদের মধ্যে ডাক্তার ক্লেমেও ফ্রান্সিসকো দস আঞ্জুস ছিলেন একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি। ১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দের ২১শে ফেব্রুয়ারী তিনি এ গির্জার রক্ষনাবেক্ষনের উদ্দেশ্যে উইলের মাধ্যমে শিবপুর থানাধীন ব্রাহ্মানাদি ও করকমুড়া সহ আরও কয়েকটি গ্রাম দান করে দেন। ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দের ২৬শে মার্চ তাঁর পুত্র রড্রিকস্ একই উদ্দেশ্যে তেজকুনিপাড়ার অর্ধেকাংশ দান করেন।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৩৯ - ১৯৪০ খ্রিঃ গির্জাঘরের ব্যাপক মেরামতের কাজ করা হয় বলে এর সম্মুখস্থ দেওয়ালে "১৯৪০" খ্রিঃ উল্লেখ আছে।[৫৭]

পূর্বে তেজগাঁও সর্বদা একটি ধর্মপল্লী ছিল। ১৯৫২ খ্রিঃ ক্যাথলিকদের সংখ্যা ছিল মাত্র ৪৫৩। এখান থেকে কিছু সংখ্যক পরিবার নাগরী ধর্মপল্লীর গজারিয়া এবং মঠবাড়ী ধর্মপল্লীর পারওয়ানে (পোওরানে) গিয়ে নতুন বসতি গড়ে তোলেন। ১৯৪৭ খ্রিঃ পাকিস্তানের স্বাধীনতার পর কোন কোন পরিবারকে বাধ্য হয়ে সরকারের কাছে জমি বিক্রি করে দিতে হয়।[৫৮] মাত্রাতিরিক্ত ও অপরিনাম দর্শি মদ্যপান ক্যাথলিক সমাজের একটি ব্যাধি। এর খপ্পরে পড়ে বহু পরিবার অতীতে অশেষ দুগর্তির সম্মুখীন হয়েছে। তেজগাঁয়ের আদি বাসিন্দাদের অনেকেই এ এ অভ্যাসের কারনে দারিদ্রতা ও ভূমিহীনতার শিকার হয়েছিলেন। তারপর ক্রমবর্ধমান ঢাকা নগরীতে চাকরীজীবি অবস্থায় ক্যাথলিকদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। ক্রমানুয়ে ক্যাথলিকদের সংখ্যা দাড়াঁয় নিম্নরূপ ঃ ১৯৬৫ খ্রিঃ - ৮৫৫ জন, ১৯৭২ খ্রিঃ - ১৩০৭ জন, ১৯৮০ খ্রিঃ - ৩৮১৪ জন এবং ১৯৮৫ খ্রিঃ - ৮০০০ জন।

১৯৭১ খ্রিঃ বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর গ্রামাঞ্চলে ব্যাপকভাবে প্রকাশিত ও আইন শৃংখলা পরিস্থিতির অবনতির কারনে ক্যাথলিকরা সাধারনভাবে ঢাকায় স্থায়ীভাবে বসবাসে মনোযোগী হন। এর ফলে তেজগাঁও ধর্মপল্লীর লোক সংখ্যা দ্রত বৃদ্ধিপায় এবং বেশ কিছু ব্যক্তি উক্ত এলাকায় জমি ক্রয় পূর্বক গৃহনির্মাণ করে স্থায়ী ভাবে বসবাস করছেন। বর্তমানে তেজগাঁও ঢাকা নগরীর বৃহত্তম ক্যাথলিক ধর্মপল্লী।

বর্তমানে এ ধর্মপল্লী এলাকায় বিভিন্ন ক্যাথলিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে হচ্ছে হলিক্রস কলেজ, হলিক্রস গার্লস হাইস্কুল, সেন্ট জোসেফ হাই স্কুল, সেন্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ার গ্রীন হেরাল্ড ইন্টারন্যাশনাল স্কুল, বটলমী হোম গার্লস হাই স্কুল, বটমলী হোম অর্ফানেজ নির্মল হৃদয় হোম অব কমপেশান, জাগরনী পাট হস্তশিল্প কেন্দ্র। সংঘ সমিতির মধ্যে আছে প্যারিস কাউন্সিল, দি খ্রিস্টিয়ান কো - অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ, দি ক্রেডিট ইউনিয়ন লীগ অব বাংলাদেশ, খ্রিস্টীয়ান মালটিপারপাস সোসাইটি লিঃ, দি মেট্রোপলিটান খিস্টীয়ান কো- অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি লিঃ, সাধু ভিন্সেন্ট দ্যা পল সমিতি, মারীয়ার সেনা সংঘ ও খ্রিস্টান সমাজ গঠন কর্মসূচী। এছাড়া আছে প্রায় অর্ধ ডজন বিভিন্ন যুব সংঘ।

তেজগাঁও ধর্মপল্লীর অধীনে জয়দেবপুর, কাফরুল, বনানী ও নয়ানগরে মোট চারটি অনগির্জা (chaplantncy) গড়ে উঠেছে। সেখানে বেশ কিছু সংখ্যক ক্যাথলিক বসবাস করছেন।

<u>তথ্য সূত্র</u> ঃ

১. বাংলাদেশ ক্যাথলিক মন্ডলীর ইতিহাস - জেরোস, ডি, ক স্তা - পৃঃ ৪২।

২. A.H. Dani - Dhaka, A Record of Its Changing Fortune S- P - 132.

৩. Dani - op cit, P - 222 - 223.

৪. P. Hasan - op cit, P - 327.

৫. Op cit, P- 355

৬. (জেমস টেলর পূর্বোক্ত, পৃঃ ১১৪ ঃ যতীন্দ্র মোহন রায় ঢাকার ইতিহাস, ১ম খন্ড কমলা প্রিন্টিং ওয়াকর্স, বঙ্গাব্দ, ১৩১৯) পৃঃ ৪৩৮। James Taylor, Topography and Statistics of Dacca, vol-1, (Dhaka, 1843) - P - 250.

৭. Quoted by H. Hosten. "A week at the Bandel convent, Hugli," Bengal past and Present, Journal of the Calcutta Historical society. vol. x. Part I. (Jan – March, 1915), 19 : P -95

Dhaka University Institutional Repository

৮. James Taylor, op, cit, P – 250, East Pakistan District Gazetters General Edition S. N. H. Rizvi, (East Pakistan Govt, Press, Dhaka 1969). P -461
৯. B. C. Allen Eastern Bengal District Gazettetors, Dhaka, (The Pioneer Press Allhabad, 1912) P, 25
১০. Ahmed Hasan Dani, op, cit, P- 132 : Nazim-ud-din Ahmed, Discover the momument of Bangladesh, (The Univ : Press. L. Dhaka, 1987) P. 208
১১. J. J. A. Compas, op, cit. p. 249; J. T. Rankin, The study of Artiquities in Dacca. (Sreenatts Press, Dacca, 1920) P. 19 S. N. H. Razvi. op cit. P. 88
১২. J. J. A. compas, op, cit, P- 249
১৩. Mestrov B. J. seft. " The Second oldest Christian Church in Bengal". Bengal Past and Present. vol. LI. Serial Nos 101 – 102. (January – June, 1936), P – 43
১৪. খ্রিস্টর মন্ডলী পূর্বোক্ত - পৃঃ ১৬
১৫. Ibid তপন কুমার রায় চৌধুরী, পূর্বোক্ত - পৃঃ ৬৭; H. Hostin, ' The Bandel and Chimmura Church Registers, (1757 – 1913) : Bengal Past and Present, vol. XI (July – Dec. 1915 Serial No 21 – 22, P- 174
১৬. J. J. A. compors. op. cit, P- 100
১৭. খ্রিস্টের মন্ডলী, পূর্বোক্ত পৃঃ১৬।
১৮. Menteor B. J. seth. op cit, P- 47
১৯. মোঃ শামসুল হক পূর্বোক্ত - পৃঃ ১৬৩
২০. খ্রিস্টার মন্ডলী পৃঃ ১৬
২১. Travels of Frouy Sebortien Manrique, Introduction XXV
২২. Ibid, Introduction xix
২৩. Bangal Past and Present vol. xxx Part I (1925)
২৪. Travels of Fray sebastien Manrique
২৫. H. Hostin op cit, P – 43
২৬. J. J. A. Compob op cit, P – 103।
২৭. H. Hostin op cit, P – 43
২৮. Travels of Fray Sebastien Manrique -
২৯. খ্রীস্টের মন্ডলী, পূর্বোক্ত পৃঃ ১৬ - ১৭
৩০. F. B. Bradely Birt, op; cit, P – 90
৩১. Syeed Hossain Echoes from old Dacca. (Calcutta, 1909), P- 5
৩২. Syeed Muhammad Taifuor, Glimpses of old Dacca,(The Dacca Press 1952), P – 72
৩৩. খ্রিস্টের মন্ডলী পূর্বোক্ত পৃঃ ১৭
৩৪. East Pakistan District Gazetteers, op cit, P – 62
৩৫. H. Hostin op cit, P – 45
৩৬. N.K. Bhattarali, " The English Factory at Dacca,: Bengal Past and Present, vol. xxxlll 65, 66, Jan - June 1947, P - 31

Dhaka University Institutional Repository

৩৭. J.T. Rankin East Pakistan District Gazetteers, Dacca, 1969, P 221, 222, 452

৩৮. H. Horlen op cit, P - 95

৩৯. Travel of Fray Sebantien Marrique, P - 43

৪০. J.T. Rankin op cit, P - 19

৪১. J. Taylor, op cit, P - 352

৪২. ইতিহাস, তৃতীয় খন্ড, ভাদ্র কার্তিক ১৩৫৯ বাঙ্গাব্দ। শ্রীযদুনাথ সরকার এবং শ্রী ডি আর তালওয়ারকাজ "১৬৭৯ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশে পর্তুগীজ খ্রিস্টান সম্প্রদায় সোয়ার আগষ্টিন সম্প্রদায় ভূ - সন্ন্যাসীদের পক্ষ হতে তাদের সর্বপ্রথম কর্তার কাছে প্রেরীত বিবরন' পর্তুগীজ হতে অনুদিত", পৃঃ - ৫।

৪৩. জেরোম দ্যা ক স্তা, ঢাকার ঐতিহাসিক গির্জা' রোববার তৃতীয় বর্ষ ছত্রিশতম সংখ্যা (১৯৮১) পৃ - ৪৫

৪৪. J. J. A. Campos, P - 45

৪৫. জেরোম দ্যা কস্তা পূর্বোক্ত পৃঃ ৪৫

৪৬. H. Hostin S. J "The Bandel Chinsura Church Register (1757 - 1915)" Bengal Past and Present vol xl July - Dec 1915), Serial No 21 - 22, P - 19

৪৭. H. Hostin S. J. op cit p - 165) ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দের

৪৮. জেরুম দ্য কস্তা পূর্বোক্ত পৃঃ ৪৫

৪৯. জেরোম দ্য কস্তা পূর্বোক্ত পৃঃ ৪৫

৫০. মোঃ শামসুল হক, জপমালা রানীর গির্জা, তেজগাঁও - একটি পর্যালোচনা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা - অক্টোবর ১৯৮৬ পৃঃ ১৭৩

৫১. Maria Tavares Chico "Aspects of Religious Architecture in Portuguese India. " Marg vol VIII (December 1954 November 1) (Marg Publications Bambay) P – 13 - 25

৫২. Ahmed Hasan Dani, Dacca, etc. pp - 132 - 33 : Nazimuddin Ahmad, op. cit, P - 208

৫৩. মোঃ শামসুল হক; পূর্বোক্ত পৃঃ ১৭৫

৫৪. Ahmed Hasan Dani, Dhaka A Record of Its Changing Fortune (Dhaka - 1956) p - 132

৫৫. Dani. H. H. op - cit - P - 222 -223

৫৬. Manuscripts "The Churches of the Augustimans in Dacca"Father Edmurd N. Goodert, CSC. Dacca : 1958 - P - 10-12

৫৭. Manuscripts, op cit - P - 13

Dhaka University Institutional Repository

সাধু নিকোলাস তলেন্টিনো গির্জা
নাগরী

সাধু নিকোলাস তলেন্টিনো গির্জাটি পর্তুগীজ বনিকরা নির্মাণ করেছিল। এক সময় ভারতবর্ষ মসলা ও ধন সম্পদের জন্য বিশ্ব বিখ্যাত ছিল । ইউরোপীয়দের ভারতবর্ষের ধন সম্পদের প্রতি লোলুপ দৃষ্টি ছিল এবং এজন্য তাঁরা এদেশে আগমনের সহজ পথ আবিস্কারের চেষ্টা করে । এরই ধারাবাহিকতায় ১৪৯৮ খ্রিস্টাব্দে পর্তুগীজ নাবিক ভাস্কো -দা-গামার ভারতবর্ষের কালিকটে আগমন ঘটে। পরবর্তীকালে ভারতবর্ষে অন্যান্য ইউরোপীয়দের মত পর্তুগীজদের অভিযানের ইতিহাস শুরু হয় । তবে একথা সত্য যে এ জলপথ আবিস্কারের ফলেই প্রাচ্য ও পাশ্চ্যাত্যের মিলন ঘটে ।

পর্তুগীজ মিশনারীরা ভারতে খ্রিস্ট ধর্ম নিয়ে আসেন এবং ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের খ্রিস্টমন্ডলীর ন্যায় বঙ্গীয় মন্ডলী তিনশত বছর যাবৎ পর্তুগালের অভিভাবকত্বে পরিচালিত হয় ।

ভাস্কো-দা- গামার জলপথ আবিস্কারের প্রায় ২০ বছর পর পর্তুগীজরা বানিজ্যের জন্য বাংলায় পৌছলে তাদের সাথে ধর্ম প্রচারকরা ও ছিল । বাংলায় আগমনের পর তারা বাংলার বিভিন্ন স্থানে গির্জা নির্মাণ করেন এবং খ্রিস্ট ধর্ম প্রচার করেন। তাদের নির্মিত নাগরীর গির্জাটির নাম সাধু নিকোলাস তলেন্টিনো গির্জা ।

বর্তমানে নাগরীর সাধু নিকোলাস তলেন্টিনো গির্জাটি টঙ্গী কালীগঞ্জ মহাসড়কের দক্ষিণ দিকে নাগরী গ্রামে অবস্থিত । সপ্তদশ শতাব্দীর শেষের দিকে এ গির্জাটি পর্তুগীজদের দ্বারা নির্মিত হয়েছিল । তখন গির্জাটি বৃহত্তর ঢাকা জেলার নারায়নগঞ্জ সাবডিভিশনে রুপগঞ্জের ভাওয়াল পরগনার নাগরীতে ছিল। বর্তমানে প্রশাসনিক বিভক্তির ফলে ১৯৯২ সালের পরে স্থানটি গাজীপুর জেলাধীন রয়েছে।

গির্জার স্থাপত্যিক বর্ণনা ঃ

সাধু নিকোলাস তলেন্টিনো গির্জা ভবনটি আয়তাকার । পূর্ব পশ্চিমে ১৪২ ফুট এবং উওর দিকে ৪৫ ফুট এবং দক্ষিণ দিকে ৩৭ ফুট । উচ্চতা ২১ ফুট ৬ ইঞ্চি পলেস্তরা করা এ গির্জাটি উওর মুখী। সম্মুখের এ অংশে চারটি অষ্ট কোনাকার সোনালী রঙের স্তম্ভ (Pillar) সহযোগে একটি বারান্দা নির্মিত হয়েছে । স্তম্ভগুলো উঁচু আয়তাকার স্তম্ভমূলের (Padestal) এর উপর নির্মিত । বারান্দার উপর ঢেউ খেলানো নকশাকৃত ছাদ-পাচিল বা রেলিং (Paraped) বারান্দার শোভা বর্ধন করেছে এবং নীচে তিন সারি অলঙকারিক বন্ধনী দ্বারা অলংকৃত । গির্জার সমতল ছাদের চারিদিকে নকশাকৃত ছাদ-পাচিল গির্জার উপরের অংশের সৌন্দর্যকে বাড়িয়ে দিয়েছে । সম্মুখের অংশে মুকুটের মতো ত্রিকোনাকার কারুকার্য খচিত অংশ (Pediment) গির্জাটিকে দৃষ্টি নন্দন করে তুলেছে । এ ত্রিকোনাকার কারুকার্য খচিত অংশের মধ্যবর্তি স্থানে দুটি স্তম্ভের উপর ভিত্তি করে নির্মিত একটি কৌনিক খিলানের মধ্যবর্তি অংশে গির্জার নির্মান কাল , ১৬৬৩ খ্রিস্টাব্দ লিখিত আছে । খিলানের শীর্ষে ক্রুশ চিহ্ন গির্জার অস্তিত্ব ঘোষনা করছে । এ ছাড়াও খিলান স্তম্ভের দুপাশে দুটি স্তম্ভে এবং স্তম্ভ দুটির কৌনিক শীর্ষে শোভিত বারান্দায় এবং ছাদের উপরে ছাদ-পাচিল এবং গির্জার পুরো অংশে গোলাপী, নীল এবং ধূসর রঙ্গের ব্যবহার দেখা যায় । গির্জাটিকে আকর্ষনীয় করার জন্য এসব রঙের ব্যবহার হয়েছে। চিত্র নং - 4 দ্রঃ

সাধু নিকোলাস গির্জায় মোট ৮টি প্রবেশ পথ আছে । প্রবেশপথ গুলি অর্ধবৃত্তাকার আদলে শোভিত । উত্তর দিকে মূল প্রবেশ পথ । মাঝের প্রবেশ পথের খিলানের চূড়ার উপর একটি ক্রুশ চিহ্ন দেখা যায় ।

Dhaka University Institutional Repository

গির্জায় মোট ১৪ টি জানালা পর্যাপ্ত আলো বাতাসের জন্য সুবিন্যস্ত। গ্রীলযুক্তাকারে জানালাগুলো বাতাস প্রবেশের সুবিধার্থে মেঝে পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল । বর্তমানে প্রায় দু/আড়াই ফুট পর্যন্ত বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে । জানালাগুলোর উপরিভাগ অর্ধবৃত্তাকার । তবে বহির্ভাগে অর্ধবৃত্তের উপরের অংশে বহুখাজ বিশিষ্ট অর্ধবৃত্ত দ্বারা শোভিত।

বয়স্কদের মুখে শোনা যায় যে, এক সময় এ গির্জায় দুটি বুরুজ ছিল । এর প্রত্যেকটিতে একটি করে ঘন্টা ছিল। ১৮৯৭ খিস্টাব্দে ভুমিকম্পের ফলে দুটো বুরুজই ভেঙ্গে পড়েছে। এখন কোন বুরুজ নেই। বর্তমানে গির্জার সম্মুখে একটি বারান্দা গির্জাটির সঙ্গে যোগকরা হয়েছে মাত্র। চিত্র নং - ৫ দ্রঃ

মূল প্রবেশ পথ দিয়ে গির্জাটির অভ্যন্তরে প্রবেশ করলে প্রবেশপথ বরাবরে গির্জার মূল অংশ (Nave) দেখা যায় যা প্রার্থনামঞ্চের দিকে চলে গিয়েছে । গির্জার মূল অংশের দু'পাশে ছয়টি করে বারোটি স্তম্ভ এবং প্রার্থনাকারীদের আসন পাতা আছে । প্রার্থনা বেদীটি উচু মঞ্চের উপর নির্মিত এক বৃহৎ অর্ধবৃত্তাকার রূপে বেদীটি আলাদাভাবে নির্মাণ করে এর গুরুত্ব বুঝানো হয়েছে। উচু প্রার্থনা মঞ্চের উপরে আরও একটা মঞ্চ তৈরী আছে। এর পিছনেই ক্রুশ বিদ্ধ যীশুর প্রতীক রাখা হয়েছে। দেয়ালটি হালকা গোলাপী রঙের। দেয়ালজুড়ে ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে লতাপাতায় জড়ানো গোলাপ ফুল ও ফুলদানী আঁকা আছে । সব মিলে এখানে দেয়াল চিত্র ফুটানোর একটি চেষ্টা দেখা যায় । তবে তা অতি নিম্ন মানের । ক্রুশ বিদ্ধ যীশুর ভাস্কর্যটির নীচেই চকলেট রঙের বার্নিশ করা কাঠের যে প্রার্থনা বেদীটি সাজান হয়েছে, সেটি আনুভূমিকভাবে তিনটি স্তরে ভাগ করা যায় । এর শীর্ষভাগের অংশেরয়েছে আরও তিনটি প্যানেল । এখানে মাঝের অংশটির কাঠের ফ্রেমের ভিতর ক্রুশচিহ্ন এবং ইহার দু'পাশে কৌনিক শীর্ষ বিশিষ্ট কাঠের ফ্রেমে যীশু খ্রিস্ট এবং মেরীর ভাস্কর্য দন্ডয়মান দেখা যায় ।

এর নীচের অর্থাৎ মধ্যবর্তী অংশটিও লম্বালম্বি তিনটি ভাগে বিভক্ত। বা'দিকের অংশে রয়েছে ভাস্কর্য, ডানদিকে কাঠের সূক্ষ কারুকাজ । তারপর সর্বনিম্নে অংশটুকু উপরের দু'টি ভাগ হতে অপেক্ষাকৃত ভাবে বেশসরু এবং সুক্ষ কারুকাজ করা । এ কাঠের অংশের সম্মুখে একটি খালি জায়গা আছে । প্রার্থনার সময় এখানে মোমবাতি জালানো হয় এবং পবিত্রতার প্রতীক ফুল রাখা হয় । এ কাঠের মঞ্চের দু'পাশে দুটি অর্ধবৃত্তাকার শীর্ষসহ দরজা রয়েছে । মূল মঞ্চের দুপাশেও অনুরূপ দুটি প্রবেশ পথ আছে । চিত্র নং - ৬ দ্রঃ

এ মঞ্চটির সামনে বড় একটি কাঠের টেবিল রাখা আছে এবং এর পাশেই বাইবেল স্ট্যান্ড। এখানে দাড়িয়ে পুরোহিত বাইবেল পাঠ করেন এবং প্রার্থনাকারীদের উদ্দেশ্যে তার বাণী পেশ করেন । আর এ প্রার্থনা বেদীর উপর থেকেই প্রধান পুরোহিত বা তাঁর অনুপস্থিতিতে পাল পুরোহিত প্রার্থনাপরিচালনা করেন । এছাড়া কোন বিবাহের অনুষ্ঠান হলে এখান থেকেই তা পরিচালনা করা হয়।

এ টেবিল সদৃশ এ অংশের উপর প্রতিদিন ফুলদানীতে তাজা ফুল রাখা হয় ।আমাদের দেশের গির্জায় এ ফুল রাখার প্রচলনটি হিন্দু মন্দিরে কিংবা তাদের প্রতিমার সম্মুখে পূজার সময় ফুল দেবার রীতি থেকেই এসেছে বলে ধারনা করা যায়। গির্জার সমতল ছাদটি কড়ি কাঠের বিমের উপর চুন সুরকীর মিশ্রনের ঢালাই দ্বারা মজবুত ভাবে নির্মিত । তবে বর্তমানে গির্জায় মূল অংশের দু'পাশে লোহার স্তম্ভ শীর্ষের উপর লম্বা দুটি বিম ছাদের নীচে দেওয়া হয়েছে ।

এ গির্জায় স্থাপত্যিক অলংকরন ছাড়াও কিছু মেকি অলংকরন রয়েছে । গির্জায় প্রধান প্রবেশপথ দিয়ে প্রবেশ করলে হাতের ডানদিকে দেখা যায় গভীর কুলঙ্গী। এ কুলঙ্গীতে আছে যীশুর পালক পিতা যোসেভের দন্ডায়মান মুর্তি । বাঁ'দিকের অনুরুপ গভীর একটি কুলঙ্গীর ভেতর স্থাপন করা আছে মাতা মেরীর মূর্তি বা ভাস্কর্য ।

Dhaka University Institutional Repository

এছাড়াও বেদীর সামনে বৃহৎ খিলানের দুপাশের দেওয়ালে দুটি মূর্তি আছে । মূর্তি দুটি কারুকাজ করা কাঠের কুলঙ্গী সদৃশ ফ্রেমের মাঝে শোভিত । ডান দিকেরটি জনপলের দন্ডায়মান মূর্তি ও বাঁ'দিকের যীশুর যুবক অবস্থার মূর্তি । চিত্র নং - ৭ দ্রঃ

এসব ভাস্কর্য কাঠের ফ্রেমের আকারে সীমায়িত স্থানে রক্ষিত। এ ফ্রেমের দু'পাশে দুটি অংশ আছে। এগুলোর মধ্যাংশ সাদা এবং সাদার মাঝে চকলেট ও নীল রঙের নকশা করা । এ অংশ সহ মূল ফ্রেমের উপর ক্রুশ চিহ্ন রয়েছে এবং তারও উপরের দেয়ালে 'অন্ধকারে আলো জ্বালাতে' কথাটি লেখা আছে। সব কথাই এখানে বাংলা ভাষায় লেখা ।

যীশুর এ ভাস্কর্যের উভয় পাশে আর ও দু'টি ভাস্কর্য শোভা পাচ্ছে। এগুলোর 'একটি মাতা মেরী শিশু সন্তান কোলে দন্তায়মান' অবস্থায় আছেন। জনপলের ভাস্কর্যের পাশে চিত্রে সারিবদ্ধ মানুষের সম্মুখে খোলা বাইবেল দেখা যাচ্ছে। চিত্রটি আকর্ষনীয়। চিত্র নং- ৮ দ্রঃ

যীশু যুবক অবস্থায় ভাস্কর্যের মঞ্চটিরই উপর দু'পাশে আরো দুটি ভাস্কর্য-ডানদিকে একজন মাতা মেরী তাঁর সন্তান কোলে এবং বা দিকে যীশুর পালক পিতা (যোসেফ) সন্তান কোলে দন্ডায়মান অবস্থায় শোভা পাচ্ছে।

চিত্র নং- ৯ দ্রঃ

এছাড়া গির্জার দেয়ালে (যীশুখ্রিস্ট এবং তাঁর সঙ্গীদের ভোজদৃশ্য (Last Supper) যীশুর মৃত্যু দন্ড, যীশু কর্তৃক নারীদের সান্তনাদান ইত্যাদি বিভিন্ন অবস্থায় যীশুর পনেরটি তৈল চিত্র ফ্রেমে বাঁধানো আছে।

গির্জার সম্মুখ অংশের ডান দিকে রয়েছে 'Grotto' বা গুহা। চিত্র নং - ১০ দ্রঃ

গির্জার সম্মুখে প্রায় ১০০ ফুট দূরে ফাদার এবং মিশনারী প্রধানের বাসগৃহ রয়েছে। (চিত্র-১১) এ গৃহ একসময় পর্তুগীজদের বাসগৃহ ছিল বলে জানা যায়। এ বাসগৃহটি দক্ষিণমুখী। এটি একটি আয়তকার গৃহ এবং দু'তলা বিশিষ্ট। উত্তর দক্ষিণে ৫০ ফুট এবং পূর্ব পশ্চিমে ৬০ ফুট ।এছাড়া গির্জার পিছনে অর্থাৎ দক্ষিণ দিকে একটি আধুনিক দোতলা ইমারত রয়েছে। সেখানে পবিত্র ক্রুশ কিশোরালয় এবং মিশনারী স্কুল এবং বোডিং হাউজ বিদ্যমান। ইমারতটি চারিদেকে দেয়াল দ্বারা ঘেরা এবং ভেতরের ইমারতের সামনে একটি বড় খোলা জায়গা রয়েছে। এটা বোডিং হাউজের অংশ হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এ ইমারতটি পর্তুগীজদেরই করা বলে স্থানীয় লোকজনের অভিমত। এ ইমারতের কয়েকহাত দূরে পূর্ব দক্ষিণ কোনে সিষ্টারদের বসবাসের জন্য একটি একতলা ইমারত রয়েছে। এসব ইমারতে স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্য খুবই সাদামাটা। মিশনারী স্কুলের পশ্চিম দেয়াল সংলগ্ন স্থানে কবর স্থান বিদ্যমান । এখানে বর্গাকৃতির একটি ছোট ইমারত দেখতে পাওয়া যায় , যা বর্তমানে দন্ডায়মান গির্জার সমসাময়িক বলেই মনে হয়, এ ইমারতে অর্ধবৃত্তাকার খিলানসহ দু' টি প্রবেশপথ আছে। সম্মুখ অংশে টিনের ছাউনি দিয়ে বারান্দার মত করা হয়েছে। শবদেহ কবরস্থ করার পূর্বে এখানে এনে রাখা হয় ও শেষকৃত্য করা হয় ।

চিত্র নং- ১২ দ্রঃ

<u>নির্মাণ কাল</u> ঃ

ইমারতে লিপি উৎকীর্ন থাকলে এর নির্মাণ কাল নির্ধারন করা সহজতর হয় । কিন্তু আলোচ্য গির্জাটির বেলায় ইমারতের গায়ে এর নির্মাণ সন ১৬৬৩ খ্রিস্টাব্দে উল্লেখ্য করা থাকলেও এ বিষয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে । কেননা গির্জা সম্পর্কিত লিখিত তথ্যে তারিখ পাওয়া যায়না ।

Dhaka University Institutional Repository

অতি সম্প্রতি প্রকাশিত গ্রন্থাদিতে নাগরীর আদি বা প্রাথমিক গির্জাটি "ছন দ্বারা আচ্ছাদিত ছিল" বলে জানা যায়। স্থানীয়ভাবে জনগনের মুখে এ তথ্য পাওয়া যায়। 'ছন' নির্মিত সে গির্জাটি ১৬৯৫ খ্রিঃ নির্মিত হয়েছিল বলে বিভিন্ন লিখিত তথ্যে বা ধর্মযাজকদের বিভিন্ন রির্পোটে[২] পাওয়া যায়। তবে বর্তমানে গির্জাটি যেখানে দাঁড়িয়ে আছে মূল গির্জাটি সেস্থানে ছিলনা বলে তথ্য পাওয়া যায়। বর্তমান কবর স্থানে গির্জাটি কুড়ে ঘরের মতো ছনের ছাউনিতে বিদ্যমান ছিল। স্থানীয় উচ্চারনে ছন কে 'ছোন' বলা হয়।

আদি গির্জাটি ধ্বংস হয়ে যাবার পর বর্তমানে পুনঃ নির্মিত 'ইট সুরকীর গির্জাটির নির্মাণ কাল ১৬৬৩ খ্রিস্টাব্দে বলে লিখিত আকারে পাওয়া যায়। আদি গির্জাটি ১৬৯৫ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত ছিল বলে লিখিত রিপোর্টে পাওয়া যায়। অতএব ইমারতের গায়ে লিখিত তারিখ সঠিক বলে মনে হয় না। গির্জা স্থাপত্যের ইতিহাসে দেখা যায় যে, স্থায়ী ইমারতটি অনেক পরে ১৮৮৮খ্রিস্টাব্দে নির্মিত হয়েছে। এরপর বহুবার সংস্কারও হয়েছে। বিভিন্ন সময়ের সংস্কারের চিহ্নও বিদ্যমান আছে।

ঐতিহাসিক সূত্রে জানা যায় যে, ১৭২৫খ্রিস্টাব্দে ফাদার আগোস্তিনো সান্তো আগাস্তিনো নাগরীর পাল পুরোহিত ছিলেন। তিনি ১৭৫০ খ্রিঃ তাঁর রিপোর্টে ১৬৯৫ খ্রিঃ ফাদার দস আন্জুস কর্তৃক নাগরী গ্রাম ক্রয় ও গির্জা নির্মানের কথা উল্লেখ করেছেন। তার সময় থেকে ৬২ বৎসর পূর্বে (অর্থাৎ ১৬৬৩ খ্রিঃ) যদি নাগরীতে গির্জা থাকতো সে বিষয়ে তিনি নিশ্চয়ই জানতেন। কিন্তু তাঁর রিপোর্টে এ ব্যপারে কোন উল্লেখ নেই। তাছাড়া ১৬৮২ খ্রিস্টাব্দের আগাষ্টিনিয়ান সংঘের (Relatio) রির্পোটে ঢাকা ও তেজগাঁও সহ পূর্ববঙ্গের সব বাণী প্রাচার কেন্দ্রের উল্লেখ আছে, কিন্তু নাগরীর কোন উল্লেখ নেই। উপরন্তু ১৬৭৭ —১৬৮৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে বিভিন্ন জেসুইস্ট যাজক কর্তৃক পূর্ববঙ্গ সফরের রির্পোট গুলোতে লরিকূল, ভূষনা* ঢাকা ও তেজগাঁ বাণী প্রচার কেন্দ্রের উল্লেখ আছে। কিন্তু নাগরীর নাম নেই। এসব তথ্য প্রমান থেকে এ সিদ্ধান্তে পৌছা যায় যে, ১৬৬৩ খিস্টাব্দে নাগরী গির্জার অস্তিত্ব ছিলনা। তবে '১৬৬৩' খ্রিস্টাব্দের উল্লেখ থেকে একথা অনুমান করা করা যায় যে, এ বছরটি হয়তো নাগরীতে আগত কোষাভাঙ্গার (ফরিদপুর) ক্যাথলিকদের অভিবাসনের বৎসর কিংবা কোষাভাঙ্গাঁয় গির্জা নির্মাণ সাল। যেহেতু উক্ত অঞ্চলের লোক এখানে এসে বসতি স্থাপন করেছে, সেহেতু তারা তাদের অভিবাসনের বা কোষাভাঙ্গাঁয় গির্জা নির্মাণের কালটি অক্ষুন্ন রাখতে চেয়েছে। তাই এ তারিখ ইমারতে লিখিত হয়েছে। সার্বিক আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এ কথাই প্রতীয়মান হয় যে গির্জাটি প্রথমে ১৬৬৩ খ্রিস্টাব্দে ও পরে ১৬৯৫ খিস্টাব্দে নির্মিত হয়েছিল। ঐতিহাসিক সূত্রে আরও জানা যায় যে, ঈসাঁ খার আমলে পর্তুগীজরা শীতলক্ষ্যা নদীপথে নাগরী পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিল। সেখানে অবস্থানকালে সম্ভবত ১৬৬৩ খ্রিঃ তারা নাগরীতে 'ছনের' গির্জা ব্যবহার করে থাকতে পারে। তবে ইমারত হিসাবে তা নির্মিত ছিল না। অতএব নাগরীর গির্জা আদিতে ১৬৬৩ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত হয়েছিল বলা যায়। ১৬৯৫ খ্রিস্টাব্দে তা আবার 'ছন' বা স্থায়ী উপকরণ দিয়ে নির্মিত হয়।

১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে ৮ই এপ্রিল বর্তমান কবরস্থানের জমির উপর নির্মিত ছোন এর চাল যুক্ত গির্জাটি আগুনে সম্পুর্নরূপে ভষ্মীভূত হয়। এস্থান থেকে প্রায় ১৫০ গজ দূরে ১৮৮৮ খ্রিঃ বর্তমানে ইট সুরকীর নির্মিত গির্জাটি নির্মিত হয়। এর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপিত হয়েছিল ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দের ২৪শে আগষ্ট এবং নির্মিত এ গির্জাটি আশীর্বাদিত হয় ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দের ২২শে ফেব্রুয়ারী।[৩]

জেরোম 'ডি' কস্তার লেখা থেকে জানা যায় যে, বৃহত্তর ফরিদপুর জেলার মধুমতি নদীর তীরবর্তী ভুষনার রাজার (জমিদারের) পুত্র '১৬৬৩' খ্রিস্টাব্দে মগ জলদস্যুদের দ্বারা অপহৃত হয়ে আরাকানে নীত হন এবং পরে তাদের কাছ থেকে মুক্তিপেয়ে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করে আন্তাইন দা রোজারিও নাম ধারন করেন। তিনি আনুমানিক

* ফরিদপুর শহর থেকে ২০ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে যশোর জেলার সীমান্তে ১টি প্রাচীন জমিদারী বা রাজ্য

Dhaka University Institutional Repository

১৬৭০ খ্রিঃ ভূষনায় প্রত্যাবর্তন করে কিছু সংখ্যক আত্মীয় স্বজনকে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করেন। তিনি ভুষনা ছাড়াও বৃহত্তর ঢাকা জেলার উত্তরে নদীর দু' ধারে এবং আসামের রাঙ্গামাটিতে দু'বছরে হাজার হাজার নিম্নবর্নের হিন্দুদের দীক্ষিত করেন। ১৬৭৭ খ্রিঃ ১লা ডিসেম্বর জেসুইস্ট আন্তইন দ্যা মেগালহিয়েস গোয়াস্থ তাঁর কর্তৃপক্ষের নির্দেশে বঙ্গে আগমন করেন এবং রোজারিওর ধর্মান্তরিত খ্রিস্টানদের ধর্মীয় শিক্ষার জন্য বাণী প্রচার কেন্দ্র খোলার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধী করেন। তৎকালে ভূষনা রাজ্যেও কোষাভাঙ্গায় সম্ভবত ১৬৬৩ খ্রিঃ থেকে আগাষ্টিসিয়ান ফাদাররা প্রচার কর্মে ব্যস্ত ছিলেন। সেখান থেকে তাঁরা বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা গ্রামে বাণী প্রচার করতেন।সম্ভবত নদী ভাঙ্গনের কারনে এসব ক্যাথলিকদের অনেকেই ছিলেন ভূমিহীন।আর তারা প্রায় শ জোতদারদের দ্বারা নানা জুলুমের শিকার হতেন। এসব অবস্থা দেখে সাধু ফাদার লুইদস আঞ্জুস '১৬৯৫' খ্রিঃ ঢাকার নিকটবর্তী ভাওয়াল পরগনার নাগরী গ্রামটি ক্রয় করে কোষাভাঙ্গাঁর ক্যাথলিকদের নিয়ে সেখানে বসতী স্থাপন করেন। তিনি নাগরীর বর্তমান কবরস্থানের জায়গায় একটি ছোনের চালযুক্ত মাটির দেয়ালের গির্জা নির্মাণ করেন। এটাই নাগরীর প্রথম গির্জা ছিল।[৪]

অত্র অঞ্চলে গেলে অদ্যবধি দেখা যায় অনেক বাড়িই ছোনের চালে, আবৃত্তি কিংবা টিনের চাল ও মাটির দেয়াল দ্বারা ঘেরা। এ আধুনিক যুগে এসেও অত্র অঞ্চলে এরূপ বাড়ি দৃশ্যমান অর্থাৎ কয়েকশত বৎসর পূর্বে গির্জাটি ছোনের চাল এবং মাটির দেয়াল দিয়েই যে নির্মিত হয়েছিল এ ব্যাপারে আর কোন সন্দেহ থাকেনা।

বাংলা সাহিত্যে নাগরীর অবদান ঃ

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে নাগরীর একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। এখানে অবস্থান করেই আন্তইন দা রোজারিও 'ব্রাহ্মণ রোমান ক্যাথলিক সংবাদ' (বাংলা ভাষায় ধর্মশিক্ষা দানের জন্য কথোপকথনের ভঙ্গীতে লিখিত তবে অপ্রকাশিত) এ পুস্তকটি রচনা করেন। বাংলা গদ্যরীতির প্রচলনে এ গ্রন্থটি একটি অমূল্য অবদান রেখেছে। এখানে পর্তুগীজ ফাদার ম্যনুয়েল দা আসুম্পসাওও (১৭৩৪-১৭৫৪) কৃপা শাস্ত্রের অর্থভেদ (কথোপকথনের ভঙ্গীতে পুস্তকটি খ্রিস্ট ধর্মের মাহাত্ব তুলে ধরেছে) নামক একটি বই রচনা করেন। এটির এক পৃষ্ঠায় রোমান হরফে লেখা এবং অন্য পৃষ্ঠায় একই বিষয়ে পর্তুগীজ ভাষায় লেখা হয়। 'Vocabularioem Idioja Bengalla-e-Portugel' নামক পুস্তক বাংলা ব্যাকরণ ও বাংলা পর্তুগীজ শব্দকোষ রচিত হয়েছে।

এ গির্জাকে কেন্দ্র করেই অত্র অঞ্চলের খ্রিস্টান জনগোষ্টির সমাজ ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। কয়েকটি গ্রামমিলে গ্রাম ভিত্তিক ছোট কমিটি, গির্জাকে কেন্দ্র করে কেন্দ্রীয় কমিটি তৈরী হয়েছে। গ্রাম ভিত্তিক কমিটিতে সাধারন বিচার করা হয়। সেখানে অমিমাংসিত বিষয় কেন্দ্রীয় কমিটিতে ফাদার কর্তৃক মিমাংসিত হয়। আবার গির্জার কেন্দ্রীয় কমিটিতে কোন বিচার সম্পাদন সম্ভব না হলে তবে আদালতের স্মরনাপন্ন হওয়ার রীতি আছে। খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের বিয়ে গির্জাকে কেন্দ্র করেই সম্পন্ন হয়। বর পক্ষ এবং কনে পক্ষ গির্জায় আসে এবং ফাদার বর কনের বিয়ে পড়ান। তারপর বরের বাড়ীর ভোজ উৎসব মদ্যপান গির্জাতেই সম্পন্ন করা হয়।[৫]

১৯০৪ সালের এক রির্পোটে দেখা যায় যে, নাগরীর অধীনে তখন প্রাইমারী স্কুল ছিল। মোট ছাত্র সংখ্যা ছিল ২২০জন এবং ছাত্রী ছিল ১৭৬ জন। একটি ক্যাথলিক দীক্ষা প্রার্থী গৃহ 'ক্যাটেখুসেন্ট' এবং দরিদ্র বিধবা ও সামাজিকভাবে দূরদশায় পতিত নারীদের জন্য একটি 'আশ্রয়গৃহ' ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে এসব প্রতিষ্ঠানের কি হয়েছে তা জানা যায়না। ১৯১৮ খ্রিঃ নাগরীর অধীনে তিনটি প্রাইমারী স্কুল মঠবাড়ী, পাঞ্জরা, দড়িপাড়ায় অবস্থিত ছিল। সেখানে সর্বমোট ১৪৩ জন বালক ও ২০৬ জন বালিকা পড়াশুনা করত। একটি মিডল স্কুলও ছিল। মিতল স্কুলে ১৪৬ জন বালক এবং ৪২ জন অনাথের জন্য একটি অনাথাশ্রম ছিল। ১৯২০ সালের ২রা জানুয়ারীতে নাগরীতে সেন্ট নিকোলাস হাইস্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯২১ সালে এর ছাত্র সংখ্যা ১২৯ এবং ১৯৬৫ সালে ৬৪৫ জন

Dhaka University Institutional Repository

ছিল। শিক্ষার্থীদের মধ্যে ৪০০জন ছিল ক্যাথলিক। ১৯৬৫ সালে এ হাইস্কুলে নতুন দ্বিতল ভবনটি আশীর্বাদিত হয়। ১৯৭৫ সালে পাঞ্জোরা গার্লর্স হাইস্কুল স্থাপিত হয়।[৬]

এ গির্জার অধীনে ১৫টি গ্রাম রয়েছে।* এখানে ক্যাথলিক খ্রিস্টানদের সংখ্যা - ৬৫৭৫ জন।[৭]

১৮৩৬ খ্রিঃ নাগরী ধর্মপল্লীর অধীনে ছিল - নাগরী, মঠবাড়ি তুমুলিয়া ও রাঙ্গামাটি গ্রাম। তখন মোট ক্যাথলিক ছিল ৪০০০। ১৮৪১ সালে আনুষ্ঠানিক ভাবে তুমলিয়া ও রাঙ্গামাটিকে নাগরী ধর্মপল্লী থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়।

<u>তথ্য নির্দেশিকা</u> ঃ

১। জেরোম, ডি, কস্তা বাংলাদেশ ক্যাথলিক মন্ডলী -বাংলা বাজার - ঢাকা - ১৯৮৩ - পৃঃ-১
২। পূর্বোক্ত – পৃঃ ৪২৯
৩। পূর্বোক্ত – পৃঃ ৪৩৪
৪। পূর্বোক্ত – পৃঃ ৪২৭–২৮
৫। স্থানীয় সূত্রে প্রাপ্ত
৬। পূর্বোক্ত – পৃঃ ৪৩৫–৩৫
৭। The Cathedra Directory of Bangladesh, Dhaka – 1995-p-53

* গ্রামগুলি হচ্ছে পাড়ারটেক, লুদুরিয়া, আড়াগাও, দক্ষিণ পাঞ্জরা, ছাইতান, ধর্গুন, বাড়াভিয়া, তিরিয়া, বাগদি, নাগরী, বরান, তুমুলিয়া দোয়ানী, সুজাপুর, উত্তর পানজোরা।

Dhaka University Institutional Repository

জপমালা রানীর গির্জা
হাসনাবাদ (১৭৭৭ খ্রিঃ)

হাসনাবাদের জপমালা রানীর গির্জাটি ঢাকার নবাবগঞ্জ অঞ্চলে হাসনাবাদের বান্দুরা নামক স্থানে অবস্থিত। জপমালা রানী মাতা মেরীর একটি গুণবাচক নাম অর্থাৎ মাতামেরীর অপর একটি গুণবাচক নামানুসারে এ গির্জাটির নামকরণ করা হয়েছে। এ নামকরণ করে বুঝানো হয়েছে যে, তাঁরই উদ্দেশ্যে (মাতা মেরীর) উৎসর্গকৃত এ গির্জা। তেজগাঁয়ের গির্জাটিও জপমালা রানীর গির্জা নামে পরিচিত। চিত্র নং- ১৩ দ্রঃ

গির্জার স্থাপত্যিক বর্ণনা ঃ

১০৭ ফুট দৈর্ঘ্য এবং ৪৩ ফুট প্রস্থ বিশিষ্ট বৃহদাকার আকর্ষনীয় এ গির্জাটি আয়তাকার। এর সম্মুখ অংশে একটি এবং ডানদিকে একটি টানা বারান্দা আছে। তবে বারান্দাটি ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দে গির্জাটি পুনঃ নির্মাণ কালে ছিলনা। পরবর্তী সময়ে সংযোজন করা হয়েছে। সম্মুখের বারান্দা দিয়ে গির্জায় প্রবেশ করা যায়। এ বারান্দা সংলগ্ন গির্জা গৃহের প্রবেশ পথটি বাংলার সাধারন বাস গৃহের প্রবেশ পথের মত। (চিত্র-১৪) তবে প্রধান প্রবেশ পথে একটি খিলান রয়েছে এবং খিলানের পার্শ্বস্থ ত্রিকোনাকার (spandrel) অংশের মাঝে একটি ক্রুশ চিহ্ন এবং অলংকরন গির্জাকে আকর্ষনীয় করে রেখেছে। আবার এর টিমপেনাম অংশটিকে একটি বড় ফুলের অর্ধাংশের মতও মনে হয়। মূলত এরূপ খিলান 'ভেনেসিয়ান আর্চ' নামে পরিচিত। (চিত্র-১৫) বারান্দা থেকে গির্জার অভ্যন্তরে প্রবেশ করার সময় প্রধান প্রবেশ পথের উভয়পাশে দু'টি এবং বারান্দার সম্মুখের দু'পার্শ্বে আরও দু'টি মিলে মোট পাঁচটি মেকি খিলান দেখা দেয়। প্রবেশ পথের দু'পাশে দীর্ঘ লম্বা দেয়ালে নির্মিত ক্ষুদ্রখোপ (Panel) এবং দেয়ালে নির্মিত ক্ষুদ্র ক্ষোপের উপর স্তম্ভের শীর্ষের মত চারটি অলংকারিকবন্ধনী নকশা রয়েছে। বারান্দার চারকোনায় (পিছনের দুটি সামনের দুটি অংশের প্রায় অর্ধেক) চারটি মূল স্তম্ভ মোটা আকারে নির্মিত।এ সব স্তম্ভ আনুভূমিকভাবে সাতটি ভাগ করে আলংকারিক বন্ধনীর সাহায্যে সজ্জিত। এগুলোর প্রত্যেকটি মেকি বুরুজের মত করে অংকিত হয়েছে বারান্দার নীচের দিকে অর্থাৎ প্ল্যাটফর্মের উপর খিলান বরাবর নীচে জানালার নীচ অংশ ফুলদানী নকশা দিয়ে অলংকৃত করা হয়েছে। প্রতিটি খিলানাকৃতির অংশের উপর আলো প্রবেশের জন্য পাঁচ কোনাকার ভেন্টিলেটার রয়েছে। ভেন্টিলেটার গুলোর উপর বারান্দার চারদিকে রয়েছে একটি অলংকারিক বন্ধনী (Moulding) নকশা। আলংকারিক বন্ধনীর উপরে বারান্দার চারিদিকে ছাদ পাঁচিল রয়েছে এবং ছাদ পাচিলের সামনের অংশ ৮টি এবং দু পাশে তিনটি করে ৬টি এবং সর্বমোট ১৪টি ত্রিকোনাকার ছোট নকশাকৃত অংশ দিয়ে ভাগ করা । এগুলোর মধ্যে ৬টিতে মধ্য অংশে ক্রুশ চিহ্ন রয়েছে। প্রতিটি ভাগে ৩টি করে বরফি নকশা আছে। ছাদ পাঁচিলের নীচের অংশ ঠেকনা (Bracket) নকশা দিয়ে শোভিত করা আছে।

গির্জাটি ইট সুরকী দ্বারা নির্মিত। তবে পশ্চাৎ দেওয়ালটি মাটির এবং এর উপর চুনকাম করা হয়েছে। বারান্দা এবং মূল ইমারতের সম্মুখ অংশ পলেস্তারা করা এবং এর উপর চুনকাম করা হয়েছে।তাছাড়া বিভিন্ন স্থাপত্যিক নকশায় হলুদ, লাল, সবুজ রং ব্যবহার করে এ ইমারতকে অলংকৃত করা হয়েছে। চিত্র নং- ১৬ দ্রঃ

জপমালা রাণীর গির্জা ইমারতটি সুদৃশ্য অলংকরণে সজ্জিত। ইমারতের মাঝামাঝি অংশে ছাদ-পাঁচিলের উপর pediment বা ইমারতের মাঝামাঝি অংশে ছাদ-পাঁচিলের উপর pediment বা ত্রিকোনাকার নকশাকৃত অংশ দৃশ্যমান, সম্মুখ অংশের ছাদ-পাঁচিল কোনায় এসে মিনারের মত সামান্য উঁচু অবস্থায় চারটি স্তম্ভের সহযোগে চারটি অর্ধ-গোলাকার খিলান যুক্ত কক্ষের মত 'কিয়স্ক' বিশেষ। 'কিয়স্কে'র গম্বুজ রূপটি চারপাশে উপরের দিকে ক্রমহ্রাসমান স্তম্ভ শীর্ষ দ্বারা শোভিত। 'কিয়স্কে'র মুল বিন্দু থেকে ঘন্টা ঝুলানো আছে। গির্জার প্রার্থনার সময় এ ঘন্টা ধ্বনি দ্বারা জানানো হয়।' কিয়স্ক' ধারণকারী 'করেন্থিয়' অর্ধগোলাকার খিলানগুলো টিমপেনাম অংশ ভরাট করা।

Dhaka University Institutional Repository

খিলানের স্পেনড্রিলে দু'টি চৌকোনাযুক্ত ছিদ্র পথ। এ ছিদ্রপথের উপরে অপরূপ অলংকরণে ছাদ-পাঁচিল সজ্জিত। এ অংশের উপরে আবার চারটি ছিদ্রপথযুক্ত কার্নিশ। এ কার্নিশের চার কোনায় ক্রমহ্রাসমান স্তম্ভশীর্ষ। অলংকরণে ক্রমহ্রাসমান নকশাটি বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। এটি খ্রিস্টধর্মের একটি প্রতীক চিহ্ন বিশেষ।

। এদ্বারা বুঝান হয়েছে যে পৃথিবী ক্রমশঃ ছোট হয়ে আসছে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, স্তম্ভগুলোর গাত্রে অগভীর লম্বাটে কুলঙ্গী অলংকরণ ও ব্র্যাকেট সদৃশ অলংকরণ মুঘল স্থাপত্যের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। অতএব, এ গির্জার অলংকরণে স্থানীয় ও সর্বভারতীয় নকশার সংযোজন হয়েছে বলা চলে। ধর্মীয় আমেজ সৃষ্টি করার জন্য ত্রিকোননকশা ও ক্রুশ ব্যবহার করা হয়েছে এখানে।

গির্জাটি ১৭৭৭ সালে নির্মিত হয়েছে বলে এর নির্মাণ সন বাংলায় ত্রিকোণ নকশার মধ্যে লিখিত আছে। এ অংশ নানা রঙেও শোভিত। এ গির্জার প্রবেশপথ পূর্ব দিকে এবং বেদী পশ্চিম দিকে।

গির্জার সম্মুখের বাঁদিকে রয়েছে পাথরে তৈরী 'Grotto' বা গুহা। যীশু এরূপ একটি গুহায় আশ্রয় নিয়েছিলেন এবং বার্নাড নামক একটি রমনী তার সাক্ষাত লাভ করেছিল। তারই প্রতীক হিসেবে এরূপ গুহা প্রতিটি ক্যাথলিক গির্জায় নির্মাণ করা হয়। গির্জার বাঁদিকে রয়েছে (convent) কনভেন্ট, ডানদিকে সমাধিস্থল। পিছন দিকে অফিসকক্ষ এবং ফাদারের বাসস্থান।

মধ্যবর্তী গির্জার মূল অংশ বা (Nave), খিলানপথ (Aisle)সহ গির্জাটি বেসিলিকান (basilican)। নেভের দু'পাশে ছয়টি করে মোট ১২টি চার কোনা লোহার স্তম্ভ গির্জার মূল অংশের দু'পাশে দু'টি খিলানপথ সৃষ্টি করেছে। গির্জাটির উচ্চতা ২৩ ফুট এ বিরাটাকার গির্জার ১২টি প্রবেশ পথের মাধ্যমে প্রার্থনাকারীদের যাতায়াতের সুব্যবস্থা করে দেয়া হয়েছে। সম্মুখ অংশে তিনটি প্রবেশ পথ আছে।

প্রার্থনাবেদী মেঝে থেকে সামান্য একটু উপরে স্থাপিত বা উত্তোলিত। বেদীর অংশ ৫৩ ফুট দৈর্ঘ্য এবং ৪৩ ফুট প্রস্থ। বেদীর পিছন দেওয়ালে যথারীতি যীশুর ক্রুশ বিদ্ধ প্রতীক মুর্তি রয়েছে। (চিত্র-১৭) বেদীটির মধ্যবর্তী অংশের দু'পাশে তিনটি করে অর্ধবৃত্তাকার খিলান মধ্যবর্তী অংশকে দু'পাশের অংশ থেকে আলাদা করেছে। ডানদিকের বিভক্তকৃত দু'টি অংশের একটিতে যীশুর বসা অবস্থায় সাদা পোষাকে বড় একটি ভাস্কর্য আছে। (চিত্র-১৮) এ অংশের ঠিক বিপরীত দিকে অর্থাৎ বাঁ'দিকের কক্ষটি গায়ক দলের জন্য সংরক্ষিত। প্রার্থনার সময় এরা বাদ্য যন্ত্র বাজিয়ে গান পরিবেশন করে। এছাড়া ডানদিকের ও বাঁ'দিকের অপর দু'টি অংশে প্রার্থনার সময় প্রার্থনাকারীরা আসন গ্রহন করে থাকে। বেদীর অংশে দক্ষিনদিকে চারটি, উত্তর দিকে চারটি, পশ্চিম দিকে ২টি জানালা এবং ৩টি হাই উইন্ড বা স্কাই লাইট গির্জা আলোকিত ও স্বাস্থ্যকর রাখতে সাহায্য করে।

প্রার্থনা বেদীর বিপরীত দিকে অর্থাৎ গির্জার প্রধান প্রবেশ পথ দিয়ে প্রবেশ করলেই মাথার উপর দেখা যায় একটি রেলিং ঘেরা দ্বিতল অংশ। এখানে উঠার জন্য সিড়ি রয়েছে। প্রার্থনার সময় প্রার্থনাকারী বা এখানে সমবেত হয়ে প্রার্থনায় অংশ গ্রহণ করে। মূলতঃ এ দ্বিতল অংশটি প্রয়োজনের সময় প্রার্থনাকারীদের স্থান সংকুলনের জন্য এবং ধর্ম যাজকের কণ্ঠস্বর শ্রবনের সুবিধার্থে নির্মিত করা হয়েছে। এ অংশের পরিমাপ ৪৩ ফুট এবং ১৪ ফুট ৩ ইঞ্চি। পুরান ঢাকায় আর্মেনিয়ানদের আর্মানিটোলা গির্জায় এধরনের দ্বিতল অংশ রয়েছে এবং দ্বিতল অংশে উঠার জন্য এখানে অবশ্য কাঠের সর্পিল সিঁড়ি আছে। (চিত্র নং-১৯) বেদী সম্মুখে বাদিকে মাতা মেরী সন্তান কোলে দন্ডয়মান একটি মুর্তি বা ভাস্কর্য ডান দিকে রয়েছে যীশুর দন্ডয়মান মুর্তি। চিত্র নং - ২০ দ্রঃ

Dhaka University Institutional Repository

বেদীর পিছনের দিকে রয়েছে সেক্রেস্টিকক্ষ। ফাদার এখান থেকে প্রার্থনায় যাবার আগে প্রস্তুতি নিয়ে থাকে। বেদীর অংশ থেকে এখানে আসার জন্য একটি প্রবেশ পথ রয়েছে। এ কক্ষের পিছনে সংযুক্ত আছে একটি গুদাম ঘর। সেক্রেস্টি ঘর থেকে এ গুদাম ঘরে যাবার জন্যও একটি প্রবেশ পথ আছে।

গির্জার অভ্যন্তরীন ছাদ ঢেউ খেলান। স্টীলের বীম (রেইল) এবং কাঠের ক্রসবিম রয়েছে। বেদীর অংশের ছাদ স্টিলের বিম এবং কাঠের ক্রসবিম ব্যবহার করে গীর্জার সমতল ছাদ নির্মাণ করা হয়েছে।

গির্জা নির্মাণ ইতিহাস ঃ

প্রাচীন নথিপত্রের অভাবে হাসনাবাদের ক্যাথলিকদের গোড়াপড়নের ইতিহাস সম্বন্ধে জানা যায়না। তবে ক্যাথলিকদের উদ্ভব সম্বন্ধে কয়েকটি অনুমান চলে আসছে, এর একটি হলো ১৬৩২ খ্রিঃ সম্রাট শাহজাহানের নির্দেশে ঢাকা থেকে আগত সৈন্যরা হুগলীতে বসবাসকারী পর্তুগীজদের কুঠি গির্জা ও অন্যান্য কিছু ইমরাত ধ্বংস করে বেশ কিছু সংখ্যক ক্যাথলিককে হত্যা করে। পর্তুগীজ ও অন্যান্যদের মধ্যে যারা বেঁচে ছিলেন তাদের অনেকে বন্দী হন এবং অনেকে অনত্র চলেযান। এ পলায়নপর লোকদের কিছু সংখ্যক বৃহত্তর ফরিদপুর জেলার লরিকূলে বসতি স্থাপন করেন। পদ্মার ভাঙ্গনে তাদের বসতির ক্ষতি হলে তারা পদ্মানদী পাড়ি দিয়ে ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগনায় নারিশা - ঝনাকি - ধাপারি অঞ্চলে বসতি গড়ে তোলেন। সেখান থেকে ক্রমশ তারা ১০ মাইল অভ্যন্তরে হাসনাবাদ এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। উল্লেখ্য যে, ১৬৮২ খ্রিঃ লরিকূলের ক্যাথলিকদের সংখ্যা ছিল ২০০০ কিন্তু ত্রিশ বছর পর ১৭১২ খ্রিঃ মাইলপুরের রিপোর্টে লরিকূলের অস্তিত্ব সমন্ধে কোন উল্লেখ নেই। এ থেকে অনুমান করা যায় যে, পদ্মার ভাঙ্গনের শিকার হয়ে লরিকূলের ক্যাথলিকরা ঢাকা জেলার দক্ষিনাংশে গিয়ে নতুন বসতি গড়ে তোলেন। তাছাড়া হাসনাবাদ অঞ্চলের বৃদ্ধদের কাছথেকে জানা গেছে যে, পদ্মানদীর মধ্যেও তাদের কারও কারও জমি রয়েছে। আরেকটি বিষয় লক্ষনীয় যে, আঠার গ্রাম অঞ্চলের ক্যাথলিকদের ব্যবহৃত আঞ্চলিক শব্দাবলীর সঙ্গে ফরিদপুর জেলার চর ভদ্রাসন (প্রাক্তন লরিকূলের কাছাকাছি) এলাকার আঞ্চলিক শব্দের সাদৃশ্য রয়েছে।

সৈয়দ মুহাম্মদ তৈফুর তার 'Glimpses of old Dhaka' নামক পুস্তকে উল্লেখ করেন যে, ১৬৩৬ খ্রিঃ নবাব শায়েস্তা খান চট্টগ্রাম দখল করে পর্তুগীজ ও তাদের ভৃত্যদের বন্দী করে ঢাকায় আনয়ন করেন এবং ঢাকা থেকে ১২ মাইল দূরে মুন্সিগঞ্জের কাছে ধলেশ্বরী নদীর তীরবর্তী একটি স্থানে বসতি করতে দেন। তখন এ স্থানের নাম হয় ফিরিঙ্গীবাজার যা পরবর্তী সময়ে নদী ভাঙ্গনে বিলীন হয়ে যায়। 'Dhaka' A Record and Its Changing Fortune নামক পুস্তকের রচয়িতা আহমেদ হাসান দানীর মতে পর্তুগীজরা এখানে বাণিজ্যকেন্দ্র স্থাপন করে এ অঞ্চলের তুলা বিদেশে রফতানী করতেন। এসব পর্তুগীজদের অনেককে মুঘল সরকার চাকুরীতে নিয়োজিত ছিলেন। ব্রাডলি বার্ট এর বইয়ের অনুবাদগ্রন্থ প্রাচ্যের রহস্য নগরীর' ১০৬ নং পৃষ্ঠায় ফিরিঙ্গি বাজার ও পর্তুগীজ খ্রিস্টানদের উল্লেখ আছে। এ সকল লোকদের কেউ কেউ ক্রমশ রাজনগর, বান্দুরা, হাসনাবাদ অঞ্চলে গিয়ে বসতি গোড়ে তোলেন। এজন্যই হয়তো আঠার গ্রামের স্বল্প সংখ্যক লোকের চেহারায় পর্তুগীজ প্রভাব লক্ষণীয়।

উল্লেখ্য যে, প্রাচীন মামলার কাগজপত্রে বর্তমানে হাসনাবাদের নাম প্রথমে 'হুসেইনবাদ' (ফুল বাগান) এবং পরে হোসনাবাদ হিসেবে উল্লেখিত আছে। এতে বোঝা যায় যে গোড়ার দিকে এ এলাকাটি মুসলমান প্রধান ছিল। মুগল সম্রাট আকবর বিভিন্ন ঋতুতে অবসর বিনোদনের জন্য ভারত সম্রাজ্যের পাঁচটি অঞ্চলে নির্বাচন করে তার নাম দেন 'হুসেইনবাদ'। বর্তমান হাসনাবাদ ও ছিল উক্ত পাঁচটির একটি। সম্রাট পরে তার সেনাবাহিনীর পাঁচজন শ্রেষ্ঠ বীর যোদ্ধাকে জায়গীর স্বরূপ এ পাঁচটি এলাকা দান করেন। বাংলাদেশ ভূ-খন্ডের হাসনাবাদের জায়গীরদার (জমিদার) ছিলেন দোস্ত মুহাম্মদ ওসমান। কথিত আছে, এ জায়গীরদারের পক্ষে হাসনাবাদ কাচারীতে নায়েব ছিলেন বিষ্ণু চন্দ্র তেওয়ালী। তিনি ছল চাতুর্য গুনে মুহাম্মদ ওসমানকে বিতাড়িত করে হাসনাবাদ জায়গীরদার হয়ে বসেন।[১]

Dhaka University Institutional Repository

ইতোমধ্যে হাসনাবাদ এলাকায় ক্যাথলিকদের স্বাভাবিক বৃদ্ধির কারনে একটি বাণী প্রচার কেন্দ্রের প্রয়োজন দেখা দেয়। একটি স্থানীয় কিংবদন্তী বা ঐতিহ্য অনুসারে জানা যায় যে, ফাদার রাফায়েল গমেজ নামক একজন পর্তুগীজ আগাষ্টিনিয়ান যাজক হাসনাবাদ অঞ্চলে বাণী প্রচার করতে থাকেন। তার সাফল্য দেখে বিষ্ণু চন্দ্র তেওয়ারী ভীষন অসন্তুষ্ট হন এবং একদিন ফাদারকে একটি পুরানো অন্ধকূপে নিক্ষেপ করেন। এ দিকে তেওয়ারী মহাশয় অসুস্থ হয়ে পড়ে। চারদিনপর ফাদারকে অক্ষত অবস্থায় অন্ধকূপ থেকে উদ্ধার করা হয়। এরপর বিষ্ণু চন্দ্র সুস্থ হয়ে উঠলে তিনি শ্রদ্ধায় ফাদারে কাছে নিজেকে নত করেন এবং একটি স্বর্ণপাত্রে খোদাই করে তাঁর জায়গাটি খ্রিস্ট ধর্মের কাজের উদ্দেশ্যে ফাদার রাফায়েল গমেজকে দানপূর্বক সস্ত্রীক স্বদেশে (লক্ষৌতে) প্রত্যাবর্তন করেন।

ফাদার রাফায়েল গোমেজ ১৭৭৪ খ্রিঃ হাসনাবাদে প্রথম বাণী প্রচার কেন্দ্র স্থাপন করেন এবং বসবাসের জন্য বান্দুরায় একটি ছোট কুঠির নির্মাণ করেন। ১৭৭৭ খ্রিঃ হাসনাবাদের প্রথম গির্জা নির্মিত হয় তখন কেবল বেদীর অংশটি পাকা ছিল, গির্জার চাল ছিল ছোনের এবং দেওয়াল বাশের। পরবর্তীতে এ গির্জাটি ধ্বংস হয়ে গেলে ১৮৮৮ খ্রিঃ বর্তমানে দন্ডায়মান গির্জাটি নির্মিত হয়। ১৭৭৭ -১৮৩৪ খ্রিঃ পর্যন্ত হাসনাবাদ সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায়না।

১৮৩৪ খ্রিঃ ১৮ই এপ্রিল বঙ্গে ভিক্টোরিয়েট এপষ্টালিক স্থাপিত হলে সে বছর থেকে ১৮৬২ পর্যন্ত অন্যান্য পর্তুগীজ গির্জাগুলোর সঙ্গে হাসনাবাদও বিচ্ছেদের মধ্যে ছিল। হাসনাবাদের পর্তুগীজ ফাদার তাঁর অধীনস্থ খ্রিস্ট ভক্তদেরকেও বিচ্ছেদের মধ্যে রাখলেও গোল্লা বক্স নগরের ক্যাথলিকরা হাসনাবাদ থেকে নিজেদেরকে দূরে রেখে কলকাতাস্থ ভিকার এপস্টলিকের প্রতি বিশ্বস্ত থাকেন। তাদের সুবিধার্থে ভিকার এপস্টলিক বিশপ টমাস ও লিফ ১৮৪৫ খ্রিঃ ৩রা ডিসেম্বর বান্দুরায় একটি গির্জার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দের ভূমিকম্পে এ গির্জাটি সম্পূর্নরূপে ধ্বংস হয়। পরবর্তী বছরে গির্জাটি পুনঃ নির্মিত হয়। ১৯০৮ খ্রিঃ গোল্লায় গির্জা নির্মিত হলে বান্দুরায় গির্জাটি খালি পড়ে থাকে এবং তা ১৯১২ খ্রিঃ বান্দুরা হলিক্রস হাইস্কুলে পরিনত হয়। ১৮৯৪ খ্রিঃ তুইতাল গির্জা নির্মিত হলে তুইতাল ও সোনাবাজুর ক্যাথলিকরা হাসনাবাদ গির্জার আওতা থেকে চলে যান।

১৮৬০ খ্রিঃ সর্বশেষ আগাস্টিনিয়ান ফাদার লরেঞ্জো দাস মিলিগ্রাথ হাসনাবাদ ত্যাগ করলে গোয়াস্থ ধর্মপ্রদেশের যাজকরা এ গির্জার পরিচর্চা করতে থাকে।

১৯৩০ খ্রিস্টাব্দের ১৭ই এপ্রিল মাইলাপুরের অধীনস্থ গির্জাগুলো (হাসনাবাদ। তুইতাল মঠবাড়ী, নাগরী, তেজগাঁও ও আমপট্রি) ঢাকা ধর্ম প্রদেশের কাছে হস্তান্তরিত হয়। এ দুটি ধর্ম প্রদেশের এখন ৯,০০০ ক্যাথলিক ছিলেন।

১৯৩০ খ্রিঃ হাসনাবাদ ঢাকার অধীনে চলে গেলে হাসনাবাদের বালকদের পাঠশালাটি বন্ধ করে দেওয়া হয়। ১৯৩২ খ্রিঃ মিশনের রানী সংঘের বিদেশী সিস্টাররা হাসনাবাদ গিয়ে যাজক ভবনে কনভেন্ট চালু করেন এবং মেয়েদের পাঠশালাটির দায়িত্ব নেন। কিন্তু সিস্টারদের শিক্ষাদানে স্থানীয় ক্যাথলিকরা প্রতিবাদ করলেও বিশপ মহাদয় সমাজে মেয়েদের শিক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধি করে এ ব্যাপারে কোন পদক্ষেপ নেননি। উল্লেখ্য যে, ১৯৬৯ খ্রিঃ মেয়েদের পাঠশালাটি (প্রাইমারী স্কুল) জুনিয়র হাইস্কুলে রূপান্তরিত হয় এবং স্থানীয় ক্যাথলিকদের উৎসাহ ও আর্থিক সহযোগিতায় ১৯৮৪ খ্রিঃ এটি সেন্ট ইউফ্রেসিস হাই স্কুলে পরিনত হয়।

হাসনাবাদ ধর্মপল্লীর ক্যাথলিক জন সংখ্যা নিম্নরূপ ঃ ১৮৩৬ খ্রিঃ - ৫,০০০ (হাসনাবাদ, তুইতাল গোল্লা ও বক্সনগর সহ), ১৮৪৪ খ্রিস্টাব্দে প্রায় ৩,০০০ (গোল্লা - বক্সনগর ব্যাতিত), ১৯৬৫ খ্রিঃ ৩৪৯৬ জন, ১৯৭২ খ্রিঃ - ২৭০০, ১৯৮০ খ্রিঃ ২৮৭৯ এবং ১৯৮৫ খ্রিঃ ৩০৪৫ জন, ১৯৯৫ খ্রিঃ ৩০৮৩, ২০০০ খ্রিঃ ৩১১৮ জন।[২]

Dhaka University Institutional Repository

জনসংখ্যা হেরফের হওয়ার প্রধান কারন আঠার গ্রামের অন্যান্য ধর্মপল্লীর ন্যায় হাসনাবাদ ধর্মপল্লীর ক্যাথলিকদের অনেকে চাকুরীর উদ্দেশ্যে বিদেশে পাড়িজমিয়েছেন। উনবিংশ শতকের শেষের দিক পর্যন্ত আঠার গ্রামের ক্যাথলিকরা প্রধানত কৃষিজীবি ছিলেন। কলকাতাস্থ ব্রিটিশরা বাবুর্চি বয় বেয়ারা (কাটারিং) ইত্যাদি কাজের জন্য কর্মী চেয়ে পর্তুগীজ ফাদারদের অনুরোধ জানালে হাসনাবাদ ধর্মপল্লী থেকে কিছু সংখ্যক ক্যাথলিক সে সময় কৃষি কাজ ছেড়ে চাকুরীর উদ্দেশ্যে কলকাতায় যাত্রার সুযোগ পায়। এর পরে অধিক সংখ্যক হারে কলকাতা, দিল্লী বোম্বে প্রভৃতি নগরে গিয়ে কাজ করতে লাগলেন। ১৯৭১ খ্রিঃ বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর কয়েক বছরের মধ্যে মধ্যপ্রাচ্যেরচাকুরীর দরজা অবারিত হয়ে পড়লে এ অঞ্চলের বিপুল সংখ্যক ক্যাথলিক মধ্যপ্রাচ্যে গিয়ে নিজেদের ভাগ্যের পরিবর্তনের সক্ষম হন। বর্তমানে হাসনাবাদ ধর্মপল্লীর সক্ষম পুরুষদের শতকরা ৯৯ জনই চাকুরীজীবি তাদের মধ্যে ৯০ জনই ক্যাটারিং কাজে নিয়োজিত বাকী ৯ জন প্রধানত ঢাকার বিভিন্ন অফিস আদালতে কর্মরত।

এ ধর্মপল্লীতে একটি প্যারিস কাউন্সিল খ্রিস্টান ঋনদান সমিতি সাধু ভিন্সেন্ট দ্যা পল সমিতি মারিয়ার সেনা সংঘ, ক্যারিজম্যাটিক দল, ইত্যাদি সক্রিয়ভাবে চলছে। আর এগুলো শতকরা ৭৫ ভাগ সদস্যই মহিলা। এছাড়া আছে প্রায় অর্ধ ডজন যুবা সমিতি বা বিভিন্ন গ্রামে তরুন - তরুনীদের মধ্যে কাজ করছে।

উল্লেখযোগ্য যে, বাংলাদেশের প্রথম বিশপ ও পরে আর্চবিশপ থিওটিনিয়াস অমল গাঙ্গুলী সি এস সি ছিলেন হাসনাবাদেরই সন্তান। এ ধর্মপল্লীর অন্য একজন বিশিষ্ট সন্তান হচ্ছে খুলনার বিশপ মইকেল ডি রোজারিও সি এস সি।

<u>তথ্য সূত্র</u> ঃ

১। (Manuscripts "A History of Hashnabad and Neighboring Churches" Father Edmund N. Goedert. Csc Dacca : 1958 PP, 3 – 4) হাসনাবাদ ধর্মমন্দির প্রতিষ্ঠার দুইশত বৎসর পুর্তি অনুষ্ঠান স্মরনিকা (১৬৬৬ - ১৯৭৭ খ্রিঃ), হাসনাবাদ ঃ ৭ই অক্টোবর ১৯৭৭ এন্টনী বিমল গাঙ্গঁলী, আমাদের গ্রাম ঃ হাসনাবাদ তার নাম, প্রতিবেশী বড়দিন ও জয়ন্তী সংখ্যা ১৯৮০ এবং অন্তনী বি. রোজারিও হাসনাবাদ গির্জা প্রতিষ্ঠা ও খ্রিস্টান সমাজের ক্রস বিকাশ সাপ্তাহিক জাগ্রত জনতা, (ঢাকা ঃ ১২ই অক্টোবর ১৯৮৭)

২। The Catholic Directory of Bangladesh - op - cit - p - 52), স্মরনিকা খ্রিস্ট জন্ম জয়ন্তী - ২০০০ লক্ষীবাজার ঢাকা - ২০০০

Dhaka University Institutional Repository

সাধু আন্তনীর গির্জা

পাঙ্গোরা (১৭১৪)

টঙ্গী কালীগঞ্জ মহাসড়কের দক্ষিনে অবস্থিত নাগরীর পাশের গ্রাম অর্থাৎ নাগরীর সাধু নিকোলাস তলেন্তিনো গির্জা থেকে ৫ মিনিটের হাটা পথ ধরে এগিয়ে গেলেই পাঙ্গোরা গ্রাম এবং এখানেই সাধু আন্তনীর গির্জা। এ গির্জাটি পাঙ্গোরা গির্জা নামেই বেশী পরিচিত। এ গির্জা আকারে অন্যান্য গির্জার তুলনায় অনেক ছোট। তাই এ.কে, গির্জা না বলে গির্জিকা বলা হয়।

গির্জিকাটি নাগরীর গির্জার সমসাময়িক, অর্থাৎ সপ্তদশ শতাব্দীর শেষের দিকে নির্মিত হয়েছিল। ১৭১৪ খ্রিঃ ফাদার বার্বিয়ে তাঁর রিপোর্টে উল্লেখ করেন, "আমরা ভাওয়ালে এসেছি, যেখানে প্রধান গির্জাটি ছিল তলেন্টিনোর সাধু নিকোলাসের গির্জা।" এর অর্থ প্রধান গির্জা ব্যাতিত অপ্রধান আরেকটি গির্জা ছিল তা নিশ্চয়ই পাঙ্গোরার গির্জাটি হবে।[১]

সাধু আন্তনীর অতি আকর্ষনীয় গির্জাটি আয়তাকার এবং উঁচু ভিতের উপর নির্মিত। ইহার উত্তর দক্ষিনে ২০ ফুট এবং পূর্ব পশ্চিমে ৫০ ফুট। ইহার সম্মুখ ভাগ উত্তর দিকে। সম্মুখের অর্থাৎ প্রধান প্রবেশ পথটি তিনটি গোথিক খিলানের সমন্বয়ে গঠিত, অর্থাৎ প্রবেশ পথের খিলানের উপর আরো দু'টি খিলান নির্মাণ করা হয়েছে।* ২য় এবং ৩য় খিলানের মধ্যবর্তী স্থান জালির কাজ দ্বারা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। প্রথম এবং দ্বিতীয় খিলানটির উপর অংশ ভরাট করা এবং একটি ক্রুশ চিহ্ন এবং ২য় খিলানটির গা ঘেষে ফুল লতাপাতার রঙিন নকশা করা হয়েছে। প্রথম ২য় খিলান চারকোনা স্তম্ভের উপর ভিত্তি করে নির্মিত ৩য় খিলানটি ত্রি-তত্ত্ব (triple) কারেন্থিয় স্তম্ভের সমর্থনের উপর নির্মিত। উপরের খিলানের দু'পাশে বা স্পেনড্রিলে গোলাপ ফুলসহ লতাপাতার নকশা। অনুরূপ নকশা নাগরীর গির্জায় রয়েছে। গির্জার প্রবেশ পথটি নকশা শোভিত সংযুক্ত দুই পিলার (উভয় পার্শ্বে) এর আবরনে (Frame) আবদ্ধ। সংযুক্ত (Pillar) স্তম্ভ গুলো একটি চমৎকার ত্রিকোন নকশা অংকিত অংশ (pediment) ধরে রেখেছে। এ ত্রি-অংশের মধ্যবর্তী ত্রিকোন স্থানে 'crown' বা মুকুট নকশা শোভিত। নানাবর্ণের অলংকরন নকশাও আছে এখানে। ত্রিকোন নকশাকৃত অংশের চূড়ায় আছে ক্রুশ। গির্জা নির্দেশ করার জন্য এঁ (চিত্র-২১) খুব আকর্ষনীয় ও অর্থবহ।

ত্রিকোনাকার নকশাকৃত অংশের ঠিক নীচে একটি আয়তাকার অংশ গির্জার পুনঃ নির্মাণ কাল ১৯০৬ খ্রিঃ উল্লেখ রয়েছে। তারিখের পাশে দেয়ালে নির্মিত তিনটি করে ক্ষুদ্র খোপ (panel) রয়েছে। এ অংশে গোলাপি এবং আকাশী রং ব্যবহার করা হয়েছে। আবার এ অংশের নীচের রয়েছে তিনটি আড়া আড়ি বন্ধনী (Moulding)। এ বন্ধনী গির্জার চারিদিকে ঘিরেই রয়েছে এবং বন্ধনী অংশ থেকে গির্জার স্তম্ভ গুলো একটু উপরে উঠেছে এবং স্তম্ভগুলোর উপরে রয়েছে তীরের মত কৌনিক শীর্ষ। এ ধরনের কৌনিক স্তম্ভের ব্যবহার খ্রিস্টান স্থাপত্যে দেখা যায় এবং এরূপ কৌনিক স্তম্ভকে 'Haddington buttress' বলা হয়।[২]

গির্জাটি আয়তনে ক্ষুদ্র বিধায় প্রার্থনাকারীদের আসন ব্যবস্থাও অল্প পরিসরে করা হয়েছে। দু'ধারে আসন ব্যবস্থার মধ্যবর্তি অংশে প্রশস্ত পথ এবং এ পথের মাঝে এবং প্রবেশ পথ দিয়ে অভ্যন্তরে প্রবেশ করলে একটু সম্মুখেই একটি ব্যাতিক্রম ধর্মী স্তম্ভ রয়েছে।

প্রার্থনা মঞ্চের সম্মুখে খানিকটা খালি জায়গা। প্রার্থনা মঞ্চটি যথারীতি একটি উচু স্থানে এবং এ প্রার্থনাবেদীর সম্মুখে সূক্ষ্ম কারুকাজ করা কাঠের লোহার বেড়া (Raling) দিয়ে ঘেরা এবং প্রবেশের জন্য একটি পথ আছে। প্রার্থনাবেদীর উপরে কাঠের সুন্দর সূক্ষ কারুকাজ করা চকলেট রঙের বার্নিশ করা একটি মঞ্চ নির্মাণ করা হয়েছে। এ মঞ্চটি আনুভূমিকভাবে চারটি অংশে ভাগ করে বর্ণনা করা যায়। শীর্ষভাগের অংশটিতে উল্লম্বভাবে

---

* সর্ব উপরের খিলান খ্রিস্টান স্থাপত্যে ব্যবহৃত cimcerter খিলান সদৃশ অনুরূপ খিলান খ্রিস্টান স্থাপত্যে জানালা অলংকরনে নির্মিত হয়ে থাকে – Encyclopedia of Religion and Ethics – vol – 1 – p – 714

Dhaka University Institutional Repository

আছে তিনটি অংশ। মধ্যবর্তী অংশটির ত্রিকোনাকার শীর্ষভাগ সহ পার্শ্ববর্তী উভয় অংশে কাঠের সূক্ষ কারুকাজ করা হয়েছে। মধ্যবর্তী এ ত্রিকোনাকার অংশের ফ্রেমের মাঝে রয়েছে একটি ভাস্কর্য। এরপর আনুভূমিক ভাগের ২য় অংশের ডান দিকে রয়েছে যীশু খ্রিস্টের ভাস্কর্য বা'দিকে রয়েছে মাতা মেরীর ভাস্কর্য মধ্যবর্তী অংশে আছে একটি মোমদানী রাখার জায়গা এবং সম্মুখে একটু খালি জায়গা। চিত্র - ২২ দ্রঃ

গির্জার সম্মুখে প্রায় ২০ হাত দূরে ক্রুশ চিহ্ন ধারন করা ষষ্ঠকোনাকার (আকাশী, সাদা এবং লাল রঙের সমন্বয়ে) কৌনিক পাথরের ফলকে পর্তুগীজ ভাষায় একটি শিলালিপি লেখা রয়েছে। যার অর্থ অনুধাবন করা সম্ভব হয়নি। নিম্নে শিলালিপিটি তুলে ধরা হল ঃ

AQUIJAZ A CRANDE
BE NE MERTTA
CATHARINA PTRES
GUE
ANTES DE 1815
DOOU AS MISSOES
PORTUQUEZAS DE BENGALA
AS TERREIS DE PANJORA E
MADABPUR
PAZ A JUA ALAM
THEOTONIO
BISPO OE MELIAPOR E. চিত্র নং -২৩

নিশ্চিত করে এ গির্জার নির্মাণ কাল বলা না গেলেও ফাদার বার্বিয়ের (পূর্বে উল্লেখিত) রির্পোট অনুযায়ী গির্জাটি ১৭১৪ খ্রিঃ নির্মিত হয়েছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। তাছাড়া ১৭৮৯ খ্রিঃ আগাষ্টিনিয়ান প্রদেশিক (প্রভিন্সিয়াল) পাঞ্জেরা গির্জা ও সেখানকার আবাসিক যাজকের কথা উল্লেখ করেছেন। এ গির্জার নাম ছিল সাধু আন্তনীর গির্জা। অন্যান্য পন্ডিতরা এ গির্জাটি নাগরীর গির্জার সমসাময়িক কালে নির্মিত হয়েছিল বলে মত প্রকাশ করেছেন।[৩]

নাগরীর গির্জার অধিনে ছিলো নাগরীর পর্তুগীজ মিশন জমিদারী ভূক্ত ক্যাথলিকরা এবং পাঞ্জোরার অধীনে ছিলেন জমিদারীর বাইরে অবস্থানরত তুমুলিয়া ও রাঙ্গাঁমাটির ক্যাথলিকরা। ১৮৩৬ খ্রিঃ পর্যন্ত পাঞ্জেরা গির্জাটি এ দু' অঞ্চলের ধর্ম পল্লী হিসেবে চলে এসেছে। ক্যাথলিকদের একটি দুঃখজনক ঘটনার পর এ ধর্মপল্লী থেকে তুমুলিয়া ও রাঙ্গাঁমাটিয়ার ক্যাথলিকরা বিচ্ছিন্ন হয়ে যান। পাঞ্জেরার গির্জা ও সাধু আর্ন্তনীর মুর্তি বা ভাস্কর্য সম্পর্কে কিছু অলৌকিক কাহিনী জনগণের মনে প্রচলিত আছে। তাছাড়া লোকেদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, সাধু আন্তনীর নামে মানত করে কিছু আশা করলে সাধু আন্তনী তা অবশ্যই পুরণ করে দেন। তাই বিংশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত পরিলক্ষিত হত যে, বহু লোক পাঞ্জোরা গির্জায় মানত করতেন। বর্ষাকালে এমনকি আঠার গ্রাম অঞ্চলের ক্যাথলিকরাও বড় বড় নৌকা ভাড়া করে মানত করার উদ্দেশ্যে পাঞ্জোরা আসতেন। উল্লেখ্য যে ১৮৩৬ খ্রিস্টাব্দের পর পাঞ্জোরার গির্জিকাটি অবহেলিত অবস্থায় জরাজীর্ন ও জঙ্গলে পূর্ন হয়ে উঠে। ১৯০৪ খ্রিঃ মাইলাপুরের বিশপের নির্দেশে ১৯০৬ খ্রিঃ ফাদার পিও পাঞ্জোরার গির্জাটি পুনঃ নির্মাণ করেন।

<u>তথ্য সূত্র</u> ঃ

১। জেরোম,ডি,কস্তা, পূর্বোক্ত পৃঃ - ৪৩০

২। Encyclopeadia of Religion and Ethics, Op, cit, P-714

৩। পূর্বোক্ত, পৃঃ - ৩২

Dhaka University Institutional Repository

সেন্ট থমাস গির্জা

জনসন রোড (১৮১৯)

বাহাদুর শাহ পার্কের উত্তরে জনসন রোডে সেন্ট থমাস গির্জাটি অবস্থিত। ১৮২৪ খ্রিঃ কলকাতার প্রধান যাজক বিশপ হার্বার গির্জাটি উদ্বোধন করেন। কিন্তু গির্জাটি নির্মাণ করা হয়েছে ১৮১৯।

স্থাপত্যিক বর্ণনা ঃ

আয়তাকার এ গির্জার দৈঘ্য ঃ ৭৭ ফুট ৭ ইঞ্চি। প্রস্থ ঃ ৫৬ ফুট সম্মুখে পিছনে ২৫ ফুট ৭ ইঞ্চি । উচ্চতা ২১ ফুট। এ গির্জাটির দু'দিকে (উত্তর ও দক্ষিন দিকের) ঢালু বারান্দা এবং সম্মুখ দিকে অর্থাৎ পশ্চিম দিকে একটি গাড়ি বারান্দা (Porch) রয়েছে। এ গির্জাটিতে ঢাকায় বিদ্যমান অতি পুরাতন গির্জা গুলো থেকে একটু ভিন্নতা নজরে পরে, এ গির্জার সম্মুখ অংশে কোন ত্রিকোনাকার নকশাকৃত অংশ নেই, সাদামাটা সমতল। কিন্তু ঢাকার অধিকাংশ ক্যাথলিক গির্জা গুলোতেই সম্মুখ অংশে ত্রিকোনাকার নকশাকৃত অংশ রয়েছে। ত্রিকোনাকার নকশাকে ক্যাথলিক গির্জা এবং প্রটেষ্টান্ট গির্জার বাহ্যিক চিহ্নিতকরণ বৈশিষ্ট্য হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে। চিত্র নং -২৪

গির্জার সামনের গাড়ি বারান্দা (Porch) চার কোনা স্তম্ভের উপর নির্মিত সমতল ছাদযুক্ত। প্রায় সমান্তরাল ত্রিকোনাকার নকশাকৃত অংশ রয়েছে। গাড়ি বারান্দা ছাদের এ অংশ মূল গির্জা ছাদের অংশ থেকে বেশ খানিকটা নীচুতে। গাড়ি বারান্দার সম্মুখ অংশে জালির নকশাযুক্ত দেওয়াল সৌন্দর্য বধন করে দাড়িয়ে আছে। এ গির্জার আরেকটি বৈশিষ্ট্য হল বাহিঃ ভাগের সম্মুখ অংশে মূল ছাদের উপর বর্গাকার দ্বিতল বিশিষ্ট চূড়া (steeple) রয়েছে। চূড়ার উপর খাট পিলার দিয়ে ঘেরা ছাদ পাঁচিল (Parapet) এর শোভা বর্ধন করেছে। দ্বিতল অংশের সম্মুখে একটি গোলাকার ঘড়ি এবং অন্যান্য দিকে 'Clerestory window' রয়েছে। গির্জার এ ঘড়ি থাকার কারনে গির্জাটিকে 'clock tower' বা 'clock church' (ঘড়িওয়ালা গির্জা) হিসেবে পরিচিত করেছে অনেকের কাছে। বর্গাকার ১ম তলায় চারিদিকে দ্বিতল অংশের অনুরূপ চারটি জানালা আছে। দ্বিতলের নীচের অংশে, ১ম তলার নীচের অংশে দু'টো করে বন্ধনী দেখতে পাওয়া যায়। এ দ্বিতল অংশে যাবার জন্য গির্জার অভ্যন্তরে প্রবেশের জন্য যে মূল প্রবেশ পথটি তার দু'পাশে দুটি কক্ষ আছে এবং একটি কক্ষে একটি কাঠের সিঁড়ি রয়েছে। এ সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে গির্জার ঘন্টা বাজাতে হয়। এ গির্জার গোথিক খিলান, বারান্দা, ছাদ পাঁচিল ঘড়ি বুরুজ ইত্যাদির ব্যবহারে ইংল্যান্ডের প্যারিস গির্জার সাদৃশ্য খুজে পাওয়া যায়।[১]

পুরাতন ঢাকায় যদিও এখন অ্যাংলিকানরা সংখ্যায় কম। তবুও এখানে রবিবারে প্রার্থনা হয়। বাৎসরিক উৎসব, বড়দিন পালন করা হয়। বিভিন্ন সময়ে দরিদ্রের সাহায্যার্থে মিনা বাজার ইত্যাদিও হয়।

গাড়ি বারান্দা থেকে গির্জার ভিতরে প্রবেশ করতেই একটি বর্গাকার খালি জায়গা এবং এ বর্গাকার অংশের সম্মুখেই গির্জার মূল প্রবেশ পথ। এছাড়াও বর্গাকার অংশের দু'পাশে দু'টি ছোট কক্ষ রয়েছে।

মূল প্রবেশ পথ দিয়ে প্রবেশ করলে দেখা যায় যে, আসন ব্যবস্থার বিন্যাসের কারনে একটি প্রশস্ত পথ (Nave) সৃষ্টি হয়েছে । অভ্যন্তরে প্রবেশ করলেই দুটি সুন্দর ডুরিক স্তম্ভ নজরে পড়ে। অনেক গুলো কাঠের বেঞ্চ নিয়ে যে আসন ব্যবস্থা করা হয়েছে তার মধ্যে প্রথম বেঞ্চটিতে বাইবেল সহ বিভিন্ন ধর্ম সংক্রান্ত গ্রন্থ রাখা হয়েছে।

আসন পাতা অংশের সম্মুখে বেশ কিছুটা খালি জায়গা এবং এরপরই পূর্বদিকের শেষ প্রান্তে সিঁড়ি রয়েছে। প্রার্থনা বেদীটি চতুর্কেন্দ্রিক খিলানের মধ্যে অবস্থিত। বেদীর অংশটি আয়তাকার দৈর্ঘ্য ১৫ ফুট ৭ ইঞ্চি ও প্রস্থ ৮ ফুট ৪ ইঞ্চি। মেঝে থেকে উচ্চতা ১৯ ফুট। বেদীর সম্মুখের দু' পাশের দেয়াল কৌনিক হয়ে উত্তর ও দক্ষিণ দিকের

Dhaka University Institutional Repository

দে'য়ালে মিশেছে এবং উভয় দে'য়ালের পরিমাপ ১২.১০। প্রার্থনা বেদীর ডান ও বাঁদিকে সংলগ্ন দুটি ত্রিভুজাকার ঘর রয়েছে। উভয়টিতেই প্রবেশের জন্য প্রবেশ পথ আছে। বাঁদিকেরটি হচ্ছে সেক্রেস্ট্রি ঘর অর্থাৎ বিশপ প্রার্থনায় আসার সময় এ ঘর থেকে প্রস্তুতি নিয়ে আসেন। ডান দিকেরটি দক্ষিন দিকের বারান্দার সাথে সংযুক্ত হয়েছে। এখানে মিশনারী স্কুলের ক্লাশ হয়। প্রার্থনাবেদীর দেওয়ালে রয়েছে খ্রিস্টধর্মের প্রতীক ক্রুশ চিহ্ন। ক্রুশের সম্মুখে অর্চনাবেদী হিসেবে একটি টেবিল রাখা হয়েছে। তা রঙ্গীন কাপড় দিয়ে ঢাকা । এছাড়া প্রার্থনা বেদীর সম্মুখে কৌনিক দেয়াল দু'টিতে চিত্র অংকন করে আকর্ষনীয় করা হয়েছে। চিত্র নং-২৫

বেদীর দেওয়ালে বা অন্য কোন দেওয়ালের অন্য কোথাও ভাস্কর্য বা মুর্তি রাখা হয়নি। আর এ মুর্তি না রাখা প্রটেষ্টান্টদের ধর্ম বিশ্বাসের একটি বৈশিষ্ট্য। এছাড়াও ক্যাথলিক এবং প্রটেষ্টান্ট খ্রিস্টানদের ধর্মবিশ্বাসের পার্থক্যগুলির মধ্যে এ বৈশিষ্ট্যটি অন্যতম।

গির্জার উত্তর দিকে দেওয়ালে একজন মা ও শিশুর একটি চিত্র রয়েছে এবং চিত্রের নীচে পাথরের উপর খোদাই করা আছে ঃ "চিত্রটি মারিয়া জারফিসের, তিনি চালর্স স্মিথের পত্নী। যিনি ৫৫ বৎসর বয়সে ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে মৃত্যু বরণ করেছেন। তাঁর স্মৃতির সম্মান প্রদর্শন স্বরূপ তাঁর ঢাকার বন্ধুরা চিত্রটি তৈরী করেছে। এ চিত্রটির নীচেও একটি শিলালিপি রয়েছে। চিত্র নং-২৬

গির্জার শিলালিপি ছাড়াও দক্ষিন পশ্চিম দেওয়ালে বেশ কিছু পাথরের উপর খোদাই করে কিছু অংশে বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তির মৃত্যুর সন তারিখ উল্লেখ করা হয়েছে । চিত্র নং-২৭

গির্জাটিতে গোথিক রীতির জানালা দেখতে পাওয়া যায়। জানালাগুলোতে কাঠের পাল্লা দেওয়া এবং সবুজ রং করা। দরজা গুলিও অনুরূপ। এ গির্জায় তিন দিকে ৭টি করে ১৪টি জানালা। উভয় দিকেই মাঝের জানালাটি অন্যান্য জানালাগুলি থেকে প্রশস্ত। গির্জার পশ্চিম পার্শ্বের দেওয়ালের দু'দিকে দুটি গোথিক রীতির কুলঙ্গী শোভা পাচ্ছে ।

মূল প্রবেশ পথের ডান দিকে চারকোনাকার ব্যাপটিষ্ট ফ্রন্ট (Baptist front) (কোন খ্রিস্টান শিশু জন্ম গ্রহণ করলে ইহার ভিতর রাখা পানি দিয়ে বিশপ বা যাজক শিশুটিকে দীক্ষিত করেন) রয়েছে। কাঠ দিয়ে মোড়া (Wooden hid) একটি মার্বেলের ঢাকনা রয়েছে এর উপর। Baptist front একটি পাথরের ছোট স্তম্ভের উপর স্থাপন করা । চিত্র নং-২৮

গির্জার অভ্যন্তরের যে ডুরিক স্তম্ভ দুটি গির্জার Baptist front এবং এর বাদিক বরাবর লম্বা অংশটুকু গির্জার মূল বেদী অংশ থেকে পৃথক করে রেখেছে। এ অবস্থা গির্জাটিকে একটি আলাদা বৈশিষ্ট্য দান করেছে। কেননা ঢাকার ক্যাথলিক গির্জা গুলোতে এ বৈশিষ্ট্য নজরে পড়েনা। গির্জাটি অন্যান্য গির্জার ছাদের মতই কাঠের মোটা বিমের উপর চুন,সুরকীর ঢালাই করা সমতল ছাদে। আচ্ছাদিত, সবকিছু মিলিয়েই গির্জার অভ্যন্তরীন অংশ বেশসাদামাটা ধরনের, জাকাঁল নয়। A.H. Dani জনসন রোডের এ্যাংলিকান গির্জাটির বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে "The buildings in typical of the church style found in Indo-Pak sub-continent. It consists of rectangular hall divided into a central nave and side aisles by two rows of brick pillars with the main service platform, on eastern side, slightly raised. Extenally, two verandahs, with sloping roofs, have been added on the north and

Dhaka University Institutional Repository

south and a porch on the west. The steeple in square, carried upto stages higher than the roof, each stage having also a clock. The roof of the main hall is flat, resting on wooden girders. At the four corners can be seen smaller steeples. Above the cornice moulding the parapet is well marked by short pillars at interval. The arches at the door ways and windows are Gothic, but those at the main entrance are four centred and painted. The piers are rectangular ...."[2]

পুরান ঢাকায় অ্যাংলিকানদের সংখ্যা কমে যাওয়ায় মগবাজারে নতুন সেন্ট থমাস গির্জা স্থাপন করা হয়েছে। অ্যাংলিকানদের সম্মেলন এখানে অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া সাভারেও অ্যাংলিকাদের একটি নতুন গির্জা নির্মাণ করা হয়েছে। বর্তমানে এ গির্জার বিশপের নাম বি, ডি মন্ডল। একজন মহিলা পুরোহিত বা ফাদার আছেন যার নাম রেভা ঃ সুশীলা ।

<u>তথ্য সূত্র</u> ঃ

১। . Parween Hasan, Op, Cit – P. 339.
২। Dacca, A Record and Its Changing Fortune – P-231.

Dhaka University Institutional Repository

হলি রেসারেকসন গির্জা

আর্মানিটোলা - ১৭৮১ খ্রিস্টাব্দ

পুরাতন ঢাকায় আর্মানিটোলা এবং মিডফোর্ড হাসপাতালের মধ্যবর্তি স্থানে চার্চ রোডে হলি রিসারেকসন গির্জা (Holy Resurrection Church) অবস্থিত। এ গির্জাটি আর্মানিটোলা গির্জা নামেই অধিক পরিচিত। সম্ভবত সপ্তদশ শতাব্দীতে অনেক বিদেশীদের মত আর্মানিয়ানরাও ভাগ্যান্বেষণে ঢাকায় এসে এ অঞ্চলে বসবাস শুরু করে। এ থেকেই এ অঞ্চলের নাম আর্মানিটোলা। ১৭৮১ খ্রিঃ গির্জাটি একটি 'chapel' (ছোট উপাসনালয়) এর ধ্বংসাবশেষের উপর নির্মাণ করা হয়। জানা যায় যে বর্তমানে গির্জার জায়গাটি আগা মিনাস ক্যাটকিস্ত নামক এক ব্যক্তি দান করেছিলেন।[১] চিত্র নং ২৯ দ্রঃ

স্থাপত্যিক বর্ণনা ঃ বাহ্যিক অংশ ঃ

প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত এ গির্জার মূল এবং একটিই প্রধান ফটক দিয়ে প্রবেশ করলেই সম্মুখেই যে উন্মুক্ত প্রাঙ্গনটি পাওয়া যায় তার পুরো অংশ জুড়ে রয়েছে অসংখ্য সমাধি পাথর। অনেক গুলোতেই সন তারিখের উল্লেখ সহ- রয়েছে স্মৃতিফলক। উন্মুক্ত প্রাঙ্গনে প্রবেশ করেই নজরে পড়ে গির্জার প্রশস্ত বারান্দা। বারান্দাটি ১৪ ফুট প্রশস্ত। মূল গির্জাটি লম্বায় সাড়ে সাতাশ ফুট। গির্জাটি মূল তিনটি অংশে বিভক্ত। গির্জার উভয় পাশে অর্থাৎ উত্তর দক্ষিণে রয়েছে বারান্দা। সম্মুখে অর্থাৎ পশ্চিম দিকে রয়েছে একটি ছোট গাড়ি বারান্দা (Porch)। গির্জার উত্তর দিকে ৯টি এবং দক্ষিন দিকে ছয়টি এবং গাড়ী বারান্দাটি তিনটি অর্ধ বৃত্তাকার খিলান সহযোগে গঠিত। প্রতিটি খিলান এক সারি বন্ধনী (Moulding) নকশা সহযোগে সংযুক্ত করা হয়েছে। ছাদের উপর রয়েছে ছাদ পাঁচিল (Parapet)।এ গির্জায় ছয়টি দরজা আছে।

পশ্চিম দিকে ছোট বারান্দাটিতে একটি ঘন্টা ঘর রয়েছে যার মধ্যে একসময় পাঁচটি ঘন্টা রক্ষিত ছিল। ১৮৩৭ সালে গির্জার চূড়া এবং 'clock tower' নির্মিত হয়েছিল। কিন্তু ১৮৯৭ সালে ভয়াবহ ভূমিকম্পে তা ধ্বসে পড়ে।[২]

পূর্বের গম্বুজাকৃতির ছাদওয়ালা বাহুখাঁজ বিশিষ্ট নিভৃত স্থান (apse) অর্ধ গোলাকার। এর বহিঃর্ভাগে শীর্ষে রয়েছে লতাপাতার নকশা মন্ডিত মুকুটের মত ছাদ পাঁচিল (Parapet)। এদিক থেকে গির্জাটিকে দেখলে একটি জাহাজের মত মনে হয়।

সম্মুখের ছোট গাড়ি বারান্দা বা অলিন্দের (Porch) উপর অনুরূপ আরেকটি গাড়ি বারান্দা রয়েছে। এ গাড়ি বারান্দার উচ্চতা গির্জার ২য় তলাটির উচ্চতাকে ছাড়িয়ে গিয়েছে। এ গাড়ি বারান্দার উপর ছাদ পাঁচিল আছে।

উপরের গাড়ী বারান্দার উপরে রয়েছে গির্জার আকর্ষনীয় অংশ গির্জার চূঁড়া (steeple)। এর নিচের অংশ অষ্টকোনাকার এবং উপরে কৌনিক শিরাল গম্বুজ। গম্বুজের উপরে মসজিদের ফিনিয়েলের মত শোভা পাচ্ছে ক্রুশ চিহ্ন। অষ্টকোনাকার অংশে ৮টি অর্ধবৃত্তাকার খিলানাকৃতির জানালা। এগুলোর মধ্যে ৪টি বন্ধ। ৮টির উপরেই রয়েছে ৮টি ক্রুশ চিহ্ন।

গির্জার ২য় তালাটিতে ১০টি অর্ধবৃত্তাকার খিলানকৃতির জানালা আছে। যদিও এগুলো দরজার মত নিচ থেকে অর্থাৎ মেঝের সমান্তরাল থেকে শুরু হয়েছে তবে এগুলোর প্রশস্ততা দরজার মত নয়। জানালাকৃতির এ পথগুলোর অভ্যন্তরে আলো প্রবেশে সাহায্য করে। ২য় তলার উত্তর ও দক্ষিন দিকে উন্মুক্ত খোলা অংশ। ছাদ অংশে আছে ছাদ-পাঁচিল (parpet)।

Dhaka University Institutional Repository

অভ্যন্তরীণ অংশ ঃ

পশ্চিম দিকের মূল প্রবেশ পথ দিয়ে প্রবেশ করলেই প্রশস্ত পথ বা গির্জার মূল অংশ (Nave) বেদী দেখা যায়। এ গির্জার মূল অংশ (Nave) দু'দিকে প্রার্থনাকারীদের আসন ব্যবস্থার বিন্যাসের ফলেই সৃষ্টি হয়েছে। গির্জার মূল অংশ বা নেভটি তেমন প্রশস্ত নয়। নেভের শেষে মেঝে থেকে প্রায় অর্ধ হাত উচু একটি প্ল্যাটফর্ম আছে এবং এর উপর প্রার্থনা বেদীটি প্রায় ২ ফুটের মত উচু বেদীর উপরে স্থাপিত। এখানে উঠার জন্য তিন ধাপ বিশিষ্ট সিড়ি রয়েছে। প্রার্থনা বেদীর একটু উচু এবং মেঝে ও প্ল্যাটফর্ম টি সাদা মার্বেল পাথরের তৈরী। প্রার্থনা বেদীর উপর সাদা পাথরের অংশে ক্রুশ চিহ্ন সুন্দর ভাবে ভেসে উঠেছে। অর্ধবৃত্তাকার প্রার্থনা বেদীটি অধবৃত্তাকার বহুখাঁজ বিশিষ্ট খিলান সহযোগে গঠিত এবং খিলানটিলাল সবুজ জেব্রা কাটা জোড়া স্তম্ভ সহযোগে নির্মিত। খিলানের বাহুখাজের উপর এবং ঢেউ খেলান বর্ডারের মাঝে রঙিন লতাপাতার আকর্ষনীয় নকশা এ অংশে শোভা বর্ধন করেছে। চিত্র নং-৩০ দ্রঃ

প্রার্থনা বেদীর উপর একটি মঞ্চ নির্মাণ করা হয়েছে। মঞ্চের উপর সাদা কাপড় রাখা। এর নীচে রঙ্গীন কাপড় ঝুলিয়ে দেয়া এবং রঙ্গীন কাপড়ের মাঝের অংশে যীশুর ছবি শোভিত। মঞ্চের উপর দু'পাশে উপর থেকে নীচে ক্রমান্বয়ে তিনটি করে ছয়টি ও ২টি মোমসহ মোমদানী রয়েছে। মঞ্চের পিছনেই তেল চিত্র উপরে নীচে শোভা পাচ্ছে। উপরের চিত্রটি যীশুর ক্রুশবিদ্ধ ছবি এবং নীচের চিত্রটি যীশুর ভোজ (last supper) দৃশ্যের ছবি। ছবি দুটি ১৮৪৯ সালে চালর্স পোট (Pote) নামে এক অ্যাংলো চিত্রকরের আঁকা।[৩] চিত্র-৩১

মঞ্চের দু'পাশে প্রায় অর্ধবৃত্তকার আকৃতি যুক্ত দুটি বন্ধ প্রবেশ পথ রয়েছে। ঢাকার ক্যাথলিক গির্জা গুলোতে এ বৈশিষ্ট্যটি প্রায় সর্বত্র দেখতে পাওয়া যায়। সম্ভবত বেদীর উপর আলো প্রবেশের জন্য এগুলো রাখা হয়। শুধু প্রয়োজনের সময় খোলার ব্যবস্থা থাকে । বেদীর এ দরজা সদৃশ্য অংশ দুটোর বক্র অংশ এবং লম্বা লম্বি অংশের বর্ডার সহ বেদীর অর্ধবৃত্তাকার অংশের পুরোটিতে লাল, সবুজ, সাদা রঙের পাক দেওয়া দড়ির মত অলংকারিক বন্ধনী (Moulding) নকশা রয়েছে। তাছাড়া এরূপ রঙীন দড়ির মত বর্ডার দিয়ে প্রার্থনা বেদীর দেওয়ালে বর্গাকার ও আয়তাকার নকশা আঁকা হয়েছে । এ নকশা প্রার্থনা বেদীটিকে অনন্য বৈশিষ্ট্য দান করেছে। চিত্র - ৩২।

যেহেতু এ গির্জাটি একটি প্রটেস্টান্ট গির্জা এ গির্জার বৈশিষ্ট্য হলো যে, এখানে শুধু দুটি তৈল চিত্র আছে। এখানে কোন ভাস্কার্য নেই। সব আর্মেনিয়ান গির্জার মধ্যে সাদৃশ্য বিদ্যমান। তবে প্রত্যেকটি গির্জা সোভিয়েত ইউনিয়নের আর্মেনিয়ান ভ্যাটিকানে অবস্থিত প্রধান গির্জা 'Echmiadgin' এর অনুরূপে তৈরী।[৪]

এ গির্জার প্রর্থনা স্থলের বিপরীত দিকে একটি গ্যালারী রয়েছে। সর্পিল আকৃতি বিশিষ্ট কাঠের সিঁড়ি বেয়ে এ গ্যালারীতে উঠতে হয় । সিড়ির প্রতিটি ধাপে মোম বাতি ছাড়াও চকচকে ধাতুর কিছু ক্রুশ দেখা যায়।

গির্জাটি দোতলা বিশিষ্ট মনে হলেও ভিতরের অংশে এক তলার উপর কোন ছাদ নির্মাণ করা হয়নি। অর্থাৎ গির্জাটি অভ্যন্তরীন অংশ দো'তলা পর্যন্ত উচ্চতা লাভ করেছে। বড় বড় কাঠের বিমের উপর বেদীর উপরের অংশের ছাদ নির্মাণ করা হয়েছে। বেদীর অংশটুকু ছাড়া সম্পূর্ন ছাদই সমতল। আর্মেনীয় গির্জার বিখ্যাত ঘন্টাটি সম্ভবত ১৮৮০ সালে স্তব্দ হয়ে গিয়েছিল। আক্ষেপ করে লিখেছিল একটি সংবাদপত্র —

"আরমানিটোলা বলে প্রসিদ্ধ, আরমানি ভজনালয়ে সাধারনের সময় জ্ঞাপক একটি অতি বৃহৎ ঘন্টা বহুকাল হতে স্থাপিত ছিল। নিতান্ত আক্ষেপের বিষয় এ যে, সম্প্রতি উহার কার্য রহিত হইয়াছে। শুনা যায় ইদানিন্তন আরমানিয়ানের দুরবস্থা নিবন্ধন তারা এতদসংক্রান্ত ব্যয় সংক্ষেপ করাতেই সাধারনের সুবিধাজনক এ কার্য স্থগিত হয়েছে। এ গির্জার ঘন্টার শব্দ নগরের প্রায় সমস্ত স্থান সমূহ হতে শ্রুতিগোচর হত। এমনকি রাত্রী অর্ধেক হলে

Dhaka University Institutional Repository

চারিক্রোশ দূরবর্ত্তী স্থান হতেও ইহার শব্দ শোনা যেত। আরমানিটোলার গির্জার ঘটিকা শব্দ শুনিয়া অধিকাংশ ঢাকাবাসীই আপন আপন ঘটিকার সময় ঠিক করে রাখতেন। ঢাকায় অনেক স্থলে ঘটিকার সময়জ্ঞাপক কাসির বাদ্য হয় সত্য, কিন্তু তা নিকটবর্ত্তী লোক ভিন্ন অপরের শ্রুতি প্রবিষ্ঠ হয়না। অতএব আরমানিগনের কীর্ত্তি রক্ষা ও ঢাকাস্থ সর্ব্বসাধারনের সুবিধার দিকে দৃষ্টি না করে অধুনাতন আরমানিগন সামান্য ব্যয় সংক্ষেপানুরোধে যে গির্জার ঘন্টাবাদদক ভৃত্যগনকে উঠাইয়া দিতেছেন উহা কতদূর সঙ্গত হইতেছে, আমরা নিবন্ধ সহকারে অনুরোধ করি তাহারাই একবার স্থিরচিত্তে তাহা বিবেচনা করে দেখুন --------। ''[৫]

গির্জার চারিদিকে ছড়িয়ে আছে অসংখ্য সমাধি। মনে হয় যেন একটি পদক্ষেপ ফেলার মত কোন জায়গা নেই সমাধি প্রান্তর ছাড়া। এছাড়া গির্জার উত্তর দিকে তো রয়েছেই সমাধিস্থল। গির্জাটি নির্মাণের পূর্বে সম্ভবত এ হল প্রাঙ্গনটি সমাধিস্থল হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে সবচেয়ে প্রাচীন সমাধিটি : হল গুলটালিফের সমাধি। যিনি প্যারাসাদাম অফ ইরিকানের কন্যা এবং মাইকেসার কেইসের স্ত্রী। সমাধি প্রান্তর গুলোর অলংকরনে পার্শিয়ানদের নিদর্শন বিদ্যমান। মৃত্যুর সহজ বর্ণনা সমাধি ফলকে লেখা আছে, ইংরেজীতে। তার বাংলা রূপ এরূপ হতে পারে ''মাথার খুলি এবং তার নীচে ক্রুশ বিদ্ধ দুটি হাত অত্যন্ত বিরল দৃশ্য।'' সুন্দর বড় বর্ডার, কারুকাজসহ পাতার ব্যবহার এবং চন্দ্রাতপ (pavilion) ব্যবহার পার্শিয়ান কারুকাজের নিদর্শন। কিন্তু কতিপয় পাথরে রয়েছে ফেরেস্তাদের ছবি যারা চিরন্তন জীবনের মুকুট মাথায় বহন করে শিঙ্গা ফুকছে। এটা স্বর্গের দৃশ্য মনে হয়। এছাড়া রয়েছে দু'মাথা বিশিষ্ট ঈগল যাকে রাজকীয় প্রতীক বলা হয়। এছবির তাৎপর্য জানা যায়নি। ঢাকা শহরের সবচেয়ে দীর্ঘজীবি আর্মেনিয়ান ছিলেন এভিক্টটার গ্রেগরী (Avict ter Gregory) যিনি ১৮৬২ খ্রিঃ ১০৮ বৎসর বয়সে মৃত্যু বরণ করেন।পারস্যের অধিবাসী ম্যাকস ম্যাকারঠিক যিনি ২৪ বৎসর বয়সে মৃত্যু বরন করেন। তার ভাবীবধু তৈরী করে দিয়েছিল সমাধিও ইংরেজী এপিটাফ। তাঁর সমাধিতে নিম্নলিখিত এপিটাফের বাংলায় অনুবাদ করলে এরূপ দাঁড়ায়ঃ

তাকে খুব ভালবাসতাম বলেই তার অনুপস্থিতি এত অনুভব করি,
আমার স্মৃতিতে সে আছে আমার কাছে,
অজস্র নীরব অশ্রুর মাঝে তাকে এখনও ভালবাসি সারাক্ষন স্মরন করি তাকে।
২য় অংশে প্রতিউত্তরে বলা হয়েছে ঃ
প্রিয়তম, আমার জন্য করোনা অশ্রুপাত
আমি নই মৃত, চির নিদ্রীত আছি হেথা
আমিতো তোমার ছিলাম না, ছিলাম কেবলই খ্রিস্টের
তিনি আমাকে বেশী ভাল বেসেছেন এবং তার কাছে নিয়ে এসেছেন তার ঘরে।[৬]

১৮৩১ সালে ঢাকা পরিদর্শনে এসে আর্মেনিয়ান গির্জার প্রধান যাজক রেডপল মৃত্যুবরন করেন এবং তাঁকে এখানেই সমাহিত করা হয়। এ গির্জার উত্তর-পশ্চিম কোনায় অত্যন্ত সুন্দর চমৎকার শ্বেতপাথরের একটি এপিটাফ রয়েছে। এটি সম্পূর্ন পাথরের। প্রায় ছয়ফুট উচু পাথরের বেদীর উপর মোট ২০ ফুট লম্বা একটি মূর্তি শোভা পাচ্ছে। বাংলাদেশের আর কোথাও এমন চমকপ্রদ মর্মর স্থাপত্যকর্ম আছে বলে জানা যায় না। মূর্তিটির হাত উপরের দিকে তোলা। (যদিও সম্পূর্ন হাতটি নেই, পূর্বে ছিল কিনা জানা যায়নি) বাঁ'হাত নীচের দিকে ঝুলান, কিছু একটা ধরে আছে। সম্পূর্ন সাদা এপিটাফটিতে লেখা আছে ক্যাটচিক এ্যাভিয়েটিক থমাস, মৃত্যু ১৮৭৭ সালের ২৪শে সেপ্টেম্বর ৫৬ বৎসর বয়সে। চিত্র নং- ৩৩

এছাড়াও রয়েছে আরও অসংখ্য সমাধি ফলক/সমস্ত পাথর গুলো কলিকাতা নগরীতে লিপিবদ্ধ করে আনা হয়েছিল। মার্বেল এবং 'vertical monument' এবং উলম্ব স্থাপত্য ইউরোপ থেকে আমদানী করা হয়েছিল।

Dhaka University Institutional Repository

গির্জার চারিদিকে সমাধি ফলক গুলিতে মৃত ব্যক্তির নাম ফলক লেখা থাকলেও তা আর্মেনীয়ান ভাষায় বলে পাঠোদ্ধার করা যায়না।

আর্মেনিয়ান গির্জার ইতিহাস ঃ

ঢাকা শহরে এখনও আর্মেনীদের মনে করিয়ে দেয় আর্মানিটোলা এবং জীর্ণ, ম্লান আর্মেনী গির্জা। এ শহরে এখন আর তেমন আর্মেনী সম্প্রদায়ের কেউ নেই।[৭]

ইউরোপীয় ব্যবসায়ীদের ন্যায় আর্মেনীয়ানরা নিজেদের ভাগ্য গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে ভারতে আগমন করেন। (পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আর্মেনীয়দের সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে)। সপ্তদশ শতকে তারা ঢাকায় বসতি স্থাপন করেন। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে তারাই ঢাকা এবং নারায়নগঞ্জে প্রথম পাটের ব্যবসা চালু করেন। পাটের আগে কাপড়, লবণ ও পানের ব্যাপক ব্যবসায়ে তারা নিয়োজিত ছিলেন। তারা কেউ কেউ আবার জমিদারও হয়েছিলেন।[৮]

আর্মেনীয়নরা কেবল ব্যবসায়ীক ক্ষেত্রেই নয় আরো কিছু কিছু ঐতিহাসিক অবদান রেখে গেছেন। যেমন ঃ দোলাই খালের একটি অংশ আর্মেনীটোলার মধ্যে পরিণত হয়েছিল বদ্ধ একটি ঝিলে। শহরের সমস্ত আবর্জনা, মলমূত্র ফেলা হতো এখানে। ১৮২৫ সালে পাঁচ হাজার টাকা ব্যয়ে ৭২০ ফুট দীর্ঘ, ১৮ ফুট চওড়া ও ১৬ ফুট গভীর।[৯] বুড়ীগঙ্গার সাথে সংযোগ খাল কাটে। এতে ঝিলের সাহেব পানি সব সময় পানি চলাচল করে ঝিলটি আবর্জনামুক্ত হয়। চলাচলের জন্য তার উপর নির্মাণ করা হয়েছিল পুল।

এছাড়া জমিদার আর্মেনিয়নরা ঢাকায় তৈরী করেছিলেন নিজেদের থাকার জন্য প্রাসাদ তুল্য সববাড়ী। ফরাশগঞ্জের বর্তমান রূপলাল হাউস ছিল আরাতুনের। বর্তমান আনবিক শক্তি কমিশন যেখানে ছিল আরাতুনের রূপলাল হাউস। বর্তমানে আনবিক শক্তি কমিশন যেখানে সেখানে ছিল তাঁর বাগানবাড়ী। বর্তমানে 'বাকা'র বাড়ীটি ছিল নিকি পোগজের। পরে আর্মেনীটোলায় নির্মিত হয়েছিল নিকি সাহেবের কুঠি। এরকম আরও কিছু কিছু ঐতিহাসিক ইমারত যা আজও কালের সাক্ষী হয়ে দাড়িয়ে আছে।

আর্মেনীয়ানদের আরও একটি ঐতিহাসিক অবদান হচ্ছে 'টিক্কা গাড়ী'। ১৮৬৬ খ্রিঃ বিখ্যাত আর্মেনিয়ান ব্যবসায়ী জিএম সিরকোর ঢাকায় চালু করেছিল ঘোড়ার গাড়ী। যা পরিচিত হল তখন 'টিক্কা গাড়ী'।[১০] কালক্রমে এ গাড়ীই ঢাকার প্রধান যানবাহন হয়ে দাড়িয়েছিল।

উনিশ শতকের শেষের দিকে আর্মেনীয়ানদের সংখ্যা একেবারেই কমে গিয়েছিল। অনেকের জমিদারি গিয়েছিল হাতছাড়া হয়ে। অনেকে জমিদারি বিক্রি করে চলে গিয়েছিল।

এবার আর্মেনীয়ানদের ধর্মীয় ব্যাপারে আলোচনায় আসা যাক ঃ

আর্মেনীয়ানরা ' অর্থ ডক্স ' খ্রিস্টান। এরা প্রটেস্টানদেরই একটি শাখা। প্রটেস্টান্টদের সাথে কিছু কিছু ব্যাপারে এদের মত পার্থক্য রয়েছে।

এসকল ' অর্থ ডক্স ' খ্রিস্টানদের নিজস্ব কোন সমাধিস্থল না থাকায় তেজগাঁয়ের ক্যাথলিক গির্জাভ্যন্তরে ১৭১৪ থেকে ১৭৯৫ খ্রিঃ পর্যন্ত আর্মেনিয়ানদের মৃতদেহ সমাধিস্থ করেন। এসব সমাধি এখনো দৃষ্টিগোচর হয়। পরবর্তীকালে তাদের নিজস্ব সমাধিস্থল গড়ে উঠে। আর্মানিটোলা ময়দান ও মিটফোর্ড রোডের সাথে সংযোগ রক্ষাকারী আর্মেনীয়ান ষ্ট্রিটের ডান দিকে সমাধিক্ষেত্রেই একটি প্রার্থনাগৃহ স্থাপিত হয়। ১৭৮১ খ্রিঃ বর্তমানের পবিত্র পুনরুত্থান গির্জাটি (Holy Resurrection Church)। উক্ত প্রার্থনাগৃহের স্থানেই নির্মিত হয়। আগা ক্যাটচিক

মিনাস গির্জা প্রাঙ্গনের বিস্তৃত ভূমিটি দান করেছিলেন। ১৮৩৭ খ্রিঃ গির্জার পশ্চিমে ঘড়ি শোভিত একটি উচ্চ চূড়া ছিল। কিন্তু ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দের ভূমিকম্পে তা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

১৮৩১-১৮৫৭ খ্রিঃ পর্যন্ত মোট ৩৯জন যাজক ঢাকাস্থ আর্মেনিয়ানদের ধর্মীয় ব্যাপারে তত্ত্বাবধান করেছেন। আর্মেনিয়ানদের সংখ্যা মারাত্মকভাবে হ্রাস পাওয়ায় এরপর থেকে গির্জাটিতে আর নিয়মিত ধর্মোপসনা চলছেনা।

ঢাকায় বর্তমানে মাত্র চার-পাঁচজন আর্মেনিয়ান আছেন বলে জানা যায়। অযত্ন ও অবহেলার জন্য গির্জাটি নষ্ট হওয়ার পথে। এটিকে পুরাকীর্তি হিসেবে বাচিয়ে রাখা একান্ত প্রয়োজন।[১১]

তথ্য সূত্র ঃ

১. . Perween Hasan, Old Churches and Cenetries, Dhaka. Past, Present and Future, P-357

২. . Perween Hasan, Op cit, P-357

৩. . Perween Hasan – Op. cit – p-357

৪. Ibid, P – 358 – 59

৫. মুনতাসির মামুন, পৃঃ-

৬. Ibid, P – 358 – 59

৭। মুনতাসির মামুন - পূর্বোক্ত পৃঃ ১৮

৮। জেরোম,ডি, কস্তা - ঢাকার ঐতঃ গির্জা - পূর্বোক্ত পৃঃ- ৪৭

৯। মুনতাসীর মামুন - পূর্বোক্ত পৃঃ-১৪

১০। মুনতাসীর মামুন - পূর্বোক্ত পৃঃ- ১৭

১১। ঢাকার ঐতিহাসিক গির্জা, পূর্বোক্ত পৃঃ ৪৭

Dhaka University Institutional Repository

"পবিত্র ক্রুশ গির্জা"

লক্ষ্মী বাজার (১৮৩৬)

পুরাতন টাকার লক্ষী বাজার এলাকায় স্বগৌরবে সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলের গাঘেসে দাড়িয়ে আছে ১৮৩৬ খ্রিঃ নির্মিত পবিত্র ক্রুশ গির্জাটি। গির্জাটির প্রাথমিক নাম পবিত্র ক্রুশ ক্যাথেড্রাল থাকলেও বিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে এর নামকরণ করা হয় পবিত্র ক্রুশ গির্জা। (চিত্র- ৩৪)

এ গির্জার সম্মুখ অংশে রয়েছে গোথিক জানালা বিশিষ্ট বারান্দা (Porch)। এর উপর রয়েছে ত্রিতল চূড়া। (Spire) সমতল ছাদ বিশিষ্ট ত্রি-তল ছাদের সম্মুখ অংশে রয়েছে ছোট ত্রিকোনাকার নকশাকৃত অংশ (Pediment) এবং এ অংশের উপরে রয়েছে খ্রিস্টান ধর্মের প্রতীক এবং পবিত্রতার চিহ্ন ক্রুশ। চার কোনায় চারটি ছোট কিউপলা আছে। ৩য় তলার সম্মুখ অংশে কৌনিক খিলানাকৃতির ভিতর একটি ঘড়ি শোভা পাচ্ছে। একসময় হয়তো এ ঘড়ি কাছের কিংবা দূরের পথচারীদের কিংবা গির্জার সকলের জন্য সময় জ্ঞাপন করে যার যার কর্মসম্পাদনে তাগিদ দিত, কিন্তু বর্তমানে ঘড়ির নিজ কর্মসম্পাদনই স্তব্ধ হয়ে গেছে। কেবল শোভা বর্ধন করছে। মূলত গির্জার এ ত্রি-তল অংশটিকে গির্জার চূড়া বলেই অভিহিত করা যায়। জনসন রোডের সেন্ট থমাস গির্জাতে আমরা এরূপ বর্গাকার চূড়া দেখতে পাই। গির্জার ভিতর পশ্চিম দিকে দেওয়ালে অর্থাৎ গির্জার প্রধান প্রবেশ পথ দিয়ে প্রবেশ করলেই হাতের ডানদিকে ক্রমশ উপরে উঠে গেছে কাঠের ছোট সিড়ির ধাপ, আর এ সিড়ি বেয়ে প্রবেশ করা যায় গির্জার সম্মুখের যে ত্রি-তল অংশ রয়েছে তার দ্বি-তল অংশে এবং এ অংশে এসে গির্জার ঘন্টা বাজান হয়। আর ত্রি-তল অংশ একতলার উম্মুক্ত গাড়ী বা রান্দা হিসেবে দন্ডায়মান। এ গাড়ী বারান্দার বাঁদিকেই রয়েছে গির্জার পাথরের নির্মিত Grotto বা গুহা।

বা'দিকে গির্জার গা ঘেষে দাড়িয়ে আছে তিন তলা ভবন। সেটি সেন্ট গ্রেগরীজ হাইস্কুল গির্জার ফাদার সেখরনে বসবাস করেন।

এছাড়া এ ইমারতের বা'দিকে একটি ইমারত রয়েছে সেটি স্কুলেরই আরেকটি অংশ এবং ডান দিকে রয়েছে গির্জার সিস্টারদের আবাসিক ব্যবস্থা। এ গির্জাটি একটি ব্যতিক্রমী গির্জা। এখানে Nave বা মধ্যবর্তী অংশ নেই। সে স্থানে প্রার্থনাকারীদের আসন ব্যবস্থা রয়েছে। অর্থাৎ এ গির্জার অভ্যন্তরে তিনসারি আসন ব্যবস্থা আছে। এর ফলে দুটি সরুপথ বা আইলের (asile) সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু সরু পথ সৃষ্টি করার জন্য কোন স্তম্ভ ব্যবহার করা হয়নি।

এ গির্জার প্রার্থনা মঞ্চটি (চিত্র - ৩৫ দ্রঃ) ভূমি থেকে প্রায় দু'ফুট পর্যন্ত উত্তোলিত এবং মঞ্চে উঠার জন্য সিড়ি রয়েছে। মঞ্চে উঠার পর প্রায় এক' দেড় হাত দূরে মঞ্চের উপর মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত লম্বালম্বি একটি ত্রিকোনাকার দেয়াল নির্মাণ করা হয়েছে। দেয়ালের মধ্যবর্তী অংশ ত্রিখিলানরূপী এবং ত্রিখিলানের উভয় পার্শ্বে ত্রিখিলানের অর্ধাংশ রূপী নকশা দিয়ে সজ্জিত করে প্রার্থনা মঞ্চ আকর্ষনীয় করা হয়েছে। এ খিলান রূপী অংশের উভয় পার্শ্বে প্রার্থনা মঞ্চে ত্রিকোনাকার দেয়ালে অর্ধবৃত্তাকার শীর্ষ সহ দুটি কুলঙ্গী রয়েছে। কুলঙ্গীর ভেতর শোভাপাচ্ছে দুটি ভাস্কর্য। এ দেয়ালের অভ্যন্তরিন অংশটিই মূল প্রার্থনা ক্ষেত্র। এ অংশের দেয়ালে অর্থাৎ গির্জার লম্বা অংশের শেষ অর্থাৎ উত্তর দিকের দেয়ালে যীশুর ক্রুসবিদ্ধ প্রতীক ভাস্কর্য রয়েছে এবং এ ভাস্কর্যের উভয় পার্শ্বে ছোট কাঠের তাকের উপর দু'টি ভাস্কর্য রয়েছে। এ ভাস্কর্যের সম্মুখে মেঝের উপর একটি বড় টেবিল রেখে কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে এবং তার উপর ফুল ও ফুলদানী দিয়ে সজ্জিত করা আছে। গ্রীক গির্জার প্রার্থনা ক্ষেত্রের (apse) ডান এবং বা দিকে ত্রিকোনাকার বন্ধনী (Moulding) নকশা দিয়ে সজ্জিত করা দু'টি প্রবেশ পথ আছে। বাঁ'দিকের প্রবেশ পথ দিয়ে প্রবেশ করলেই একটি নিভৃত কক্ষ পাওয়া যায় এবং ডান দিকের প্রবেশ পথ দিয়ে গির্জার বাইরে চলে আসা যায়। এ গির্জার অভ্যন্তরে একটি ব্যাতিক্রমধর্মী বা পাপ স্বীকার কক্ষ আছে। কেউ পাপ করলে এ কক্ষে ফাদারের কাছে পাপ স্বীকার করলে তার পাপ মোচন হয়। পাপ স্বীকারের সময় পাপী এবং ফাদারের সামনে একটি সাদা কাপড়ের পর্দা রাখা হয়।

গির্জার ছাদ ভিতরের সমতল মনে হলেও উপরের দিকে কৌনিক বা টিন সেড ঘরের আকৃতিতে নির্মিত।

Dhaka University Institutional Repository

পবিত্র ক্রুশ গির্জা নির্মাণ ইতিহাস ঃ

পঞ্চদশ শতকের প্রথমার্ধে এক বিশেষ চুক্তির মাধ্যমে ক্যাথলিক মন্ডলীর ধর্ম গুরু পোপ তৃতীয় পল তৎকালীন পর্তুগাল রাজকে ভারতে ধর্ম প্রচারের যাবতীয় দায়িত্ব অর্পন করেন। এ ব্যবস্থাকে 'পাদ্রোয়াদো ব্যবস্থা' বলা হয়। এ ব্যবস্থার অধীনে পর্তুগাল রাজা ধর্মপ্রচারোদ্দেশ্যে মিশন দেশসমূহে মিশনারী পাঠাতেন এবং গির্জাদি নির্মাণের দায়িত্ব পালন করতেন।

কিন্তু ক্রমান্বয়ে পর্তুগালের রাজা ধর্মীয় ব্যাপারে প্রাচ্যের মিশনদেশগুলোর উপযুক্ত যত্নাদি নিতে অক্ষম হয়ে পড়ায় তৎকালীন পোপ ১৮৩৪ খ্রিঃ 'পাদ্রোয়াদো ব্যবস্থা' রহিত করে কিছু কিছু ধর্মীয় এলাকা সরাসরি নিজের অধীনে নিয়ে নেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি কলকাতাকে সদরদপ্তর করে 'ভিকটরিয়েট অব বেঙ্গল' নামক ধর্ম এলাকা স্থাপন করেন। কিন্তু পর্তুগীজ গির্জাসমূহের (আমপট্টি, তেজগাঁও, নাগরী, পাঞ্জেরা ও হাসনাবাদ) মিশনারীরা পোপের এ হস্তক্ষেপের বিরোধিতা করেন এবং প্রত্যক্ষভাবে পোপের অধীনে যেতে অস্বীকৃতি জানান।

এদিকে ঢাকার বিশিষ্ট ক্যাথলিক তালুকদার মিঃ রবার্ট দুশের সাথে স্থানীয় পর্তুগীজ ফাদারদের মতোবিরোধ দেখা দেয়ায় ফাদাররা তাঁকে গির্জার ধর্মানুষ্ঠানে যোগ দিতে নিষেধ করেন। ফলে মিঃ দুশে একজন যাজক চেয়ে কলকাতা ভিক্টোরিয়েটে আবেদন জানালে জেসুইস্ট ফাদার হিপোলাইট মুর ১৮৩৬ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে ঢাকায় আগমন করেন। মিঃ দুশের আর্থিক সহায়তায় তিনি ছোট্ট বেড়ার ঘরে ভিক্টোরিয়েটের অধীনস্থ প্রথম গির্জা নির্মাণ করেন। এ গির্জাটি কোথায় ছিল জানা যায়নি।

১৮৪৭ খ্রিঃ লরেটো সিস্টাররা ঢাকায় একটি কনভেন্ট স্কুল চালু করেন। এটি সম্ভবত জনসন রোডের বর্তমান ন্যাশনাল মেডিক্যাল ইন্সটিটিউটের কোন একটি বিল্ডিং ভাড়া করে শুরু হয়েছিল। আগেকার গির্জার স্থান সংকুলান না হওয়ায় এ কনভেন্টের গির্জাটিই সবার জন্য ব্যবহৃত হতে থাকে। পরবর্তীকালে সিস্টাররা ঢাকা ত্যাগ করলে এ গির্জাটির ব্যবহারও বন্ধ হয়ে যায়।

১৮৬৭ খ্রিঃ বিশপ দুকাল লক্ষ্মীবাজারের বর্তমান সেন্ট জেভিয়ার্স কনভেন্টের স্থানে একটি পাকা গির্জা চালু করেন। বাইশ বছর পর ১৮৮৯ খ্রিঃ বর্তমান সেন্ট গ্রেগরীজ হাইস্কুলের প্রাঙ্গনে আরেকটি নতুন গির্জা নির্মিত হয়। এর নামকরণ হয় সাধু লুইসের ক্যাথিড্রাল (Lours Cathedral)। ক্যাথিড্রাল অর্থ ধর্মপ্রদেশের প্রধান গির্জা। সেন্ট গ্রেগরীজ হাইস্কুলের নির্মাণ কাজ শেষ হয় ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দের ১লা জুন। এরপর ১২ই জুন আসে এক প্রলয়ঙ্কারী ভূমিকম্প, যার ফলে ঢাকা শহরের অধিকাংশ দালান ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সেন্ট গ্রেগরীজ হাইস্কুলের নতুন ভবনটি ধ্বংসযজ্ঞ থেকে বেঁচে গেলেও গির্জাটিতে এমন এক বৃহৎ ফাটলের সৃষ্টি হয় যে তা ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়ে। পরবর্তী বছরের ১৪ই সেপ্টেম্বর সে স্থানে নতুন গির্জা নির্মিত হয় এবং এর নাম দেয়া হয় 'পবিত্র ক্রুশ ক্যাথিড্রাল' (Holy Cross Cathedral)

১৯২৩ খ্রিঃ লক্ষ্মীবাজার থেকে বিশপ ভবন রমনাস্থ বর্তমান আর্চবিশপ ভবন প্রাঙ্গণে স্থানান্তরিত হয়। এ শতাব্দীর পঞ্চাশ দশকের শেষ দিকে রমনাস্থ 'সেন্ট মেরীজ ক্যাথিড্রাল' (St Marys Cathedral) নির্মাণের পর লক্ষ্মীবাজারের গির্জাটিকে 'পবিত্র ক্রুশ গির্জা' নাম দেয়া হয়। বর্তমানে এ গির্জার অধীনে এক হাজার ক্যাথলিক আছে।[১]

তথ্য সূত্র ঃ

১। জেরোজ.ডি. কস্তা, ঢাকার ঐতিহাসিক গির্জা, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪৭

Dhaka University Institutional Repository

সাধু যোহানের গির্জা

তুমুলিয়া (১৮৪৪ খ্রিস্টাব্দ)

বর্তমানে গাজীপুর জেলাধীন টঙ্গী কালিগঞ্জ মহাসড়কের উত্তর পাশে পূবাইলের দিকে সামান্য কিছুপথ এগিয়ে গেলেই হাতের ডানদিকে বখতারপুর গ্রামে সাধু যোহানের গির্জাটি অবস্থিত। বর্তমানে গির্জাটি গাজীপুর জেলাধীন হলেও ১৯৯২ সনের পূর্ব পর্যন্ত ঢাকা জেলাধীন এবং পরবর্তীতে নারায়নগঞ্জ জেলার অধীনে ছিল। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে গির্জাটির নাম পূর্বে জন ব্যাপ্টিস্টের গির্জা ছিল, বর্তমানে গির্জাটির নাম সাধু যোহানের গির্জা।

স্থাপত্যিক বর্ণনা ঃ

১৮৪৪ (গির্জার সম্মুখে উল্লেখিত সন) গির্জাটি নির্মাণ করা হয়। গির্জার সম্মুখের লাল সবুজ বন্ধনী (Moulding) নকশা ছাড়া এ গির্জাকে অলংকার বিহীন বলা যায়।বিশাল আয়তাকার বিশিষ্ট এ গির্জাটির দৈর্ঘ্য ১৫০′ এবং প্রস্ত ৫০′ ফুট। উওর ও দক্ষিন দিকে লম্বা টিন সেড বারান্দা এবং পশ্চিম দিকে একটি বারান্দা এবং বারান্দার সম্মুখে সংলগ্ন একটি গাড়ী বারান্দা (Porch) রয়েছে। এ গাড়ী বারান্দাটির উপরের অংশ ত্রিকোনাকার নকশাকৃত অংশ (Pediment) যা দু'টি সরু স্তম্ভের সমর্থনে নির্মিত। গির্জার নির্মাণ তারিখ এ অংশে উল্লেখ করা হয়েছে। এ ত্রিকোনাকৃতির অংশের উপর একটি ক্রুশ চিহ্ন রয়েছে। বারান্দার পিছনের দিক অর্থাৎ মূল গির্জার সম্মুখ দেওয়াল ত্রিকোনাকৃতির একং দুটি চারকোনা স্তম্ভ সহযোগে নির্মিত। ত্রি-কোনাকার নকশাকৃত অংশ স্তম্ভের শীর্ষে (Capital) তিনটি বন্ধনী (Moulding) দ্বারা অলংকৃত করা। ত্রিকোনাকার নকশাকৃত অংশের শীর্ষে চারকোনা খাট স্তম্ভ সহযোগে অর্ধ বৃত্তাকার খিলান সদৃশ একটি অংশ শোভা পাচ্ছে এবং এ অংশের উপরে একটি ক্রুশ চিহ্ন শোভা পাচ্ছে, যা অনেক দূর থেকেও গির্জা হিসেবে এ ইমারতের অস্তিত্ব ঘোষনা করে। গির্জার সম্মুখের এ ত্রিকোনাকৃতির দেয়ালটি ছাদের আকৃতিকে ঢেকে দিয়েছে। ছাদটি ও মূলতঃ এরূপ ত্রিকোনাকার বা টিনসেড আকৃতির। (চিত্র নং- ৩৬ দ্রঃ)

গির্জার পশ্চিমদিকে গির্জা সংলগ্ন একটি অফিস ঘর এবং ১টি বারান্দা আছে। এ বারান্দাটি উওর পূর্ব দিকে বর্ধিত হয়ে ইংরেজী এল 'L' আকৃতি ধারন করেছে এবং সংযুক্ত হয়েছে বর্তমানে নির্মিত বোডিং হাউসের সাথে।

বর্তমানে গির্জার যে সম্মুখ অংশ অর্থাৎ পূর্ব দিক তা পিছন দিকে পড়েছে এবং পশ্চিম দিকে গির্জা ক্যাম্পাসে প্রবেশের প্রধান প্রবেশ পথ।

গির্জার অভ্যন্তরে আসন ব্যবস্থার বিন্যাসে মাঝে একটি প্রশস্ত পথের (Nave) সৃষ্টি হয়েছে। এখানে এ প্রশস্ত পথ বা সরু খিলান পথ (Aisle) সৃষ্টি কারী কোন স্তম্ভ ব্যবহার করা হয়নি।

গির্জার প্রার্থনা বেদীটি মেঝে থেকে সামান্য উত্তোলিত, মেঝে থেকে প্রায় অর্ধ হাত উঁচু। তবে অন্যান্য ক্যাথলিক গির্জার তুলনায় বেদীর উচ্চতা কম। বেদীর সম্মুখ অংশ তিনটি খিলানাকৃতির কাঠামোতে সজ্জিত। মাঝের অর্ধবৃত্তটি উভয় পাশের অর্ধবৃত্তাকার কাঠামো অপেক্ষা উঁচু। মধ্যবর্তী খিলানের উপরে একটি ত্রিকোনাকার নকশাকৃত অংশ আঁকা। এ অংশের গায়ে বিভিন্ন রঙ দিয়ে অলংকরন করা । এ ত্রি-কোনাকার নকশাকৃত অংশটি আয়তাকার কাঠের উপর অলংকৃত। এ অংশটি তিন খিলানরূপী সজ্জিত মঞ্চের সর্ব উপরের অংশে অপর একটি ত্রিকোনাকার নকশাকৃত অংশ দ্বারা যুক্ত করা। আয়তাকার কাঠের উপরে এবং বৃত্তাকার নকশাকৃত অংশের সুউচ্চ বিন্দুর

Dhaka University Institutional Repository

মাঝামাঝি স্থানটি এভাবে আরেকটি ত্রিকোনের সৃষ্টি করেছে। মঞ্চের উপরে এ গোটা অংশটি গির্জার বিশেষ অলংকরন রূপে বিবেচনা করা যায়। গির্জার ভিতর এ স্থানটি অতি আকর্ষনীয়। (চিত্র নং-৩৭)

বেদীতে ডায়াসের পাশে বাইবেল রাখার একটি বাইবেল স্ট্যান্ড রয়েছে এবং বেদীর ডান দিকের অংশ তিনটি অংশে বিভক্ত করা। তিন অংশের সম্মুখেরটিতে রয়েছে মাতা মেরীর মূর্তি। পেছনের দু'টি বিভক্ত অংশের সম্মুখে প্রায় অর্ধবৃত্তাকার খিলানাকৃতির রয়েছে; এর উপর অংশ তিনটি করে বন্ধনী (Moulding) নকশা দ্বারা অলংকৃত করা হয়েছে।

বেদীর সম্মুখের মধ্যবর্তী বৃহৎ খিলানের ভিতর দিয়ে সামান্য প্রবেশ করা মাত্র যীশুর ক্রুশ বিদ্ধ প্রতীক ভাস্কর্য নজরে পড়ে। বৃহৎ খিলান পার্শ্বস্থ ত্রিকোনাকার ভূমি (Spandril) বিভিন্ন ধর্মীয় বাণীতে সজ্জিত।

পার্শ্ববর্তী ডানদিকের খিলান পথে এগিয়ে গেলে গির্জার শেষ দেয়ালে দু'সারিতে মাতা মেরীসহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তির প্রতীক ভাস্কর্য চোখে পড়ে। এ অংশের ডানদিকে একটি গভীর কুলুঙ্গী আছে।

অনুরূপভাবে বাঁ'দিকে এগিয়ে গেলে ছোট খিলান বিশিষ্ট একটি কক্ষের সন্ধান পাওয়া যায়। কক্ষটি পানাহারের জন্য ব্যবহার করা হয়।

প্রার্থনা বেদীর সামনের দু'দিকে অর্থাৎ ডান দিক এবং বাঁ'দিকে গির্জার দেয়াল সংযুক্ত কাঠের ছোট সজ্জিত মঞ্চের উপর ভাস্কর্য আছে । (চিত্র নং-৩৮ ও ৩৯)

উল্লেখ করা প্রয়োজন যে এ গির্জায় কোন প্রতীকি গুহা বা 'Grotto' নেই। তবে প্রধান প্রবেশ পথ দিয়ে গির্জা কমপ্লেক্সে (Complex) প্রবেশ করার পরই নজরে পরে সমাধি ক্ষেত্র এবং সমাধি ক্ষেত্রের সুন্দর ত্রিকোনাকৃতির প্রবেশ তোরন। প্রবেশ তোরনের উপর একটি ক্রুশ শোভা পাচ্ছে। ত্রিকোনাকৃতির অংশের বিভিন্ন দিকে বিভিন্ন বাণী লিখা আছে। একদিকে লিখা আছে 'ধুলিতেই মিশে যাব'। আবার এর উল্টো পিঠে লিখা আছে – – পরলোকেতে ভক্ত বৃন্দের আত্মা ঈশ্বরের কৃপায় চির শান্তি লাভ করবে।

এরই ঠিক পিছনে কিছু দূরে যীশুর ক্রুশ বিদ্ধ একটি ভাস্কার্য এ্যাপসে (apse) রাখা আছে। এ্যাপসের সম্মুখের দু'পাশে মেকী ফুলেল নকশা দ্বারা শোভিত করে একে দৃষ্টি গ্রাহী করা হয়েছে।

উপরে ছাদের অংশে লেখা আছে যীশু বলেন " আমিই সত্য, জীবন ও পুনরুত্থান"। গির্জায় প্রবেশ করার পর প্রার্থনা বেদীর সামনের দু'দিকে অর্থাৎ ডান এবং বাদিকে কাঠের সংযুক্ত ছোট সজ্জিত মঞ্চের উপর ভাস্কার্য রয়েছে।

নির্মাণ ইতিহাস ঃ

ভাওয়াল অঞ্চলের মধ্যে প্রথমে নাগরীতে খ্রিস্টান বাণী প্রচার কেন্দ্র গড়ে উঠে। সম্ভবতঃ ক্যাথলিকদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং আন্তইন দা রোজারিওর প্রচারের কারনে ক্রমশঃ তুমুলিয়া ও রাঙ্গামাটিয়ায় ক্যাথলিক বসতি বিস্তার লাভ করে। কিন্তু এ ব্যাপারে লিখিত কোন প্রমাণ নেই। গ্রাম দু'টোতে খ্রিস্টান জনগোষ্ঠীর প্রাধ্যান্য আছে।

১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দের বড়দিনের রাতে তুমুলিয়া রাঙ্গামাটিয়ার ক্যাথলিকদের অনেকে বদ্ধ মাতাল অবস্থায় পাঙ্গোরার গির্জায় খ্রিস্টযোগে অংশ গ্রহন করতে গেলে তাদেরকে অংশগ্রহণ করতে দেওয়া হয়নি। একারনে এসব মাতাল ব্যক্তি ভীষন অপমানিত বোধ করে।

Dhaka University Institutional Repository

অন্যদিকে ভাওয়াল রাজ্যধীন তুমুলিয়া তালুকের তালুকদার মিঃ রবের দ্যুসে ঢাকায় বাস করতেন। তিনি ঢাকায় বিচ্ছেদবাদী পর্তুগীজ ফাদারের সাথে যোগ দেননি বলে খ্রিস্টযোগের সময় এসব যাজক তাঁকে পবিত্র খ্রিস্ট প্রসাদ দিতে অস্বীকার করেন। তুমুলিয়া তালুকাধীন তার প্রজারা স্বভাবতরই পাঙ্গোরার ঘটনা নিয়ে মিঃ দ্যুসের স্মরনাপন্ন হন। তিনি পোপের অধীনস্থ যাজক চেয়ে কলকাতাস্থ ভিকার এপষ্টলিকের কাছে পত্র দিলে ১৮৩৬ খ্রিস্টাব্দের ১লা জুলাই কলকাতা থেকে হিপোলাইট মুর নামক একজন জেসুইস্ট যাজক ঢাকায় আগমন করেন। তিনি একদিন রাতে তুমুলিয়ার একটি মাঠে ৪০ জন স্থানীয় মাতব্বরের সঙ্গে মিলিত হন। ফাদার তাদেরকে ছেড়ে যাবেননা এবং একটি নতুন কবর স্থানের ব্যবস্থা করবেন এ শর্তে মাতব্বররা ফাদারকে গ্রহন করতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। ফাদার এতে সম্মত হয়ে তুমুলিয়ায় একটি কুড়েঘর নির্মাণ করে সেখানে বাস করতে থাকেন। তিনি তখন স্থানীয় ক্যাথলিকদের মধ্যে ধর্ম বিষয়ে অজ্ঞতা, বাহ্য কুসংস্কার মূলক আচরন এবং পবিত্র সংস্কার সমূহ গ্রহনে উদাসীনতা লক্ষ্য করেন। শীঘ্রই ফাদার মূর স্থানীয় লোকদের কাছ থেকে গির্জা ও কবরস্থানের জন্য জমি লাভ করেন। ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দের শেষে তুমুলিয়ায় একটি ছোনের গির্জা নির্মিত হয় এবং বড় দিনের দিন ফাদার মুর সেখানে প্রথম খ্রিস্টযোগ অর্পন করেন। এ ছোনের ঘরটিই ছিল তুমুলিয়ার প্রথম গির্জা।

১৮৩৭ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে নাগরীর বৃদ্ধ ও অসুস্থ ফাদার ফ্রকতোউসা ফাদার মুর এর মাধ্যমে পোপের বশ্যতা স্বীকার করেন। ফলে তুমুলিয়া পুনরায় নাগরী পাঙ্গোরার অধীনে যায়। কিন্তু ১৮৪১ খ্রিস্টাব্দের ১৪ই জুলাই নাগরীর আগাস্টিনিয়ান ফাদার লরেঞ্জো দাস মিলিগ্রাম পুনরায় বিচ্ছেদবাদী হয়ে উঠলে তুমুলিয়ার আর কোন যাজক ছিলেন না। তখন ঢাকা থেকে বহুদিন পর পর যাজক তুমুলিয়ায় যেতেন।

১৮৪৪ খ্রিঃ তুমুলিয়ার অধীনস্থ ক্যাথলিকদের সংখ্যা দাড়ায় দু'হাজারে। এদের জন্য একটি স্থায়ী গির্জার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেওয়ায় সে বছরই তালুকদার মিঃ রবের দ্যুসে তুমুলিয়ার বর্তমান পাকা গির্জার স্থানে ১৩ পাখি (বিঘা) জমি দান করেন। এখানে নির্মিত গির্জাটি ১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দের প্রচন্ড ঝড়ে ভূমিস্মাৎ হলে তা পরে পুনঃ নির্মিত হয়।

১৮৯৫ খ্রিঃ ফাদার এমিল লাকোঁ সি- এস - সি (১৮৯৪ - ১৯১০ খ্রিঃ) তুমুলিয়ায় একটি একতলা নতুন যাজক ভবন (বর্তমান কনভেন্টের প্রথম তলা) নির্মাণ করেন। এ সময় শিক্ষার উপরও জোর দেওয়া হয়। প্রথম থেকেই তুমুলিয়ায় (খ্রিস্টানদের বর্তমান রান্নাঘরের স্থানে) একটি পাঠশালা (প্রাইমারী স্কুল) ছিল। এছাড়াও ফাদার লাকোঁর সময়ে চড়মোলা, দড়িপাড়া ও রাজানগর গ্রামে বালকদের সান্ধ্য-পাঠশালা প্রতিষ্ঠিত হয়। কিছুকাল পর পূর্ব তুমুলিয়া ও রাঙ্গামাটিয়ায় বালকদের সান্ধ্য-পাঠশালা চালু হয়। শুধু জয়রামগড় গ্রামে বালক বালিকা উভয়ের জন্য পাঠশালা ছিল। ১৯৫০ খ্রিঃ ধর্ম পল্লীর গ্রাম্য পাঠলাশাগুলো বন্দ হয়ে গেলে তুমুলিয়ার স্কুলটিই কেবল চালু ছিল। ফাদার জা ফ্লুরী ফ্লুরী সি এস সির সময় (১৯১০-১৯১৪ খ্রিঃ) তুমুলিয়ায় (বর্তমান যাজক ভবনের স্থানে) একটি নতুন স্কুল স্থাপিত হয় তা ১৯১৩ খ্রিঃ মিডিল ভের্নাকুলার স্কুলে পরিনত হয় এবং পরবর্তী বছরে সরকারী স্বীকৃতি পায়।

১৯১৭ খ্রিঃ যাজক ভবনটি (বর্তমান কনভেন্ট) কিছু সম্প্রসারিত করে তার উপর দ্বিতীয় তলা নির্মিত হয়। পরবর্তীকালে তুমুলিয়ায় একটি যাজক প্রশিক্ষন কেন্দ্র (সেমিনারী ধরনের) এবং ক্যাটেখিস্ট স্কুল চালু হয়, যা ১৯১২ খ্রিঃ বান্দুরায় স্থানান্তরিত হয়।

১৯২৭ খ্রিঃ পবিত্র ক্রুশ সিস্টারদের আগমনের পূর্বে নতুন যাজক ভবন নির্মিত হয়, তো এখনও একই কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। এ সিস্টাররা পুরানো যাজক ভবনে (বর্তমান কনভেন্টে) উঠেন এবং একটি ডিস্পেন্সারী চালু করেন। তারা ১৯২৯ খ্রিঃ মেয়েদের জন্য একটি বোর্ডিং স্থাপন করেন। ১৯৩০ খ্রিঃ পবিত্র ক্রুশ সিস্টারদের পরিচালনায় দেশীয় সিস্টার লাভার্থে প্রেরিতদের রানী মারীয়ার সঙ্গিনী সিস্টারদের একটি প্রার্থনা গৃহ (পস্টু লেন্সী) চালু হয়।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৩৭ খ্রিঃ বালিকাদের জন্য একটি মিডল ইংলিশ স্কুল চালু হয় যা ১৯৪১ খ্রিঃ হাইস্কুলে রূপান্তরিত হয়। বিশপ ক্রাউলীর মতে, তৎকালীন সমগ্র বঙ্গের মধ্যে এটিই ছিল মেয়েদের জন্য প্রথম হাইস্কুল। ১৯৪৫ খ্রিঃ মাতৃসদন ও চিকিৎসালয়টি নির্মিত হয়। ১৯৬৭ খ্রিঃ বালকদের হাইস্কুল স্থাপিত হয়।

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ৩০শে নভেম্বর বালিকাদের জন্য একটি মিডিল ইংলিশ স্কুল চালু হয় এবং ১৯৪১ খ্রিঃ হাইস্কুলে রূপান্তরিত হয়। বিশপ ক্রাউলীর মতে তৎকালীন সমগ্র বঙ্গের মধ্যে এটিই ছিল মেয়েদের জন্য প্রথম হাইস্কুল। ১৯৪৫ খ্রিঃ মাতৃসদন ও চিকিৎসালয়টি নির্মিত হয়। ১৯৬৭ খ্রিঃ বালকদের হাইস্কুল স্থাপিত হয়।

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ৩০শে নভেম্বর ফাদার গ্রেগরী স্টেগমায়ার সি এস সি তুমুলিয়ায় যাবার পূর্বে ধর্মপ্রদেশ পরিচালক ফাদার খ্রিস্টোফার ক্রস সি এস সি'র নির্দেশে বিহারের রাবী গিয়ে সামাজিক কর্ম সম্পর্কে পড়াশুনা করেন। তখন তাঁকে বলা হয়েছিল তিনি যেন তুমুলিয়ায় সমাজ সংস্কার মূলক কাজ করেন। তুমুলিয়ার পৌছে ফাদার স্টেগমায়ার বিবাহের অস্বাভাবিক খরচ, মাত্রাতিরিক্ত মদ্যপান, বিবাহের পণপ্রথা ইত্যাদি কিছু সামাজিক ব্যাধি দূরীকরনার্থে ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

এশতাব্দীর প্রথমার্ধে তুমুলিয়া ধর্মপল্লীর ক্যাথলিক লোকসংখ্যার মধ্যে পরিবর্তন দেখা দেয়। লোক সংখ্যা বৃদ্ধি ও ভূমির স্বল্পতার কারনে তখন বেশ কিছু সংখ্যক পরিবার এ ধর্মপল্লীর এবং পরবর্তীতে রাঙ্গামাটিয়া ধর্মপল্লী থেকে সাভার পাবনা ও রাজশাহী অঞ্চলে গিয়ে নতুন করে বসতি গড়ে তোলেন। ১৯৫১ খ্রিঃ পুনরায় ব্যাপক পরিবর্তন দেখা দেয়। তখন এ ধর্মপল্লীস্থ দুয়ানিরটেক ও আড়াগাও নাগরী ধর্মপল্লীর কাছে এবং নাগরীর অধীনস্থ দাড়িপাড়া গ্রামটি তুমুলিয়ার কাছে হস্তান্তরিত হয়। তাছাড়া তুমুলিয়ার অধীনস্থ বড় যাতানী রাজনগর ও দেওলিয়া গ্রামসমূহ রাঙ্গামাটিয়া ধর্মপল্লীভূক্ত হয়। তুমুলিয়া ধর্মপল্লীর ক্যাথলিক লোকসংখ্যা নিম্নরূপ ঃ ১৯৬৫ খ্রিঃ ৪৬০৭, ১৯৭২ খ্রিঃ - ৫৪৭০, ১৯৮০ খ্রিঃ - ৫৮৮৭ এবং ১৯৮৫ খ্রিঃ - ৬৫৩৩ ----

এ ধর্মপল্লীস্থ সংঘ সমিতিগুলোর মধ্যে আছে ধর্মপল্লী কেন্দ্রীয় সমিতি, সাধু ভিন্সেন্ট দ্যা পল সমিতি, খ্রিস্টান ঋনদান সমিতি, মধ্যবয়স্কা মহিলাদের 'ফাতিমা রানী সমিতি', সদ্য বিবাহিতাদের 'শান্তি রানী সমিতি', হাইস্কুল বালিকাদের পুষ্প সংঘ, প্রাইমারী বালিকাদের ছোট পুষ্প সংঘ এবং ওয়াই-সি-এ ছাড়াও প্রায় অর্ধ ডজন যুব সংঘ।

১। বাংলাদেশের ক্যাথলিক মন্ডলী, পূর্বোক্ত, পৃঃ-৪২৮

Dhaka University Institutional Repository

ব্যাপ্টিস্ট গির্জা

বাংলাবাজার ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দ

ঢাকার বাংলাবাজারের সদর ঘাট এলাকায় জগন্নাথ কলেজের উল্টো দিকে এ ব্যাপ্টিস্ট গির্জাটি অবস্থিত। এখানে যে একটি গির্জা আছে তা বোঝাই যায় না, কেবল উপরে পবিত্রতার চিহ্ন ক্রুশ চিহ্ন দেখেই এর অস্তিত্ব অনুধাবন করা যায়। তবে গির্জা প্রাঙ্গণটি বেশ বড়।

পুরাতন অর্থাৎ প্রাথমিক গির্জাটি মিঃ বারনেট কর্তৃক ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হয়েছিল ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দের ২৯শে সেপ্টেম্বর, এবং উদ্বোধন করা হয়েছিল ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে। গির্জাটির নির্মাণকাল নিয়ে কোন দ্বিমত নেই।

নতুন বা বর্তমানে নির্মাণাধীন গির্জাটির ভিত্তি প্রস্তর স্থাপিত হয়েছে ১৯৯৫ এর ১০ই সেপ্টেম্বর, এর উদ্বোধন হয়েছে ১৯৯৭শে মার্চ মাসে।

১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে যে গির্জাটি নির্মিত হয়েছিল তা বর্তমানে দন্ডায়মান নেই। প্রাথমিক গির্জাটি ভেঙ্গে বর্তমানের গির্জাটি ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দে নির্মাণ করা হয়েছে। স্বভাবতই প্রাথমিক গির্জার স্থাপত্যিক বর্ণনা দে'য়া প্রায় দুঃসাধ্য ব্যাপার। এ গির্জার একটি স্মারণিকা পিছনের পৃষ্ঠায় দেখা একটি চিত্রের সাহায্যে প্রাথমিক গির্জার একটি বর্ণনা দে'য়া যেতে পারে।[১]

প্রাথমিক গির্জাটি আয়তাকার ছিল বলে মনে হয়। এর সম্মুখ অংশ ছিল অর্ধবৃত্তাকার। এ অর্ধবৃত্তাকার অংশে একটি বারান্দা ছিল। এটি একটি ব্যতিক্রম ধর্মী বৈশিষ্ট্য। এ ইমারতকে এ বৈশিষ্ট্য একটি ব্যাতিক্রমধর্মী সৌন্দর্য দান করেছিল বলে মনে হয়। সম্মুখ অংশে একটি মোটা স্তম্ভ ছিল। এছাড়া উত্তর-দক্ষিণ দিকে ৫টি করে ১০টি সংযুক্ত স্তম্ভ ছিল। আর এ স্তম্ভগুলোর উপর ভিত্তি করে ছাদ নির্মিত হয়েছিল। ছাদের কার্ণিশের নীচে ব্র্যাকেট এবং ব্র্যাকেটের নীচে চারিদিকে ঘোরান একটি মোল্ডিং নকশা ছিল। এছাড়া উত্তর-দক্ষিণ দিকে ৫টি করে ১০টি জানালা এবং সম্মুখে তিনটি দরজা ছিল।

১৮০৫ খ্রিস্টাব্দের ৩১শে আগস্ট শ্রীরামপুরে এক বৈঠকে মিশনারীরা একমত হন যে, মিঃ উইলিয়াম কেরী এবং মিঃ উইলিয়াম মুরসহ স্থানীয় কয়েকজন প্রচারকের ঢাকায় প্রচারের জন্য যাত্রা করা উচিত। শ্রীরামপুর থেকে প্রায় ২/৩শ মাইল উত্তর-পূর্বে অবস্থিত ঢাকাকে প্রচারের জন্য বেছে নেয়ার যথেষ্ট কারণ ছিল। তৎকালে ঢাকা ছিল বেশ বড় এবং গুরুত্বপূর্ণ একটি নগরী। ব্যাপকভাবে ধর্ম প্রচার কার্য পরিচালনার জন্য ঢাকায় যেমন প্রচুর সুযোগ ছিল তেমনি এর একটি কৌশলগত দিকও ছিল।

ডঃ উইলিয়াম কেরীর ২য় পুত্র মিঃ উইলিয়াম মুর এবং রাম মোহন বৈদ্যনাথ ও ভারত নামক তিনজন নব দীক্ষিত খ্রিস্টিয়ান শ্রীরামপুর থেকে জলপথে নৌকা যোগে বুড়িগঙ্গার তীরে ছোট কাটরার কাছে এসে নৌকা ভিড়ান। দু'জন ইউরোপীয়কে দেখে এক বিরাট কৌতুহলী জনতার সমাগম হয়। এ সুযোগে তারা জনতার মাঝে ধর্মপ্রচার ও ধর্মীয় পুস্তকাদি বিতরণ করেন। এতে জনগণের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হওয়ায় ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেট মিশনারীদ্বয়কে ঢাকা ত্যাগ করতে নির্দেশ দেন। পরে মিশনারীটি ১৮১৫ খ্রিঃ ঢাকায় আসার পর সার্বিকভাবে তাদের কাজ শুরু করে।[২]

১৮১৫ খ্রিঃ মিঃ লেনার্ড ও তাঁর স্ত্রী ঢাকায় এসে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন এবং ইউরোপীয়দের মধ্যে ধর্ম প্রচার শুরু করেন। তখন তারা চকবাজার এলাকায় বাস করতে থাকেন। তাদের সদর দপ্তর ৬০ বছর যাবৎ ঐ অঞ্চলেই ছিল।[৩]

Dhaka University Institutional Repository

১৮১৭ খ্রিঃ ডিসেম্বর মাসে প্রথম বারের মত প্রচারকদের প্রচেষ্টার সফলতা আসে। এ সময় এক ইহুদী দম্পত্তি মিঃ ১ম লোমান ও তার স্ত্রী প্রকাশ্যে খ্রিস্ট ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। এরাই ছিলেন ঢাকার প্রথম দীক্ষিত খ্রিস্টীয়ান। ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দের ২২শে ডিসেম্বর সোয়ারী ঘাটে তাদের অবগাহন হয়।

১৮৪৭ খ্রিঃ থেকে মিঃ রবিনসন ঢাকার আশেপাশের শহরে প্রচার কার্যে মনোযোগ দেন। এর ফলে ঢাকা ভিত্তিক প্রচার কার্যের একটি নতুন অধ্যায় সূচনা হয়। কারণ মিঃ রবিনসনের এ উদ্যোগের মধ্য দিয়ে নতুন মিশন কেন্দ্রগুলোর মধ্যে একটি নেটওয়ার্ক গড়ে ওঠে। ঢাকা পূর্ব বাংলার মিশন সমূহের মাতৃভূমিতে পরিণত হয়।

১৮৮২ খ্রিঃ মিঃ বার্ণেট ঢাকায় মিশনারী নিযুক্ত হন এবং তিনি ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দের ২৯শে সেপ্টেম্বর বাংলাবাজারে ব্যাপ্টিস্ট মিশন গৃহটির ভিত্তি স্থাপন করেন। ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারী মাসে এর নির্মাণকার্য সমাপ্ত হয়। সে সময়ে এ মিশন প্রাঙ্গণের ৩ বিঘা ১০ কাটার জমিটি সাড়ে তিন হাজার টাকায় ক্রয় করা হয়।[৪]

বর্তমানে মন্ডলী গৃহটি নির্মাণের পূর্বে ছোট কাটরায় অবস্থিত মিশন গৃহটি ব্যাপ্টিস্ট গির্জা হিসেবে ব্যবহৃত হতো। ১৮৪১ খ্রিঃ মিঃ উইলসন রবিনসনের উদ্যোগে স্থানীয় খ্রিস্টীয়ানদের উপাসনার জন্য এ গৃহটি নির্মিত হয়েছিল। এটা ছিল বর্তমান মিডফোর্ড হাসপাতালের কাছাকাছি কোন এক জায়গায়।[৫]

লন্ডনের রিজেন্ট পার্ক চ্যাপেলের (ছোট গির্জা) সদস্যদের অর্থ সাহায্যে মিঃ সাটন পেজ ১৯০৩ খ্রিঃ বাংলাবাজারের মোড়ে Regent Park Chapel নামক প্রচার কেন্দ্রটি নির্মাণ করেন। বর্তমানে এ হলটিতে ধর্মীয় পুস্তক ও পত্রপত্রিকা পাঠের ব্যবস্থা আছে। ১৯১২ খ্রিঃ মিশনের পূর্বদিকে একটি খ্রিস্টান ছাত্রবাস নির্মিত হয়।

উল্লেখ্য যে, মিঃ রাইট হে ১৮৮৭ খ্রিঃ ঢাকায় এসে সাত বছরকাল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে প্রচার কাজ চালান। তিনি 'The Evangelist' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করতেন। ১৯০২ খ্রিঃ মিঃ মার্টিন পেজ ছাত্রদের জন্য 'The Students Chronicles' নামক অপর একটি মাসিক পত্রিকা সম্পাদনা করেন।

ব্যাপ্টিস্ট মিশনারীরাই ঢাকায় সর্বপ্রথম ইংরেজী শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করেন। ১৮১৭ ছেলেমেয়েদের জন্য পাঁচটি ইংরেজী স্কুল এবং একটি ফার্সী স্কুল চালু হয়। ১৮২৪ খ্রিঃ এদের স্কুলের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে পনেরতে দাঁড়ায় এবং এগুলোতে ছাত্র ছাত্রী সংখ্যা ছিল ১৩০০ জন। সরকারী স্কুল-কলেজ চালু না হওয়া পর্যন্ত মিশনারীদের এ শিক্ষা অব্যাহত ছিল।[৬]

১৮৩১ সালের ২৮শে জানুয়ারী ঢাকা ব্যাপ্টিস্ট মন্ডলীর প্রথম সভা হয়। বিভিন্ন স্থান হতে এসে যারা ঢাকায় তখন ছিলেন এরূপ ১৭ জন খ্রিস্টমন্ডলীর পুরোহিত ছিল রেভা ও লিওনার্ড। প্রথমতঃ এখানে ইংরেজী ও বাংলায় একসঙ্গে উপাসনা হতো। তারপর দেশীয় সভ্যদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় বাংলায় আলাদা হতো। ঢাকা মন্ডলীর নাম দেয়া হয় ঢাকা ব্যাপ্টিস্ট মন্ডলী।

<u>তথ্য সূত্র</u> ঃ

১. বাড়ৈ রেভারিজ, আর-এন, ঢাকা ব্যাপ্টিস্ট মন্ডলীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, স্মরণীকা-৩০শে মার্চ ১৯৯৭ খ্রিঃ (কভার পৃ)

২. Dani A.H. – Dhaka, A Record and Its Changing Fortune, P-115

৩. জেরোম ডি কাস্তা, ঢাকায় ঐতিহাসিক গির্জা, রোববার-৩রা মে ১৯৮১ পৃঃ ৪৮

৪. বাড়ৈ রেভারিজ, আর-এন, ঢাকা ব্যাপ্টিস্ট মন্ডলীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, স্মরণীকা-৩০শে মার্চ ১৯৯৭ খ্রিঃ পৃ-২৫

৫. পূর্বোক্ত পৃঃ-২৫

৬. পূর্বোক্ত পৃঃ-৪৮

Dhaka University Institutional Repository

ভক্তিরানীর গির্জা

আমপট্টি, ঢাকা (১৮১৫-১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দ)

ব্রিটিশদের আগমনের পর ঢাকার গুরুত্ব ক্রমশ বাড়তে থাকে। ব্রিটিশ ও আইরিশ সেনাদের আগমনে ঢাকাস্থ ক্যাথলিক জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়। ফলে একটি নতুন গির্জার প্রয়োজন পড়লে ১৮১৫ খ্রিঃ পর্তুগজি ফাদার এম দ্য ভক্তিরানীর গির্জাটি নির্মাণ করেন। তেজগাঁয়ে তখন স্বল্পসংখ্যক ক্যাথলিক ছিলেন বলে ১৮৭১ খ্রিঃ পর্যন্ত আমপট্টি থেকে যাজক নিয়ে তেজগাঁয়ের ক্যাথলিকদের আধ্যাত্মিক যত্ন নিতেন। ১৮৩৬ খ্রিঃ ফাদার হিপোলাইট মুর এস জে ঢাকা সফর শেষে কালিবাড়ি গিয়ে রিপোর্ট দেন যে, তখন ঢাকার ক্যাথলিকদের জনসংখ্যা ছিল ২০০ এবং তেজগাঁয়ের মাত্র ১০। ক্রমান্বয়ে আমপট্টি গির্জার অধীনস্থ লোকসংখ্যাও হ্রাস পেতে থাকে। অবশেষে ১৯৩০ খ্রিঃ পাদ্রেঅয়াদো গির্জাগুলো ঢাকা ধর্মপ্রদেশের কাছে হস্তান্তরিত হলে আমপট্টির ভক্তিরানীর গির্জাটিও বিশপের অধীনে আসে। কিন্তু ততদিনে এ গির্জার প্রয়োজনীয়তা লোপ পায়।

১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দের ১০ই নভেম্বর একটি ধর্মাশ্রম চালু করার উদ্দেশ্যে 'পোপ ফ্রেয়ারস অব পেপেচুয়াল এডোরেশন' নামক সিস্টার সংঘ্যকে অব্যবহৃত এ ভক্তিরানীর গির্জাটি হস্তান্তর করা হয়। পরে সিস্টাররা ১৯৬৯ খ্রিঃ ময়মনসিংহের অব্যবহৃত সাধু মাইকেলের হাসপাতাল ভবনে তাদের আমপট্টির ধর্মাশ্রমটি স্থানান্তরিত করেন। আর্তপীড়িতের মধ্যে কর্মরত নোবেল শান্তি পুরস্কার বিজয়িনী মাদার তেরেসার 'মিশনারীজ অব চ্যারিটি' সংঘের সিস্টাররা ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারীতে ঢাকায় এলে তাদের কাছে আমপট্টির গির্জা প্রাঙ্গণটি হস্তান্তরিত হয়। এ সিস্টাররা সেখানে একটি শিশু ভবন চালু করেন।

১। Manuscripts, "The Churches of the Augustinians in Dacca" OP, cit, PP-4-5
২। বাংলাদেশ ক্যাথলিক মন্ডলী, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৯-৪০

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়
গির্জার তুলনামূলক আলোচনা

বৃহত্তর ঢাকা জেলার গির্জাগুলো পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করে দেখা গেছে যে এখানে দু'ধরণের গির্জা আছে। একটি ক্যাথলিক গির্জা ও অপরটি প্রটেস্টান্ট গির্জা। ক্যাথলিক গির্জা ব্যবহারকারী খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের লোকেরা ক্যাথলিক সম্প্রদায়ভূক্ত।এসব গির্জা আয়তাকার, ব্যাসিলিকান আদলে লম্বা হল ঘরের মত করে তৈরী। ক্যাথলিক গির্জার চূড়ায় ত্রিকোণ নকশাকৃতি থাকে। এটা খ্রিষ্টধর্মের 'Symbol of Trinity' বা ত্রিতত্ত্ববাদের প্রতীক। এ ত্রিতত্ত্ববাদ (১) ঈশ্বর এক (২) মানব চরিত্র যীশু পুত্র ঈশ্বর এবং (৩) শক্তির নাম পবিত্র আত্মা। ক্যাথলিক গির্জাগুলোর সম্মুখ অংশে বারান্দা থাকে। বারান্দা পেরিয়ে মূল গির্জায় প্রবেশ করা হয়। গির্জার প্রধান প্রবেশপথ পশ্চিম দিকে এবং প্রার্থনা বেদী স্বাভাবিকভাবে পূর্ব দিকে অবস্থিত। তবে গির্জায় অন্যান্য দিকেও প্রবেশ পথ থাকে, প্রয়োজনের সময় খোলা হয়।

প্রার্থনা বেদীর উপর যীশু খ্রিস্টের ক্রুশবিদ্ধ ভাস্কর্য থাকে। গির্জায় অন্যান্য সাধু সন্তদের ছবি, এবং প্রতীক ক্রুশও থাকে। তবে এর ব্যতিক্রমও দেখা যায়। যেমন – যদিও তেজগাঁও এর জপমালা রাণীর গির্জাটি একটি ক্যাথলিক গির্জা, এখানে কোন বারান্দা নেই। অনুরূপভাবে কালিগঞ্জের পাঞ্জোরার গির্জাতেও কোন বারান্দা নেই কিন্তু সাধারণত গির্জায় বারান্দা থাকে । এসব গির্জায় কৌনিক স্তম্ভ শীর্ষ বিদ্যমান থাকে। এ প্রতীক দিয়ে বুঝানো হয় যে, পৃথিবী ক্রমশঃ ছোট হয়ে আসছে।

গির্জার প্রবেশ পথের সাধারণত কোন নির্দিষ্ট দিক নেই। তবে গির্জার প্রাথমিক ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, গির্জার প্রধান প্রবেশ পথ পূর্ব দিকে ছিল। তবে এখন কোন কোন গির্জার প্রবেশপথ উত্তর দিকেও থাকে, যেমন নাগরী ও পাঞ্জোরার গির্জায় প্রবেশ পথ উত্তর দিকে।

প্রটেস্টান্ট গির্জা ঃ

ক্যাথলিক গির্জাগুলোর মত প্রটেস্টান্ট গির্জাগুলোও আয়তাকার, ব্যাসিলিকান আদলে লম্বা হল ঘরের মত করে তৈরী। প্রটেস্টান্ট গির্জায় ত্রিকোন নকশা বা Pediment থাকে না। তবে এ সব গির্জাতেও কৌনিক স্তম্ভ শীর্ষ বিদ্যমান থাকে। প্রধান প্রবেশ পথ পশ্চিম দিকে, অতএব বেদী পূর্ব দিকে অবস্থিত। প্রটেস্টান্ট গির্জা বেদীতে ভাস্কর্য থাকে না। তবে প্রটেস্টান্ট গির্জা গুলোতে দু'টি চিত্র দেখা যায়। সাধারণত যীশুর ক্রুশবিদ্ধ অবস্থা এবং যীশুর শেষ ভোজ দৃশ্য চিত্র দুটি এসব গির্জায় থাকে। এছাড়া মাতা মেরী, পিতা যোসেফ, অন্যান্য সাধু সন্তদের চিত্রও থাকে। এ্যাংলিকান, ব্যাপটিস্ট এবং আর্মেনীয়ানরা প্রটেস্টান্ট শাখার উপদল। এসব গির্জায় স্থাপত্য বৈশিষ্ট্যের মধ্যে মিল রয়েছে। যেমন – এসব গির্জার সম্মুখ অংশে গাড়ী বারান্দা এবং উত্তর ও দক্ষিণ দিকে টানা বারান্দা আছে। বারান্দার পিছনেই মূল গির্জা অবস্থিত। বাহির দিকে গির্জার চূড়া দেখা যায়। আরমানিটোলা গির্জায় এ চূড়া বর্গাকার গাড়ী বারান্দার উপর অস্টকোনাকার ভিতের অস্টাকোনাকার কৌনিক গম্বুজ নির্মিত। সেন্ট থমাস গির্জার চূড়া বর্গাকার ক্ষেত্রের উপর বর্গাকার কক্ষ সদৃশ।

Dhaka University Institutional Repository

প্রটেস্টান্ট গির্জাগুলোর মাঝে কিছু বৈসাদৃশ্য ও লক্ষ্য করা যায়, যেমন – সেন্ট থমাস গির্জার বেদী ভূমি থেকে প্রায় দেড়ফুট উঁচু। বেদীর অংশ খুবই সাধারণ, কোন সাজসজ্জা নেই, গির্জার ব্যাপ্টিস্ট ফ্রন্টটি শ্বেত পাথরে নির্মিত। অন্যান্য গির্জায়ও শ্বেত পাথরের ব্যাপ্টিস্ট ফ্রন্ট লক্ষণীয়।

আরমানিটোলার হোলি রেসারেকশন গির্জার বেদী ভূমি থেকে প্রায় তিন ফুট উঁচুতে স্থাপন করা, জাকজমতায় ভরা। গির্জা আকারে ছোট হলেও একসময় এব যথেষ্ট জাঁকালো রূপ ছিল তা বুঝা যায়। সম্ভবতঃ আরমেনীয়নরা ব্যবসায়ী ছিল বলে গির্জার জন্য অর্থ ব্যয় করতে সমর্থ ছিল।

এ গির্জায় প্রার্থনাবেদীর বিপরীত দিকে আকর্ষনীয় সর্পিল কাঠের সিঁড়ি বিশিষ্ট গ্যালারী আছে। প্রার্থনার সময়, এখানে বসে প্রার্থনায় অংশ নেওয়া যায়। আর্মেনীয়ানরা গ্রীক মতাবলম্বী খ্রিস্টান সম্প্রদায়ভুক্ত। তাদের বিশেষত্ব এখানে যে ৬ই জানুয়ারীকে তারা বড়দিন হিসেবে পালন করে। অন্যান্য খ্রিস্টানদের দ্বারা এ বড়দিন ২৫শে ডিসেম্বর পালিত হয়।

হাসনাবাদের গির্জায় বেদীর বিপরীত দিকে একটি গ্যালারী আছে। গ্যালারী সংলগ্ন সিঁড়িটি কাঠের এবং রড সিমেন্টে তৈরী। সেন্ট থমাস গির্জায় সিঁড়ি আছে তবে এ সিঁড়ি দিয়ে গির্জার চূড়ায় পৌছে ঘন্টা দেওয়া যায়। এখানে কোন গালারী নেই।

লক্ষ্মীবাজারের হলিক্রস গির্জার সম্মুখে গাড়ী বারান্দা আছে, এর চূড়া বর্গাকার। এখানে একটি পাপ স্বীকার কক্ষ আছে। বাংলাবাজারের ব্যাপটিস্ট গির্জার প্রার্থনাকারীরা প্রটেস্টান্ট সম্প্রদায়ভুক্ত। জনসন রোডের গির্জার প্রার্থনাকারীরা ও প্রটেস্টান্ট সম্প্রদায়ভুক্ত। তবে প্রটেস্টান্টরা একই নিয়মরীতি পালন করে না। যেমন আরমানিটোলা গির্জায় বড়দিন ভিন্নভাবে পালিত হয়। সেন্ট টামাস গির্জার প্রটেস্টান্টদের সন্তানদের দীক্ষা দেওয়া হয় সন্তান জন্ম লাভের পরপরই এবং গির্জায় নিয়ে ব্যাপ্টিস্ট ফ্রন্ট পানি দিয়ে বিশপ নবজাতককে দীক্ষা দান করেন। অপরদিকে বাংলাবাজার গির্জায় নবজাতককে দীক্ষা দেওয়া হয় না। বরং সন্তানরা বয়ঃপ্রাপ্ত হলে তবেই তাদেরকে দীক্ষা দেওয়া হয়। সব খ্রিস্টানদের মাঝে দীক্ষা দান রীতি বিদ্যমান এবং ব্যাপ্টিস্ট ফ্রন্ট থেকে পানি দিয়ে বিশপ তা করেন। এসব পানির পাত্রগুলো প্রায় একই ধরণের।

ঢাকার গির্জাগুলোর মধ্যে ব্যতিক্রমী একটি বিষয় আছে। সেন্ট থমাস গির্জায় একজন মহিলা পুরোহিতের উপস্থিতি তা প্রমাণ করে। তাঁকে ফাদার বলা হয়। তবে গির্জা প্রধানকে বিশপ বলা হয়। বিশপের পরের স্থানে ফাদার অবস্থান করেন। বরিশাল জেলায়ও একজন মহিলা ফাদার আছেন বলে জানা যায়।

হাসনাবাদের গির্জাটি ঢাকার গির্জাগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় ও জাঁকজমপূর্ণ। এ গির্জায় গায়কদলের জন্য সংরক্ষিত অংশ সহ প্রার্থনাকারীদের জন্য সংরক্ষিত অংশ আছে। বেদীর ডানদিকে যীশুর একটি ভাস্কর্য সিরামিকে নির্মিত। ভাস্কর্যটি সাদা পোষাকে জড়ানো। এতবড় ভাস্কর্য অন্য কোন গির্জায় নেই। গির্জার সার্বিক অবস্থা দেখে মনে হয় প্রথম থেকেই এ গির্জা এলাকার অধিবাসীরা স্বচ্ছল ছিল।

ঢাকার গির্জাগুলোর মধ্যে ক্যাথলিক গির্জা গুলোর নাম ঃ জপমালা রাণীর গির্জা (আওয়ার লেডী অবদি হলি রোজারিও) ; জপমালা রাণীর গির্জা হাসনাবাদ ; সাধু নিকোলাস তলেন্তিনু গির্জা, নাগরী ; সাধু আন্তনির গির্জা; পাঞ্জোরা ; সাধু জোহানের গির্জা, তুমুলিয়া ; হলিক্রস গির্জা, লক্ষ্মীবাজার।

Dhaka University Institutional Repository

এছাড়া সেন্ট থমাস গির্জা, জনসন রোড, বাংলাবাজার ব্যাপ্টিস্ট গির্জা ; পুরান ঢাকার আরমানিটোলায় হলি রেসারেকশন গির্জা বা পবিত্র পুনরুত্থান গির্জা প্রটেস্টান্ট গির্জার অন্তর্ভুক্ত।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ক্যাথলিক, প্রটেস্টান্ট, গ্রীক সব খ্রিস্টানদের মধ্যে দীক্ষা দানের জন্য যে পানির পাত্র রয়েছে তা প্রায় একই রকম অর্থাৎ পাথরের (সাদা) তৈরী। যা অনেকটা বেসিনের মত দখতে।

এছাড়াও সাধু থমাস গির্জায় একজন মহিলা পুরোহিত বা ফাদার রয়েছে, যা একটি নতুন দৃষ্টান্ত। এছাড়া [illegible] বরিশালে একজন মহিলা পুরোহিত রয়েছে। সাধু থমাস গির্জার প্রধানকে বিশপ বলে। বিশপের পরের অবস্থানে আছেন ফাদার।

এছাড়াও হাসনাবাদ গির্জা বেদীর বিপরীত দিকে প্রার্থনাকারীদের জন্য যে গ্যালারী রয়েছে তা ঢাকার যে দু একটি গির্জায় রয়েছে (যেমন ঃ পুরান ঢাকার আর্মানিটোলা বা দ্যা হলি রেসারেকশন গির্জার গ্যালারী) সেটির তুলনায় অনেক বড়। সবকিছু মিলিয়েই গির্জাটি অনেক বড় এবং আকর্ষণীয়। প্রায় সোয়া দুইশত বৎসর পূর্বে নির্মিত এই গির্জাটি দেখে মনে হয় এ অঞ্চলের খ্রিস্টানদের আর্থিক অবস্থা সচ্ছল ছিল।

তেজগাঁয়ের যে জপমালা রানীর গির্জাটি রয়েছে সেটির সম্মুখের অংশটি অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণ এবং আকর্ষণীয় এবং বেদীর অংশটিও মনোরম। এই গির্জার একটি ব্যতিক্রমধর্মী বৈশিষ্ট হচ্ছে এর সম্মুখের প্রবেশপথ দিয়ে প্রবেশ করলে ডান এবং বা দিকে পুরু দেয়ালের মধ্যবর্তি অংশে সর্পিল সিড়ি এবং সিড়ি দিয়ে গির্জার সম্মুখে যে ছোট গম্বুজ রয়েছে তার অভ্যন্তরীণ অংশে পৌছা যায়।

নাগরীর গির্জা এবং এর পার্শ্ববর্তী গ্রাম পাঞ্জোরীর গির্জাটিতেও প্রার্থনা বেদীর উপরে যে মঞ্চ আছে তা কাঠের কারুকাজ করা এবং আকর্ষণীয়। এই মঞ্চে এ অঞ্চলের খ্রিস্টানদের আকর্ষণীয় ও অভিজাতপূর্ণ রুচির পরিচয় বহন করে। পাঞ্জোরী গির্জার সম্মুখ অংশও অত্যন্ত আকর্ষণীয়।

এছাড়া লক্ষীবাজারে সেন্ট গ্রেগরী গির্জাটির সম্মুখ অংশে বর্গাকার গাড়ী বারান্দা (Porch) রয়েছে এবং এর উপর বর্গাকার চূড়া রয়েছে। ঢাকার ক্যাথলিক গির্জাগুলোতে এই বৈশিষ্ট্যটি দেখা যায় না। এছাড়া এই গির্জার আরেকটি ব্যাতিক্রম ধর্মী বৈশিষ্ট্য রয়েছে তা হল এর পাপ স্বীকার কক্ষ। গির্জার মূল প্রবেশ পথ দিয়ে প্রবেশ করলে হাতের ডানদিকে ছোট একটি কক্ষ। কেউ পাপ করলে ফাদারের কাছে পাপ স্বীকার করলে তার পাপ মুক্তি হয়। এই কক্ষে একটি চেয়ারে পাপিকে বসান হয় এবং সামনে একটি সাদা কাপড় টাঙ্গান থাকে, তার অপর পাশে ফাদার বসেন।

ঢাকার গির্জা স্থাপত্যের তুলনামূলক আলোচনা করতে গিয়ে অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন, তা হল খ্রিস্টানদের গির্জাভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা। ক্যাথলিক, প্রটেস্টান্ট অর্থাৎ প্রতিটি শাখার খ্রিস্টানদের প্রায় প্রতিটি গির্জাকে কেন্দ্র করেই অত্র অঞ্চলে গড়ে উঠেছে খ্রিস্টানদের সমাজব্যবস্থা। অর্থাৎ গির্জা কেবল খ্রিস্টানদের ধর্মীয় ব্যাপরটিই নিয়ন্ত্রণ করে না, তাদের সামাজিক সাংস্কৃতিক ব্যবস্থা এমনকি বিচার ব্যবস্থাও গির্জাকে কেন্দ্র করেই পরিচালিত হয়। আর এসব কিছুই পরিচালনা করেন গির্জার প্রধান অর্থাৎ পুরোহিত, বিশপ কিংবা ফাদার।

Dhaka University Institutional Repository

কয়েকটি গ্রাম মিলে গ্রাম ভিত্তিক ছোট কমিটি, গির্জাকে কেন্দ্র করে কেন্দ্রীয় কমিটি তৈরী হয়। গ্রাম ভিত্তিক কমিটিতে সাধারণ বিচার করা হয়। আমীমাংসিত বিচার কেন্দ্রীয় কমিটিতে ফাদার বিচার সম্পাদন করেন। আবার গির্জার কেন্দ্রীয় কমিটিতে কোন বিচার সম্পাদন সম্ভব না হলে তবেই আদালতের স্মরণাপন্ন হওয়ার রীতি আছে। খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের বিয়ে গির্জাকে কেন্দ্র করেই সম্পন্ন হয়। বর পক্ষ এবং কনে পক্ষ গির্জায় আসে এবং ফাদার বর-কনের বিয়ে পড়ান। তারপর বরের বাড়ীর ভোজ উৎসব মদ্যপান গির্জাতেই সম্পন্ন করা হয়।

গির্জাকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা গির্জা কেন্দ্রীক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই সমাপ্ত করা সম্ভব। ঢাকার হলিক্রস স্কুল ; নাগরীর সেন্ট নিকোলাস হাই স্কুল, লক্ষ্মীবাজারের সেন্ট গ্রেগরী স্কুল গুলো বাংলাদেশের বিখ্যাত স্কুল গুলোর মধ্যে বিশেষ স্থান দখল করে আছে।

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

খ্রিস্টীয় প্রথম অব্দে জেরুজালেম প্রদেশের বেথেলহাম নামক গ্রামের এক আস্তাবলে মাতামেরীর ঘরে জন্ম হয়েছিল খ্রিস্ট ধর্মের প্রবর্তক মহাপুরুষ যীশু খ্রিস্টের। নানা প্রতিকূলতা পেরিয়ে খ্রিস্ট ধর্ম রাষ্ট্রীয় ধর্মের মর্যাদা লাভ করেছিল চতুর্থ (৩১৩ খ্রিঃ) শতকের প্রথমার্ধে।

সময়ের বিবর্তনে খ্রিস্ট ধর্ম বিশ্বাসীদের মধ্যে বিভেদ সৃস্টি হয় এবং খ্রিস্ট ধর্মে দুটি ভিন্ন শ্রেণীর উদ্ভব হয়ঃ ক্যাথলিক খ্রিস্টান এবং প্রটেস্টান্ট খ্রিস্টান।

ক্যাথলিক খ্রিস্টানরা গোড়াধর্মী। তারা কোন প্রকার সংস্কারে বিশ্বাসী নয়। অপরদিকে প্রটেস্টান্টরা সংস্কার পন্থী। অর্থাৎ ক্যাথলিক মণ্ডলীর ভুল-ভ্রুটির বিরুদ্ধে প্রটেস্ট বা প্রতিবাদ করতে গিয়ে এ শ্রেণীর উদ্ভব হয়। এছাড়া ব্যাপটিস্ট খ্রিস্টান, গ্রিক ধর্মমতাবল্বী ইত্যাদি বিভিন্ন খ্রিস্ট শ্রেণীর অস্তিত্বও দেখা যায়।

খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের প্রার্থনাস্থল গির্জা বা চার্চ (Church) নামে পরিচিত।

প্রথম দিকে যে ঘরগুলো পূজার কাজে খ্রিস্টান সম্প্রদায় ব্যবহার করত সেগুলোকে গির্জা বলা হত। পরবর্তীতে সেগুলোর ব্যবহার ব্যাপক আকার ধারণ করে। যেমন ঃ প্রাথমিকভাবে এগুলো বিশ্ব খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের উপাসনালয় বা গির্জা, জাতীয় অঞ্চলিক ব্রহ্মবিদ্যা বিষয়ক গির্জা, নিয়মনিষ্ঠ গ্রীক মৌলবাদী (গোড়া সম্প্রদায়ের গির্জা বা ইংল্যান্ডের গির্জা।

পরবর্তীকালে খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের তাদের বিভিন্ন ধরণের উপাসনার জন্য পাকাবাড়ী নির্মাণ করে। রোমে সম্রাট কনস্টেনটাইনের সময়ে সবচেয়ে পুরাতন গির্জার অস্তিত্ব পাওয়া যায়। তখন প্রথমবারের মত সমস্ত রাজ্যে উপাসনার জন্য গির্জা নির্মাণের অনুমতি দেয়া হয়।

গির্জার স্থাপত্যের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় গির্জাগুলো ছিল ব্যাসিলিকান (Basilican) বা খ্রিস্টান ব্যাসিলিকা। কারণ সেগুলোর নির্মাণশৈলী তৎকালীন রোম, পোম্পাই এবং অন্যান্য জায়গায় ব্যাঁসিলিকান অর্থাৎ লম্বা হল ঘরের আদলে তৈরী হত। যেখানে নৈতিক ও ব্যবসায়িক কাজ হত।

প্রাথমিক ব্যাসিলিকান গির্জাগুলোতে কেন্দ্রের চারদিকে বসার আসন থাকত। আসনগুলোর মধ্যে চলাচলের জন্য পথ ছিল। বৃত্তাকার আসনগুলির মধ্যে সরাসরি মোটা পিলারের অস্তিত্ব থাকত। দেয়ালের জানালাগুলোর উপরিভাগ ছিল গোলাকার, জানালার উপরিভাগে আলো জ্বালানোর জন্য কুলঙ্গী, পূর্ব প্রান্তে ধনুকাকৃতির খিলান দরজা, পশ্চিম প্রান্তে 'Narthex' বা প্রবেশ কক্ষ বা বারান্দা ছিল। রোমান আমলে এ ধরণের নকশা মাঝেমধ্যে প্রশস্ত খিলান দরজা ও তার উপর ল্যাটিন ক্রুশ বা ক্রুশবিদ্ধ নকশা সংযোজন করে করা হত। এ রীতি পশ্চিম ইউরোপীয় অঞ্চলে প্রচলিত ছিল। এ সময় রোমান ইউরোপীয় সম্প্রদায়ের পূর্ব ইউরোপীয় লম্বা কুলঙ্গী ছোট খিলান দরজার পরিবর্তে বাইজানটাইন ক্যাথলিক গির্জা পূর্ব ইউরোপে গ্রীক ক্রুশ কেন্দ্রে ১টি গম্বুজ ও চারিদিকে বারটি সমান বাহু খাজ বিশিষ্ট নকশার প্রচলন হয়।

ল্যাটিন শব্দ Cancelli থেকে Chancel শব্দের উৎপত্তি। এর অর্থ গির্জার পূর্ব পার্শ্বের অর্ধবৃত্তাকার যাজক বা পুরোহিতদের বসার স্থান বা নিরাপদ বেষ্টিত স্থান। প্রথম দিকে ব্যাসিলিকান খ্রিস্টানদের মধ্যে গির্জার পূর্ব প্রান্তের ধনুকাকৃতির বসার জায়গায় কয়েকসারি আসন থাকত। এ স্থানটি উচ্চ পদস্থ ধর্ম যাজকদের বেষ্টন করে পাদ্রীদের বসার জন্য ধর্মসভার জন্য নির্দিষ্ট ছিল। গির্জার সেবা কার্যক্রম বৃদ্ধির ফলে গায়কদল (Choir) ও

Dhaka University Institutional Repository

পাদ্রীদের (Clergy) বসার জন্য অতিরিক্ত জায়গার প্রয়োজন হওয়ায় গির্জার পূর্ব প্রান্তের ধনুকাকৃতির বসার জায়গা বাড়ান হয় এবং সামনের দিক পর্দা দিয়ে পৃথক করা হয়। প্রাথমিক অবস্থায় এ বর্ধিত স্থান মার্বেল পাথরে তৈরী করা হয়। পরবর্তীতে গোথিক 'traceried' কাঠের কাজ ছিল। এখানে সামনের জায়গাটুকু এক ধাপ নীচু করে নির্মাণ করে সভায় আগত জনগণকে পৃথক করে রাখা হয় যাতে জনগণ ও যাজকদের মধ্যে পার্থক্য দৃশ্যমান হয়। এ সময়ে জনগণ কেবল মূল বেদীটা দেখতে পারত।

Chancel কে অনেক সময় Choir (ঐক্যতান গায়ক মন্ডল) বলা হয়। যদিও ওয়েস্টমিনিস্টার এ্যাবেদের মত অনেক গির্জায় ঐক্যতান গায়ক মন্ডলী নেভে (Nave) স্থাপন করা হত এবং পরবর্তীতে আরো কিছু গির্জায় Choir পশ্চিম পাশের গ্যালারিতে স্থাপন করা হয়। শেষ অবধি ইংল্যান্ড গির্জার পূর্ব প্রান্তের রোমক ধাচের ধনুকাকৃতির ধারা বাদ দেয় এবং ১২০০ খ্রিস্টাব্দের পরবর্তীতে ইংল্যান্ডের প্রায় গির্জারই পূর্ব প্রান্ত বর্গাকার হয়ে যায়। যাজকদের জন্য বেদীতে বসার বেঞ্চও সপ্তদশ শতকের আগে কমই ব্যবহৃত হত এবং সংরক্ষিত আসন ব্যবস্থা ১৭০০-১৮০০ শতকের ঘটনামাত্র।

ইংল্যান্ডের বড় গির্জাগুলো যদিও ক্রুশবিদ্ধ যীশুর মুর্তি স্থাপন করত কিন্তু কিছু সংখ্যক ছোট গির্জা সেরকম ছিলনা। যেগুলোতে প্রায়ই পাত্রী যাজকদের বসার অর্ধবৃত্তাকার পূর্বপ্রান্তের জায়গা এবং কেন্দ্র থাকত। কিন্তু বারান্দার সরু চলার পথ (Aisles) অথবা প্রশস্ত পথ (Transept) থাকত না। আস্তে আস্তে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে গির্জার আয়তনও বৃদ্ধি পেয়েছে। সাধারণ একটি বা দুটি চলার পথ অথবা একটি বা দুটি বারান্দা (Porch) পশ্চিমে একটি বুরুজ (Tower) মাঝে মাঝে এক বা একাধিক প্রশস্ত পথ (Transept) তদুপুরি যাজকদের বসার জায়গা বর্ধনের জন্য পূর্বাংশের বর্গাকৃতি অংশ পরিবর্তন করে নরম্যান পদ্ধতির অর্ধবৃত্তাকার (Apse) পদ্ধতি ব্যবহার করা হত। যাজকদের মাঝেমধ্যে গণকীর্তনের জন্য দানশীল ব্যক্তি অথবা অনুশাসনকারী যাজক পল্লীর বাসিন্দাদের টাকায় বিশেষ কোঠা নির্মাণের ফলে যাজকদের বসার মূল আসন ও চলাচলের বড় রাস্তার মধ্যবর্তী কোনগুলো ভরাট হয়ে যেতো। এর ফলে গির্জার সম্পূর্ণ নকশা পরিবর্তিত হয়ে যায়।

গির্জার মাঝামাঝি পর্যায়ে দন্ডায়মান থাকত গির্জার মধ্যে দীক্ষা মন্ত্রের পানি পাত্র রাখার জন্য স্থায়ী স্তম্ভ। কিন্তু তখনো বাদ্যযন্ত্রটি প্রায় অপরিচিত ছিল। এমন কি ১৭শ খ্রিস্টাব্দে লন্ডনের গির্জায় উহা কদাচিৎ দেখা যেত। এ পর্যন্ত বর্ণিত সাধারণ গির্জাগুলো ছাড়াও বৃত্তাকার আকৃতির গির্জা ইংল্যান্ডসহ পশ্চিম ইউরোপীয় অঞ্চলে তৈরী করা হয়। এগুলো সাধারণতঃ সম্ভ্রান্ত বংশীয় সামরিক এবং ধর্মীয় সংঘের সদস্যরা নির্মাণ করেন। এগুলো জেরুজালেমের পবিত্র সমাধি স্তম্ভের উপর তৈরী গির্জার আদলে স্থাপিত হয়েছিলো।

১৬৬৬ খ্রিস্টাব্দে রোমানদের ধর্মীয় ব্যবস্থাপনা ও প্রচলিত গোথিক রীতি বর্জন করে সম্পূর্ণ একটি নতুন ধর্মীয় স্থাপত্য ধারা প্রচলন করেন। এভাবে প্রটেস্টান্টদের দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে লন্ডনের গির্জাগুলির নকশা অবলম্বনে নতুন গির্জা স্থাপত্য গড়ে উঠে এবং কারুকার্যময় নকশা সম্বলিত গির্জাগুলির গ্যালারী স্থাপন করার রীতি প্রচলিত হয়। ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সময় সমবেত জনগণের কাছে প্রচারকের কণ্ঠস্বর পৌছানোর উদ্দেশ্যে এ ধরনের গির্জার নকশা তৈরী করা হয়েছিল এবং এ ধারা উনবিংশ শতকের প্রথমকাল পর্যন্ত অনুসৃত হয়েছিল। তবে ১৭২০-১৮০০ পর্যন্ত খুব কম গির্জাই নির্মিত হয়েছে।

১৪৯৮ খ্রিস্টাব্দে ভাস্কো-দা-গামার জলপথ অবিস্কারের মধ্য দিয়ে ভারত উপমহাদেশে বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে ইউরোপীয় বণিকদের আগমন ঘটে এবং ইউরোপীয় বণিকদের মধ্যে পর্তুগীজরাই প্রথমে আসে এ উপমহাদেশে। পর্তুগীজ বনিকরা যেমন এ উপমহাদেশে প্রথম আসে এবং বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করে, তেমনি গির্জাও প্রথম তারাই স্থাপন করে। আর তাই স্বভাবতই ধরে নেওয়া যায় তারাই প্রথম খ্রিস্টান ধর্ম প্রচার শুরু করে।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলার খ্রিস্টান পুরোহিতদের দ্বারা বা ধর্মপ্রচারকদের দ্বারা ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দিকে খ্রিস্টান ধর্মের সূচনা হয়।

ঢাকায় গির্জা স্থাপত্যের সূচনার সঠিক তারিখ জানা না গেলেও স্থাপত্যে উৎকীর্ণ লিপি থেকে জানা যায় যে ষষ্ঠদশ শতাব্দীতে মাহমুদ শাহের রাজত্ব কালে প্রথম এ দেশে পর্তুগীজদের আগমন ঘটে অর্থাৎ এর পরবর্তী সময়ে গির্জা নির্মিত হয়। প্রথম ক্যাথলিক গির্জা নির্মিত হয় ঢাকায়, সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে।

ঢাকা ছিল খ্রিস্টানদের মহাধর্ম প্রদেশ । অর্থাৎ কোন ধর্মযাজকের শাসনাধীন এলাকা নিয়ে গঠিত অঞ্চলকেই মহাধর্ম প্রদশে বলা হয়। যেমন ঃ ঢাকার মহাধর্ম প্রদশের অধীনে রয়েছে তেজগাঁও, লক্ষীবাজার, নাগরী, তুমুলিয়া, রাঙ্গামাটি, হাসনাবাদ, গোয়া, মাউসাদ ইত্যাদি ধর্মপল্লী। ঢাকায় প্রথম গির্জা সপ্তদশ শতকের গোড়ার দিকে নির্মিত হলে এ উপমহাদেশে প্রথম গির্জা নির্মিত হয় চট্টগ্রামে ১৫৯৯ খ্রিস্টাব্দে। মনে করা হয়, ঢাকায় প্রথম গির্জাটি নির্মিত হয় নারিন্দায় ১৬২৮ খ্রিস্টাব্দে। কিন্তু বর্তমানে গির্জাটি ধংসপ্রাপ্ত।

গাজীপুর জেলাধীন ভাওয়াল অঞ্চলের নাগরীর সাধু নিকোলাস তলেন্তিনো গির্জাটিকে এর পরবর্তী গির্জা বলে উল্লেখ করা যায়। কারণ নাগরীর এ গির্জার নির্মান সন হিসেবে '১৬৬৩' খ্রিস্টাব্দের উল্লেখ পাওয়া যায়। বর্তমানে দন্ডায়মান গির্জাটি চুন সুরকী বা স্থায়ী উপাদানে নির্মিত হলেও প্রাথমিক অবস্থায় গির্জাটি অস্থায়ী উপাদান বা ছন দ্বারা নির্মিত ছিল। গির্জাটি পর্তুগীজদের দ্বারা নির্মিত হয়েছিল।

এ অঞ্চলে আরো দুটি পুরাতন গির্জা রয়েছে। তুমুলিয়ায় সাধু যোহানের গির্জা এবং পাঞ্জোরার গির্জিকা বা ছোট গির্জা । দুটো গির্জাই পর্তুগীজদের দ্বারা নির্মিত। এ গির্জা দুটি যথাক্রমে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এবং শেষার্ধে নির্মিত হয়েছিল। প্রাথমিক অবস্থায় মাটির দেয়াল ও ছনের ছাউনী দ্বারা নির্মিত হলেও বর্তমানে পাকাভাবে স্থায়ী উপাদানে নির্মিত হয়েছে।

ঢাকার তেজগাও অঞ্চলে রয়েছে হলি রোজারী বা জপমালা রাণীর গির্জা। গির্জাটি ১৬৬৭ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত বলে জানা যায়। ঢাকার অদূরে নবাবগঞ্জের হাসনাবাদে রয়েছে অষ্টদশ শতাব্দীর শেষার্ধে নির্মিত বৃহদাকার অপরূপ বর্ণীল জপমালা রানীর গির্জা। ঢাকার অদূরে এতসুন্দর একটি গির্জা আছে ওখানে না গেলে অজানাই থেকে যেতো। পুরান ঢাকার লক্ষীবাজার অঞ্চলে রয়েছে হলি ক্রশ গির্জা। উপরে উল্লেখিত প্রতিটি গির্জাই ক্যাথলিক গির্জা।

এছাড়া পুরান ঢাকার জনসন রোডে রয়েছে সেন্ট থমাস গির্জা, বাংলাবাজারে ব্যাপ্টিস্ট গির্জা। এ দুটো গির্জাই প্রটেস্ট্যান্ট গির্জা। ব্যাপ্টিস্টরাও প্রটেস্টান্ট। এছাড়া একটি উল্লেখযোগ্য গির্জা হচ্ছে পুরান ঢাকার আর্মানিটোলায় 'হলি রেসারেকশন গির্জা' বা পবিত্র পুনরুত্থান গির্জা। গির্জাটি আর্মানিটোলা গির্জা হিসেবে পরিচিত।

আর্মেনিয়ানরা নিজেদের ভাগ্য লাতে ব্যবসায়িক প্রয়োজনে ঢাকার এ অঞ্চলে এসে বসতি স্থাপন করলে এ অঞ্চলের নাম হয় আর্মানিটোলা। এ গির্জার ধর্মামতবলম্বীরা গ্রীক ধর্মের অনুসারী।

এছাড়াও রয়েছে ঢাকার আমপট্টিতে ক্যাথলিক গির্জা-ভক্তিরানীর গির্জা। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে নির্মিত গির্জাটি বর্তমানে আর নেই। এখানে একটি ধর্মাশ্রম চালু করা হয়েছে।

ঢাকার বিভিন্ন স্থানে আরও নতুন কিছু গির্জা নির্মান করা হয়েছে। তবে এ গবেষণা কর্মের শিরনামে উল্লেখিত সময়কালের মধ্যে এ গির্জাগুলো পড়ে না বিধায় আলোচনায় সেগুলোকে আনা হয়নি।

গির্জাগুলোর বৈশিষ্ট্য আলোচনার প্রেক্ষিতে প্রথমে এর মূল প্রবেশ পথের কথা বলা যায়। খ্রিস্টানদের কাছ থেকে জানা যায় তাদের প্রার্থনার কোন নির্দিষ্ট দিক নেই। কিন্তু গির্জার উৎপত্তির ইতিহাস আলোচনা করতে গিয়ে দেখা যায় প্রাথমিক অবস্থায় গির্জার প্রার্থনা বেদী থাকত পূর্বপ্রান্তে অর্থাৎ মূল প্রবেশ পথটি থাকত পশ্চিম দিকে।

বর্তমানেও এ ধারাটিই দেখা যায়। তবে কিছু কিছু গির্জায় যেমন নাগরী, পাঙ্গোরা গির্জার মূল বেদীটি দক্ষিণ দিকে। এগুলোর প্রবেশপথ উত্তর দিকে। মূল বেদীটি অর্ধবৃত্তাকার, বর্গাকার এবং ধনুকাকৃতির দেখা যায়।

এছাড়া গির্জার অভ্যন্তরের গির্জার মূল অংশ বা প্রশস্ত পথ (Transept) এবং সরু খিলান পথ (Asile) দেখা যায়। এ বৈশিষ্ট্য মসজিদেও দেখা যায়। এছাড়া প্রতিটি গির্জার বেদীতে রয়েছে যীশুর ক্রুশবিদ্ধ প্রতীক ভাস্কর্য। প্রটেস্টান্ট গির্জায় ক্রুশ কিংবা ক্রুশবিদ্ধ ছবি ছাড়াও প্রায় প্রতিটি গির্জায় রয়েছে ব্যাপটিস্ট ফ্রন্ট বা দীক্ষা পাত্র, যে পাত্রে দীক্ষা দানের জন্য পানি রাখা হয়।

বাহ্যিকভাবে গির্জার প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এর পবিত্রতার প্রতীক ক্রুশ চিহ্ন ।

আর আকর্ষনীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ত্রি-কোনাকার নকশাকৃত অংশ (Pediment), এ অংশকে ত্রি-তত্ত্ববাদের প্রতীক বলা হয়। এটাই গির্জার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ।

তবে যে বিষয়টি বিশেষভাবে উল্লেখ্য, তা হল প্রটেস্টান্ট গির্জায় কোন ত্রি-কোনাকার নকশাকৃত অংশ নেই।

প্রটেস্টান্ট গির্জায় আরও একটি ব্যতিক্রম ধর্মী বৈশিষ্ট্য রয়েছে, তা হল এ সকল গির্জায় কোন মূর্তি বা ভাস্কর্য থাকে না। কেবল যীশুর ক্রুশ বিদ্ধ অবস্থা এবং শেষ ভোজ দৃশ্য চিত্র দুটি বিশেষভাবে শোভা পায়।

ক্যাথলিক গির্জাগুলোতে 'Grotto' বা গুহা থাকে । গির্জার সম্মুখের দিকের এ গুহা পাথরের নির্মিত এবং এ গুহা প্রতিকী গুহা। বার্নারেড নামক এক মেয়েকে যীশু দর্শন দিয়েছিলেন। সে ঘটনাকে স্মরণ করে ক্যাথলিক খ্রিস্টানরা এ গুহা নির্মাণ করে।

পরিশেষে এ বিষয়টি উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, খ্রিস্টানদের উপাসনালয় গির্জা কেবল ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে ধর্মীয় দিকই নিয়ন্ত্রণ করেনা, খ্রিস্টানদের সামাজিক, শিক্ষা, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও ব্যাপক ভূমিকা রাখে। বলা যায় গির্জাকে কেন্দ্র করেই খ্রিস্টানদের সামাজিক ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। প্রতিটি গির্জাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছেতাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ। এছাড়া সামাজিক বিচার, শালিশ, বিবাহ সবকিছুই গির্জা প্রধানের নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি

বাংলা গ্রন্থ

১। আহমেদ, খাজা নিজামউদ্দিন; তবকত-ই-আকবরী, আহমেদ আব্দুল ফজল কর্তৃক অনুদিত-বাংলা একাডেমী, ঢাকা, অক্টোবর ১৯৭৮, Vol-(i)(ii)

২। আহমেদ, শরীফ উদ্দিন; ঢাকার ইতিহাস ও নগর জীবন (১৮৪০-১৯২১) একাডেমী প্রেস এন্ড পাবলিকেশনস লিঃ ঢাকা ~~ফেব্রু~~ ২০০১।

৩। আহমেদ, সুলতান; প্রত্নতত্ত্বের পরিভাষা। বাংলা একাডেমী, ঢাকা.

৪। ইসলাম, সিরাজুল; বাংলাদেশের ইতিহাস (১৭০৪-১৯৭১), ৩য় খন্ড (সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস) এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বাংলাদেশ, ডিসেম্বর ১৯৯৩।

৫। ইসলাম, রফিকুল; ঢাকার কথা (১৫১০-১৯১০) ঢাকা, ১৯৮২।

৬। করিম, আব্দুল; ঢাকাই মুসলিন ঢাকা, ১৯৯০।

৭। ক্লেন আর্থার লয়েড; ক্লের ডায়রী; অনুবাদ ফজলুল করিম।

৮। খান, কে এম রাইস উদ্দিন; বাংলাদেশের ইতিহাস পরিক্রমা, ৬৭ প্যারিচাঁদ রোড, ১ম প্রকাশ, নভেম্বর ১৯৮৬, ৪র্থ সংস্করণ, ১৯৯৩।

৯। খাতুন, হাবিবা; জাহান, শাহনাজ হুসনে; ঈসা খাঁ, সমকালীন ইতিহাস, বংশাই, ১৩৯, ঢাঃবিঃ মার্কেট, জুলাই, ২০০০।

১০। খবীর, আহমেদ মীর্জা; শতবর্ষের ঢাকা, জোনাকী প্রিন্টিং, মিশন রোড, নভেম্বর ১৯৯৫।

১১। গুপ্ত, প্রেমময় দাস; বাবর নামা, কলকাতা, ১৯৮২।

১২। গুপ্ত, নির্মল; ঢাকার কথা, কলকাতা, ১৯৬০ (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ লাইব্রেরী কলকাতা)।

১৩। পন্ডিত, দিলীপ; বাংলাদেশের খ্রিস্টীয় মন্ডলীর ইতিহাস, চাঁদপুর, কুমিল্লা, খ্রিস্টিয়ান লিটারেচার সেন্টার, ১৯৮৫।

১৪। বসু, হরিদাস; ঢাকার কথা, ঢাকা, ১৯২৪।

১৫। বেগম নূরুন নাহার; মানুষের ইতিহাস, মধ্যযুগ, প্রথম অংশ, লেখা প্রকাশনী, ঢাকা, ডিসেঃ ১৯৮৩।

১৬। এফ, বি, ব্রাডলী বার্ট; প্রাচ্যের রহস্যময় নগরী (রহিম উদ্দিন অনুদিত), ঢাকা ১৩৭২

১৭। ভদ্র, নবীন চন্দ্র; ভাওয়ালের ইতিহাস, ঢাকা, ১৮৭৫

১৮। মজুমদার, কেদার নাথ; ঢাকার বিবরণ, ঢাকা, ১৯১০।

১৯। মামুন, মুনতাসীর; ঢাকা স্মৃতি বিস্মৃতির নগরী, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯০।

২০। মামুন, মুনতাসীর; পুরানো ঢাকার ঘরবাড়ী, পুরানো ঢাকা, উৎসব ও ঘরবাড়ী, ঢাকা, ১৯৮০।

২১। মামুন, মুনতাসীর; ঢাকার আদি মুদ্রণ, ঢাকার সাংস্কৃতিক ইতিহাসের উপাদান, ঢাকা, ১৯৯১।

২২। রায়, জোতিন্দ্র মোহন; ঢাকার ইতিহাস, কলকাতা ১৯১৩ (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ লাইব্রেরী, কলকাতা)।

২৩। রহমান, মুহাম্মদ, মোখলেছুর ; স্থাপত্য পরিভাষা, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, জুন, ১৯৯৪।

২৪। শাহনাওয়াজ, এ কে এম; বিশ্ব সভ্যতা, প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা, ডিসেম্বর, ১৯৯৭।

২৫। সেন পরিতোষ; বঙ্গে খ্রিস্ট মন্ডলী, ঢাকা, ১৯৮২।

২৬। হোসান, নাজির; কিংবদন্তীর ঢাকা, ঢাকা, ১৯৭৬।

২৭। জাকারিয়া, আ ক ম; বাংলাদেশের প্রত্ন সম্পদ, বাংলাদেশে শিল্পকলা একাডেমী, ১৯৮৪।

২৮। তায়েশ, মুনশী রহমান আলী; ডক্টর আ ম স, শরফুদ্দীন কর্তৃক অনুদিত, তাওয়ারিখে ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা, ১৯৮৫।

২৯। টেলর, জেমস, কোম্পানী আমলে ঢাকা (আনিসুজ্জামান কর্তৃক সম্পাদিত)। বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৮

৩০। ডয়লী, চার্লস, ঢাকার প্রাচীন নিদর্শন, ঢাকা একাডেমী পাবলিশার্স, ১৯৯১।

বাংলা পত্রিকা ও বিশ্বকোষ

১। ইতিহাস পরিষদ পত্রিকা, অষ্টাবিংশ শতবর্ষ ১ম-৩য় সংখ্যা, ১৪০১ হরপ্পা মুদ্রন, ওয়ারী, ঢাকা-১৯৯৬

২। ইতিহাস, তৃতীয় খন্ড, ভাদ্র-কার্ত্তিক, ১৩৫৯ বঙ্গাব্দ, শ্রী যদুনাথ সরকার এবং শ্রী ডি আর তালওয়ার কাজ, পর্তুগীজ হতে অনুদিত।

৩। বাংলা বিশ্বকোষ, দ্বিতীয় খন্ড, ব্যাঞ্চনবর্ন (ক-দ) দ্বৈপায়ন, নওরোজ, কিস্তিবিতান, ঢাকা, গ্রীনবুক হাউজ লিমিটেড, ১৯৭৫, ঢাকা প্রকাশ, ১৯৬৯।

৪। ঢাকা প্রকাশ, ১৮৬৩-১৯০০

৫। জেরোম ডি, কাস্তা; ঢাকার ঐতিহাসিক গির্জা, রোববার তৃতীয় বর্ষ, ছত্রিশতম সংখ্যা, ১৯৮১।

৬। মোঃ শামসুল হক, জপমালা রানীর গির্জা, তেজগাঁও, একটি পর্যালোচনা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, অক্টোবর, ১৯৮৬।

৭। মোঃ আব্দুল কাইউম, বান্ধব, দ্বিতীয়, বঙ্গদর্শন, উনিশ শতকের ঢাকায় সাহিত্য ও সংস্কৃতি, ঢাকা-১৯৯০।

৮। আমাদের গ্রাম ঃ হাসনাবাদ তার নাম, প্রতিবেশী বড়দিন ও জয়ন্তী সংখ্যা, ১৯৮০।

৯। আন্তনী ফি রোজারিও, হাসনাবাদ গির্জা প্রতিষ্ঠা ও খ্রিস্টান সমাজের ক্রুশ বিকাশ, সাপ্তাহিক গজত-জনতা, ঢাকা ১২ই অক্টোবর, ১৯৮৭।

১০। স্বর্গমত ঃ ১-১৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৯, ১৯৩ সংখ্যা।

স্মরণীকা

১। হাসনাবাদ ধর্ম মন্দির প্রতিষ্ঠার দুইশত বৎসর পূর্তি অনুষ্ঠান স্মরণিকা (১৬৬৬-১৯৭৭), হাসনাবাদ, ৭ই অক্টোবর, ১৯৭৭, এন্টনী বিমল গাঙ্গলী।

২। স্মরনিকা, ঢাকা ব্যাপ্টিস্ট চার্চের নব - নির্মিত গির্জা ঘর – উদ্বোধন – ৩০ শে মার্চ, ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দ – ১৬ই চৈত্র, ১৪০৩ বঙ্গাব্দ।

৩। স্মরণিকা, খ্রিস্ট জন্ম জয়ন্তী, ২০০০, লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা-২০০০।

ইংরেজী বই

1. Ahmed, Nazimuddin, **Buildings of the British Raj**, Unive: Press, Nov. 1996.

2. Ahmed, Nazimuddin, **Discover the moments of Bangladesh**, University Press, Dhaka.

3. Ahmed, Nazimuddin, **Mughal Dacca and the Lalbagh Fort**, Dacca.

4. Ahmed, Sharif Uddin, **Urban Problems and Government Policies : A Case Study of the City of Dacca**, 1810-1830, in K. Ballhatchet and J. Harrison (eds). The City in South Asia Pre-Modern and Modern, London, 1980.

5. Ahmed, Sharif Uddin, **Dacca**, London, 1986

6. Allen, B. C., **Eastern Bengal District Gazatteers**, Dacca, Vol-V, Allahabad, 1912.

7. Azam, K.M., **The Panchayat System of Dacca**, Dhaka, 1911.

Dhaka University Institutional Repository

8. Bion, Rev.;R. **Report on the Dacca and Bengal (Baptist) Mision for the year 1972 Calcutta**, 1872 (Calcutta National Library)

9. Beveridge,' **Akbarnama (Eng. Translation)** Calcutta, 1903.

10. Campus, J.J.A.;**History of the portages in Bengal**, Delhi, 1979.

11. Cresswell, E.A.C.;**Early Muslim Architecture**, Part One, Umayyads A.D. 622-750, University Press Oxford (1909)

12. Dani, M.H. **Dacca, A record of its changing Fortune** (revisived edn.) Dacca, 1962.

13. Gupta, Nirmal Kumar,' **Dacca, Old and New, Dacca**, 1940 (Bangiya Sahitya Parisad Library, Calcutta).

14. Haider, Azimusshan,' **Dacca, History and Romance in Place Names, Dacca, 1967 (Dacca Municipality Record Room) (ed) A City and its Civic Body, A Souvenir to Mark the Centenary of Dacca Municipality (Published by Dacca Municipality)**, Dacca 1966 (DMRR).

15. Hasan, Sayid Aulad,' **Notes on the Antiquities of Dacca**, Dacca, 1912.

16. Hastings, James,' **Encyclopedia of Religion and Ethics**, New York.

17. Husaen, Syed,' **Echoes from Old Dacca**, Calcutta, 1908.

18. Karim, Abdul,' **Dacca The Mughal Capital**, Dacca, 1964.

19. Luhani, G.A.K.;**Dacca Past and Present (India Office Tract)** Allahabad, 1911.

20. Majumdar, R.C.,'**Glimpses of Bengal in the Nineteenth Century**, Calcutta, 1960.

21. Miraca E Lieade,'**Ency. of Religion**, Vol-11, New York, 1987

22. North field, H.D.;**Misoin Work in Dacca**, London, 1938.

23. Father Poulirus Cortes,;**The Catholic Church in Indian Sobcontinent**, 1990, Dhaka.

24. Rahim, M.A.;**The History of the University of Dacca**, Dhaka, 1980.

Dhaka University Institutional Repository

25. Rizvi, S.N (ed); **Bangladesh District Gazetteers**, Dacca, Dacca 1975. Report of the St. Greogery School, Dacca.

26. Rahim, A.; **Social Cultural History of Bangladesh**, Karachi, Pakistan Historical Society, Vol-I, 1963 and Vol-II, 1967.

27. Sarkar, J.N. (ed); **History of Bengal**, Vol-2, Dhaka-1948

28. Soddy, Gordon; **Baptists in Bangladesh**, Dacca, 1948-1978, Moghbazar. Dhaka - 1978.

29. Taylor, James; A, **Sketch of the Topography and Statistics of Dacca**, Calcutta, 1940.

উর্দু ও ফারসি ভাষায় লিখিত গ্রন্থ

1. Abul Fazl; **Akbarnama**, III (tr. by H. Beveridge), London, 1902.

2. Hakim, Habibur Rahman; **Dhaka Pachas Baras Pahle (Dhaka Fifty Years Age)** Lahore, 1949 (Dacca University Library), বাংলা অনুবাদ, হাশেম সুফী, ঢাকা, ১৯৯৫।

3. Asudgani-i-Dhaka **(Sketches of Social Life of Dhaka) Dacca**, 1942 (Dacca University Library, Dacca), বাংলা অনুবাদঃ আকরাম ফারুখ ও আ ন ম রুহুল আমীন চৌধুরী, ঢাকা, ১৯৯১।

4. Munshi Rahman Ali Ta ish; **Tarikh-i-Dhaka (History of Dhaka)** ed, by Dr. Ahmed Ali Arrah, 1910.

5. Nathan, Mirza; **Bahristan-i-Ghaybi** (tr. by M.I. Borah) Gauhati, Assam, 1936.

400114

Articles in English

1. H.Hostin, S.I.; **The Bandel Chinsira Church Register** (1757-1915) Bengal Past and Present, Vol-XI, July-Dec 1915, Serial No 21-22.

2. N. K. Bhattasali; **The English Factory at Dacca**, Bengal Past and Present, Vol-XXXIII, 65-66, Jan-June, 1949.

3. Quated by H. Hostin, **A Week at bandil Convent, Hugli, Bengal Past and Present**, Journal of the Calcutta of Historical Society, Vol-X, Part-I, Jan-March 1915, 19.

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

তেজগাঁও-জপমালা রাণীর গির্জা

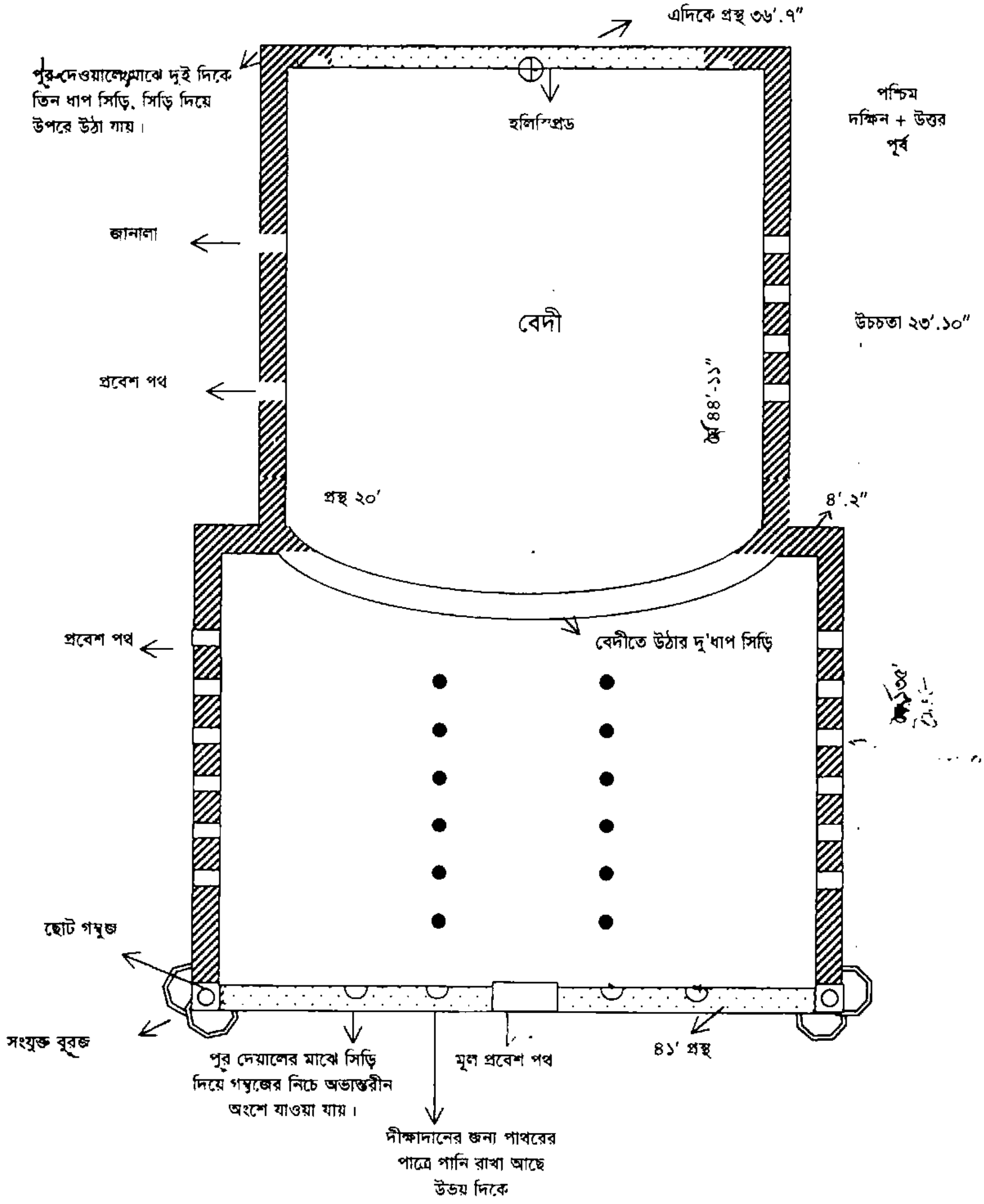

ভূমি নকশা (স্কেলমত নয়)

Dhaka University Institutional Repository

সেন্ট নিকোলাস তলেন্তিনো গির্জার

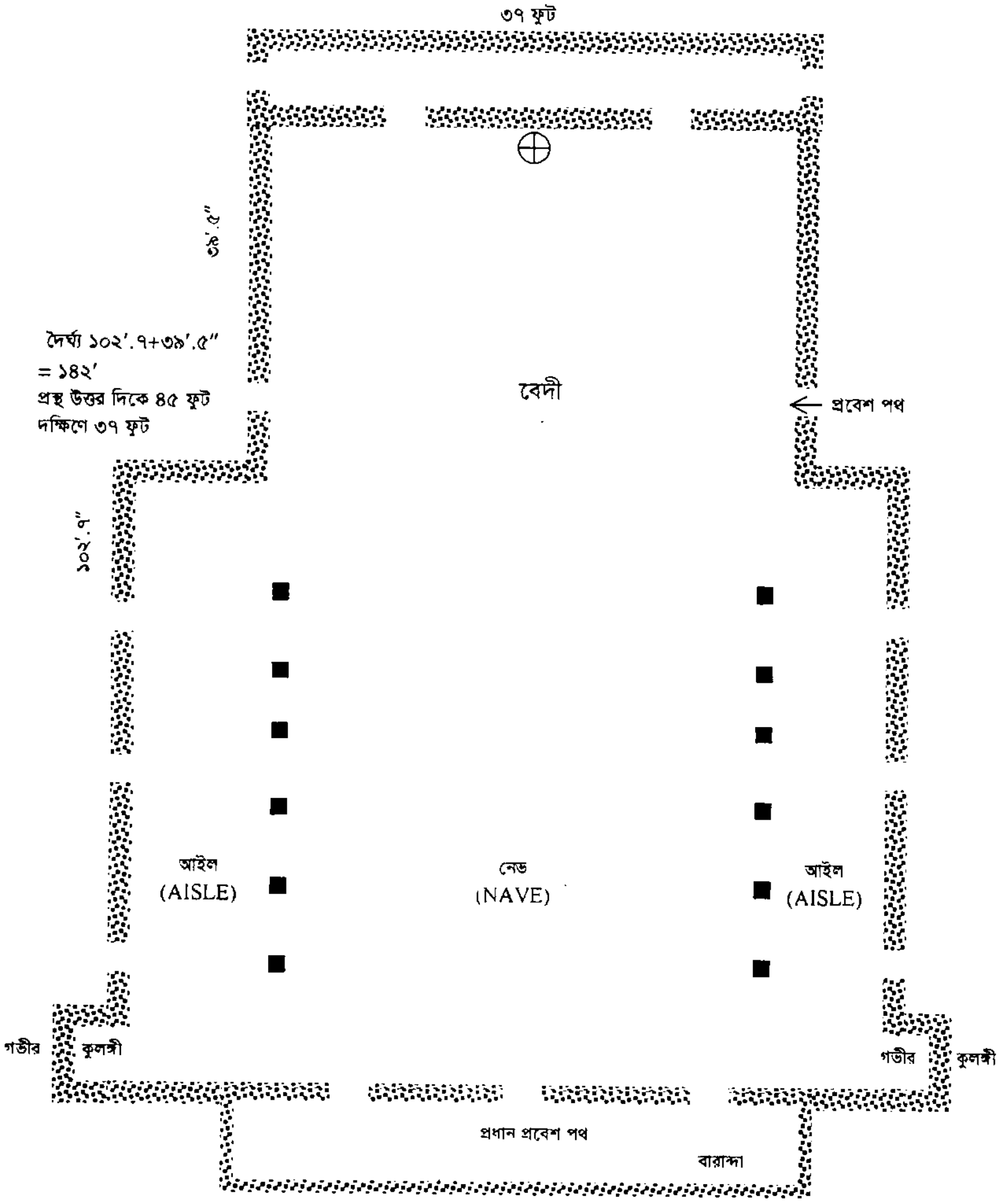

ভূমি নকশা (স্কেল মত নয়)

Dhaka University Institutional Repository

জপমালা রাণীর গির্জা
হাসনাবাদ

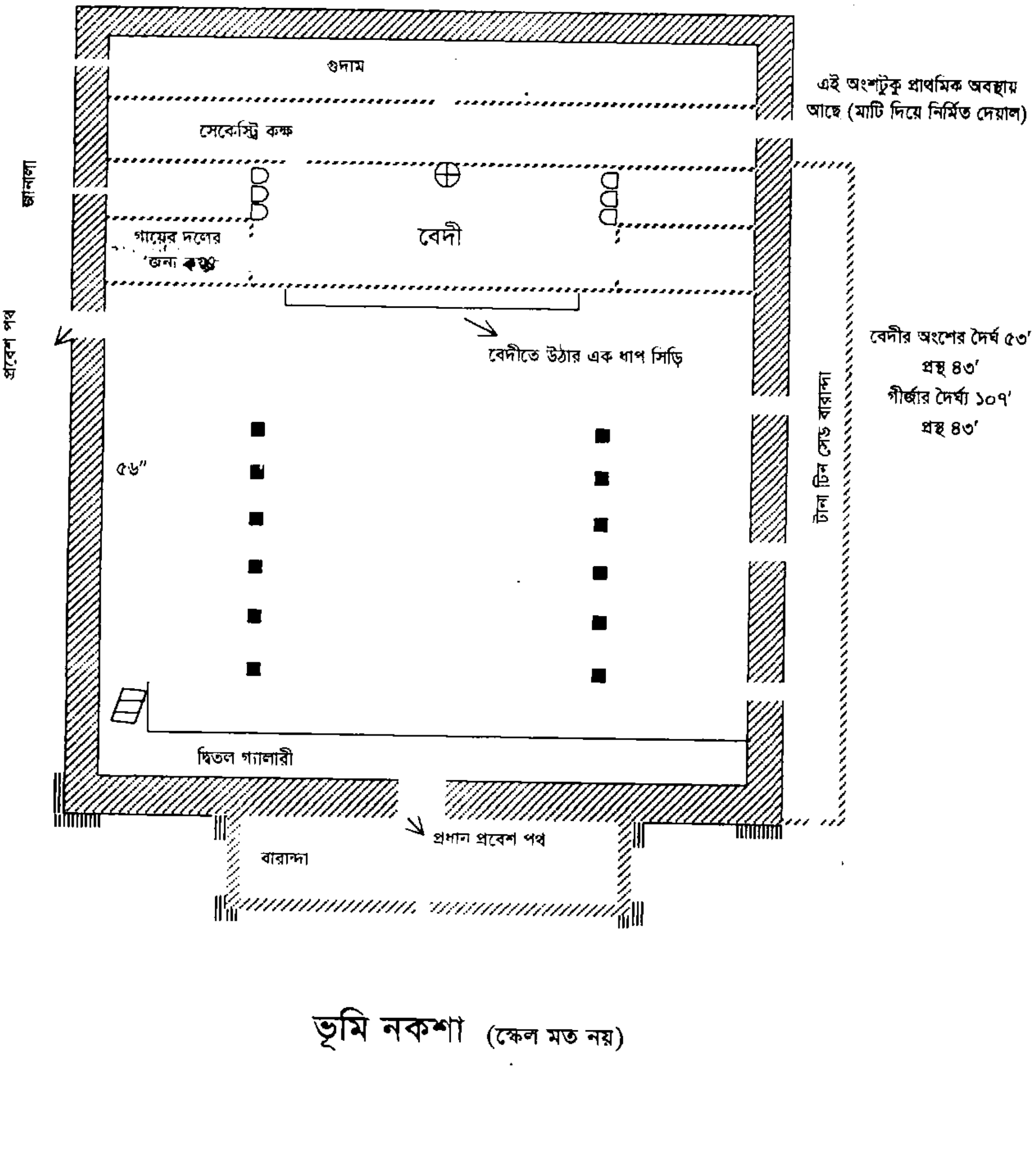

ভূমি নকশা (স্কেল মত নয়)

সেন্ট থমাস গির্জা

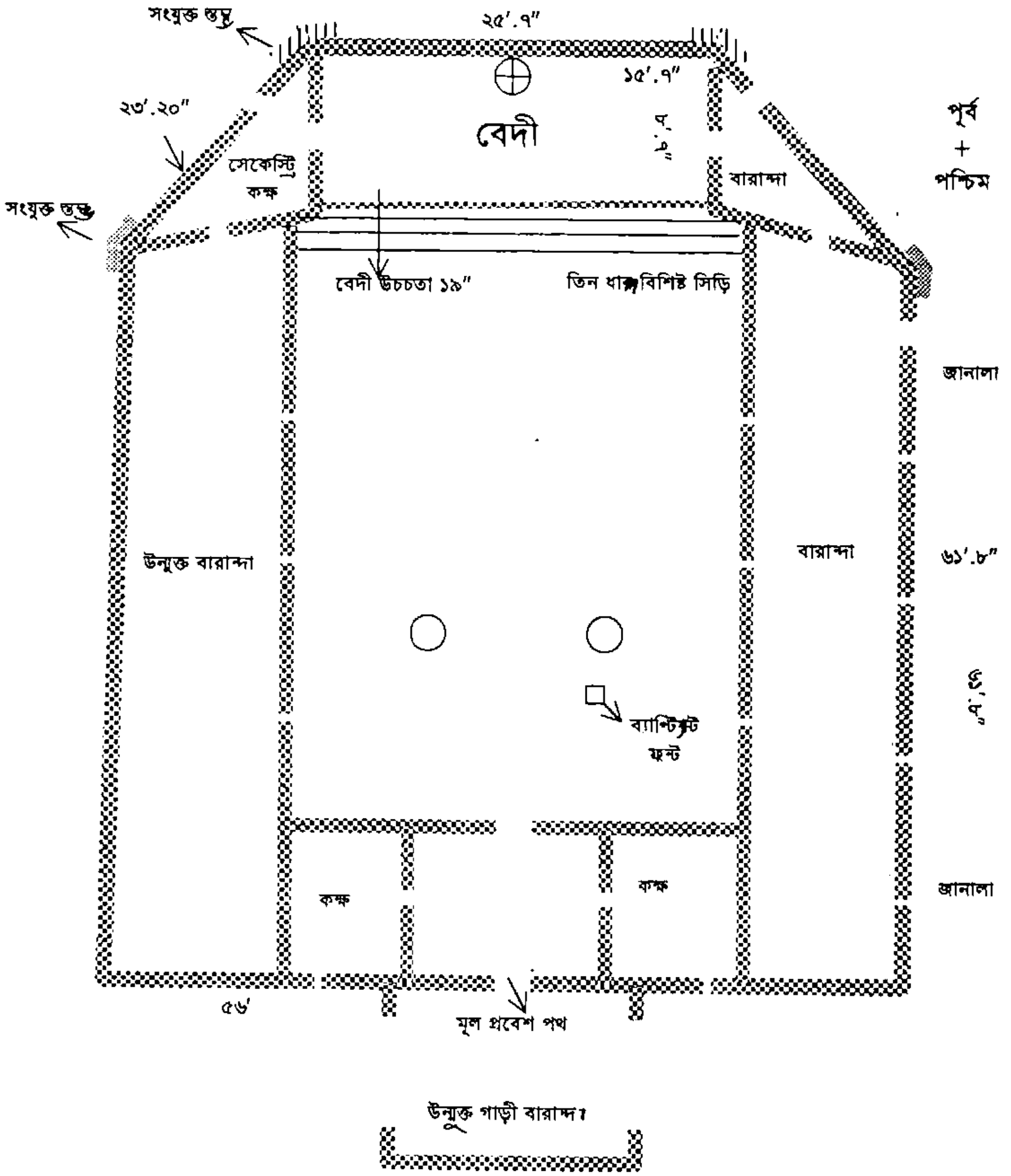

ভূমি প্রকল্প (স্কেল মত নয়)

Dhaka University Institutional Repository

সাধু যোহানের গির্জা
তুমুলিয়া

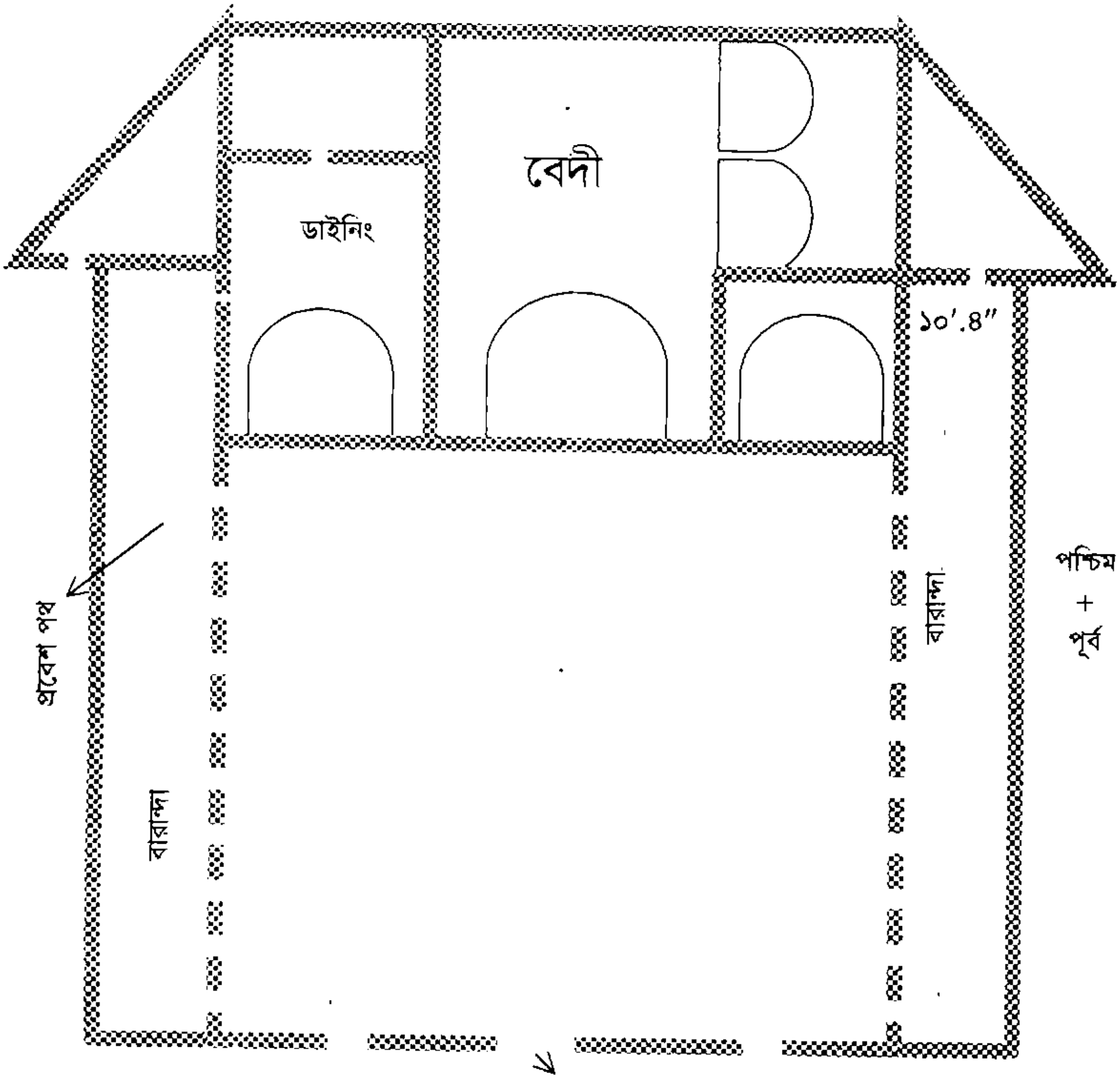

ভূমি নকশা (স্কেল মত নয়)

হলিক্রশ গির্জা

লক্ষীবাজার

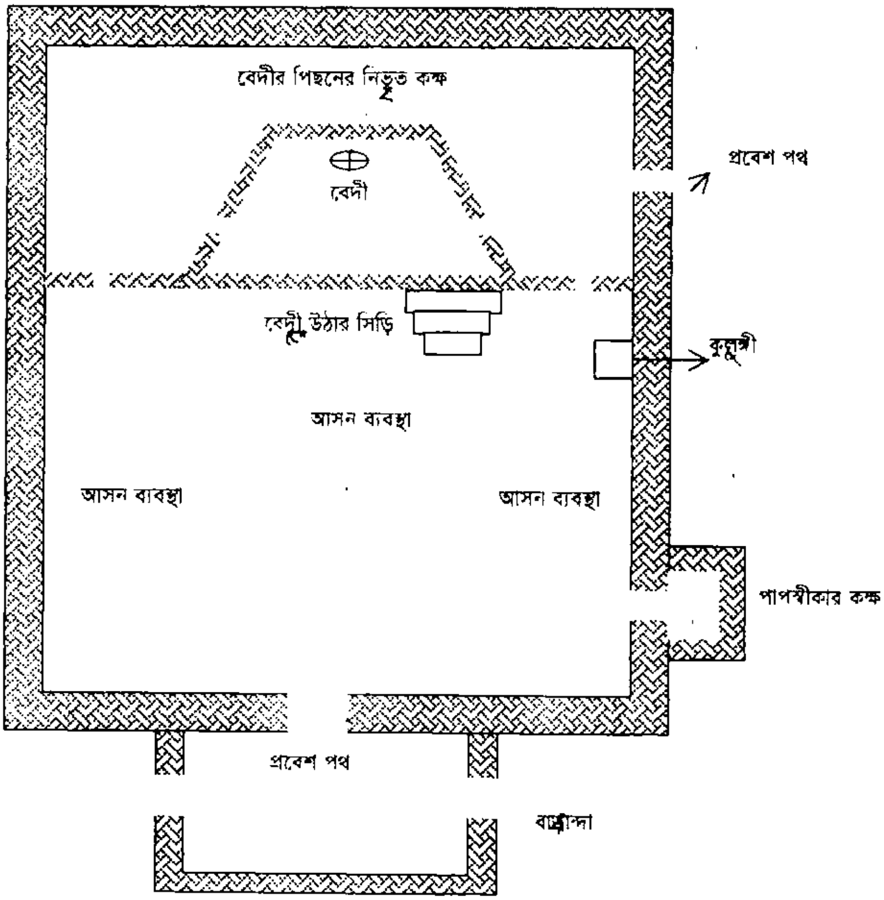

ভূমি নকশা (স্কেল মত নয়)

Dhaka University Institutional Repository

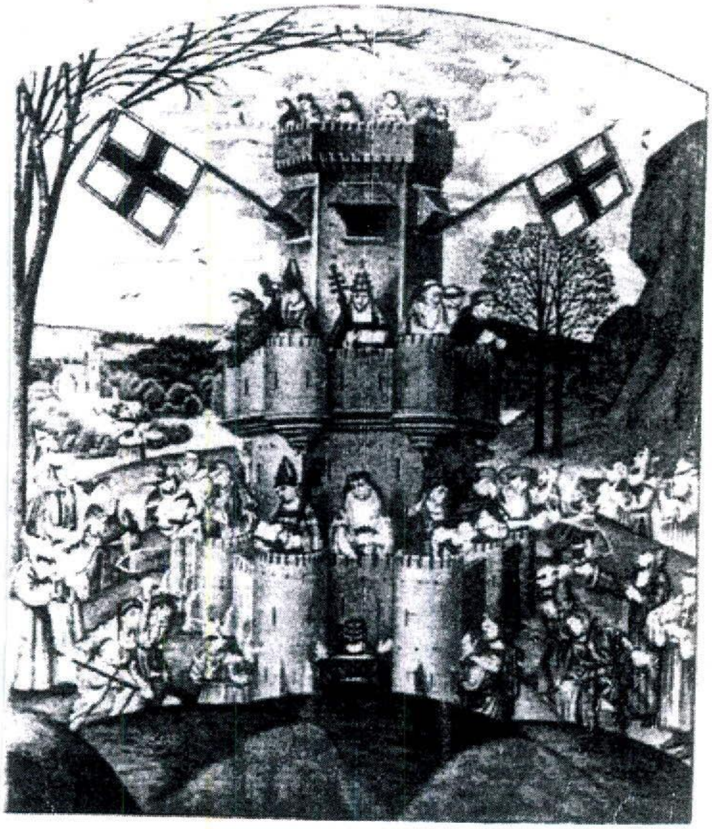

Church History. The Fortress of Faith, from a 15th-century manuscript, shows the Church defended by its Chevaliers (the Pope, bishops, and monks) against heretics and the impious. *(Mansell Collection)* চিত্র নং - ১

চিত্র নং-২ ঃ জপমালা রাণীর গির্জার সম্মুখ অংশ, তেজগাঁও।
(আওয়ার লেডি অব দ্যা রোজারিও)

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র নং-৩ঃ জপমালা রাণীর গির্জার প্রধান প্রবেশ পথ এবং উভয় পাশে জোড়া স্তম্ভ এবং নীচে কলসী নকসা

চিত্র নং-৪ঃ সাধু নিকোলাস তলেন্তিনো গির্জা

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র নং-৫ঃ সাধু নিকোলাস তলেন্তিনো গির্জার পশ্চিম দিক থেকে

চিত্র নং-৬ঃ সাধু নিকোলাস তলেন্তিনো গির্জার বেদীর চিত্র

Dhaka University Institutional Repository

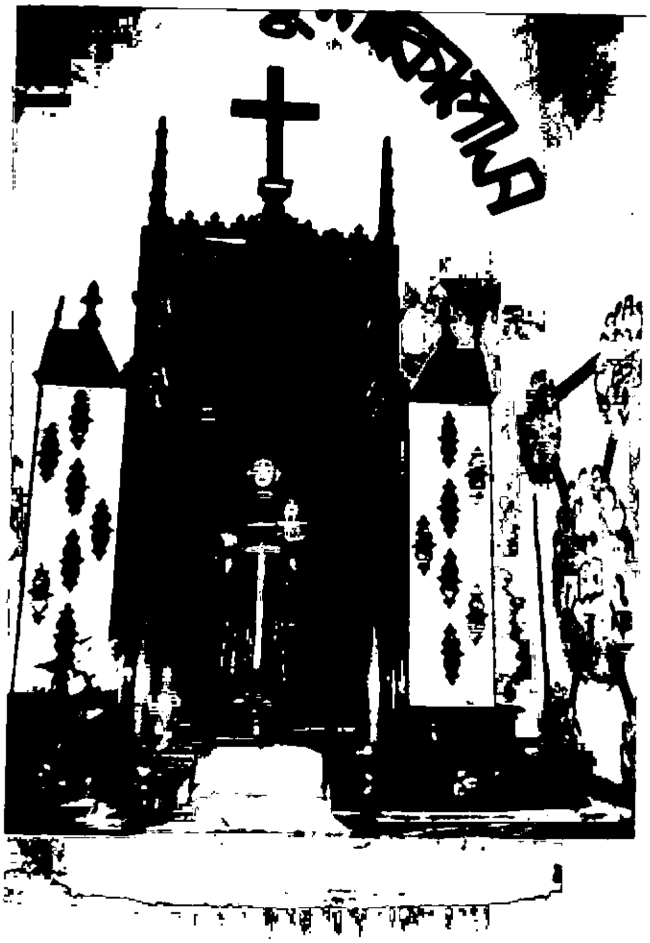

চিত্র নং-৭ ঃ জন পলের মূর্তি

চিত্র নং-৮ ঃ সাধু মাতা মেরী ও পালক পিতা যোশেফের মূর্তি

Dhaka University Institutional Repository

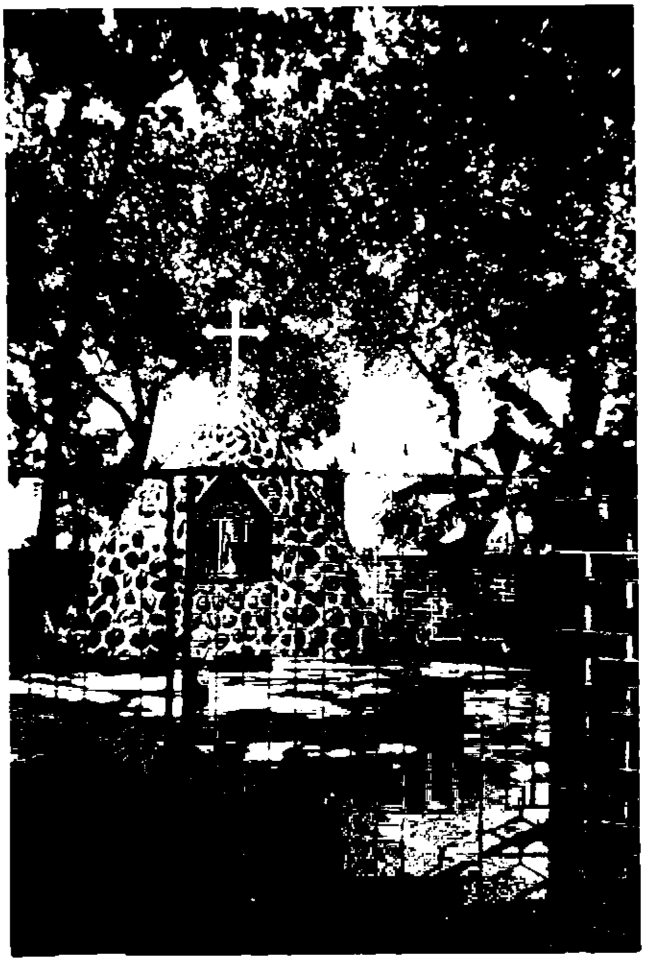

চিত্র নং-৯ঃ সাধু নিকোলাস তলেন্তিনো গির্জার উত্তর পূর্ব কোনে
Grotto বা গুহা

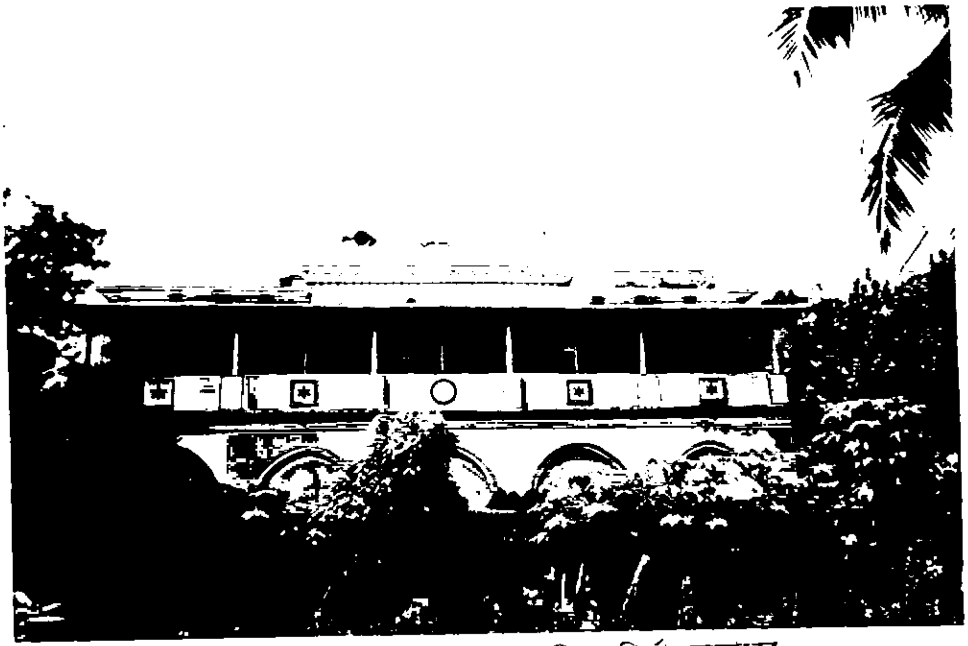

চিত্র নং-১০ ঃ সাধু নিকোলাস তলেন্তিনো গির্জার ফাদারের
বাসস্থান

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র নং-১১ঃ নাগরী.শব দেহ কবরস্থ করার পূর্বে এখানে রাখা হয়

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র নং-১৩ . জপমালা রাণীর গির্জার (একাংশ)

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র নং-১৪ ঃ গির্জার প্রধান প্রবেশ পথ

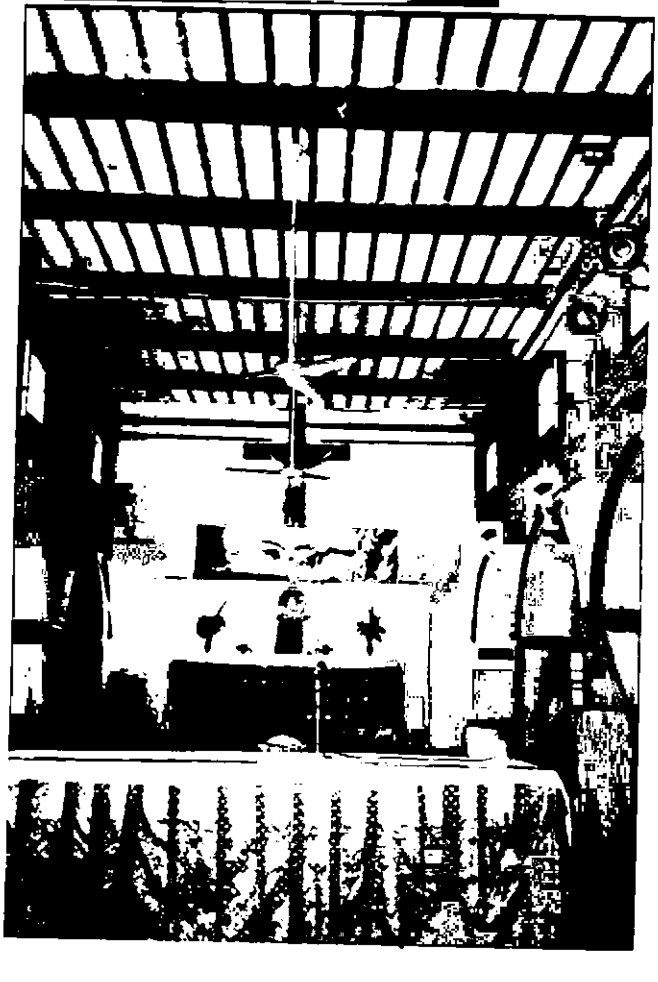

চিত্র নং-১৫ ঃ জপমালা রাণ গির্জার বেদীর চিত্র

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র নং-১৬ ঃ বেদীতে পূর্ব প্রান্তে ক্রুশবিদ্ধ যীশু

চিত্র নং-১৭ ঃ বেদীর ডানদিকে সাদা পোষাকে বসা অবস্থায় যীশুর মূর্তি

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র নং-১৮ ঃ পশ্চিম প্রান্তে গ্যালারীর চিত্র

নং-১৯ ঃ সন্তান কোলে মাতা মেরীর মূর্তি

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র নং-২০ ঃ যীশুর মূর্তি

Dhaka University Institutional Repository

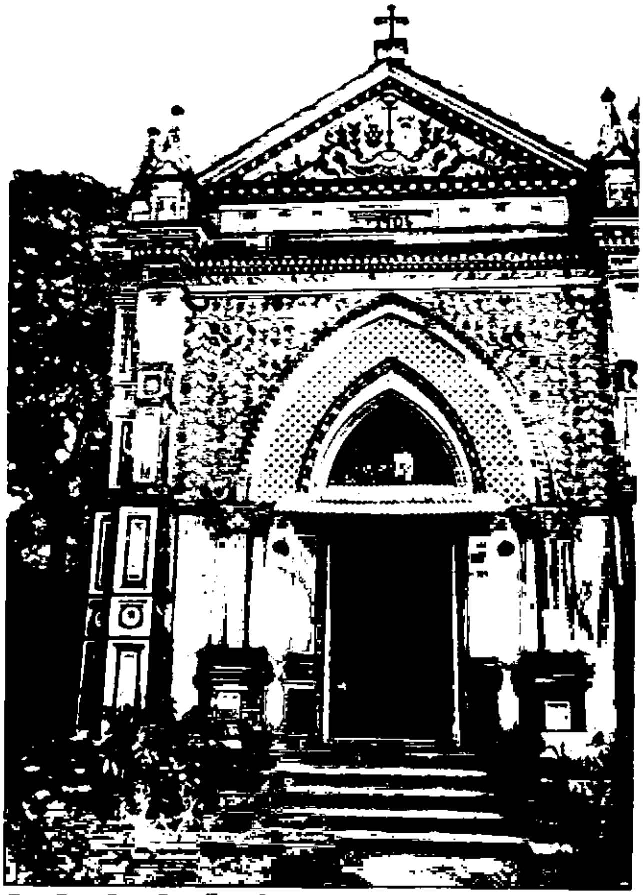

চিত্র নং-২১ ঃ সাধু আন্তনীর (পাঞ্জরা) গির্জা

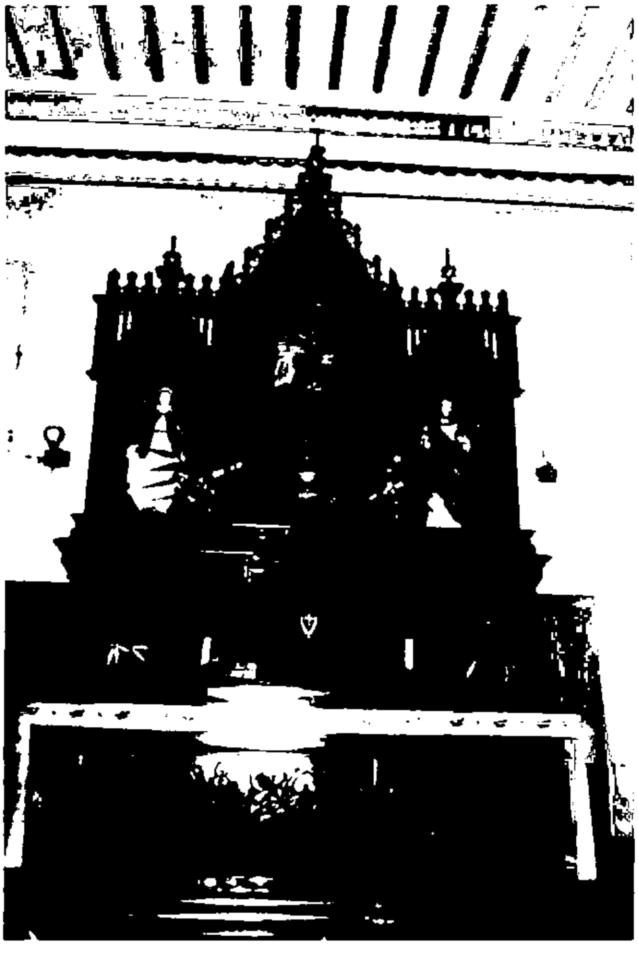

চিত্র নং-২২ ঃ সাধু আন্তনী গির্জার বেদীর চিত্র

Dhaka University Institutional Repository

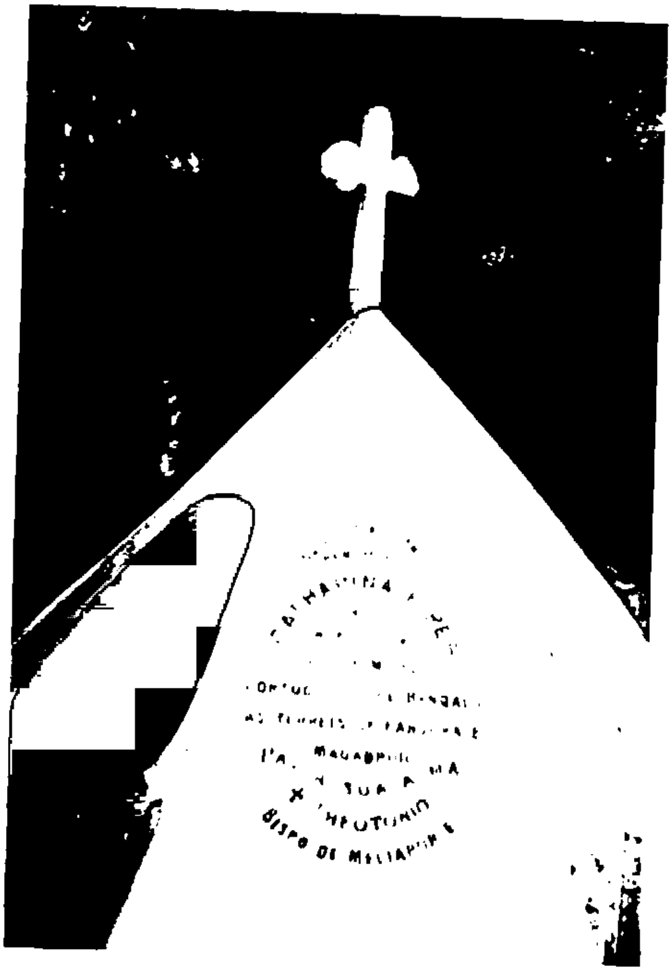

চিত্র নং-২৩ ঃ গির্জার সম্মুখে পাথরে নির্মিত একটি
ষষ্ঠকোনাকৃতির একটি স্থানে পর্তুগীজ
ভাষায় লিখিত শিলালিপি

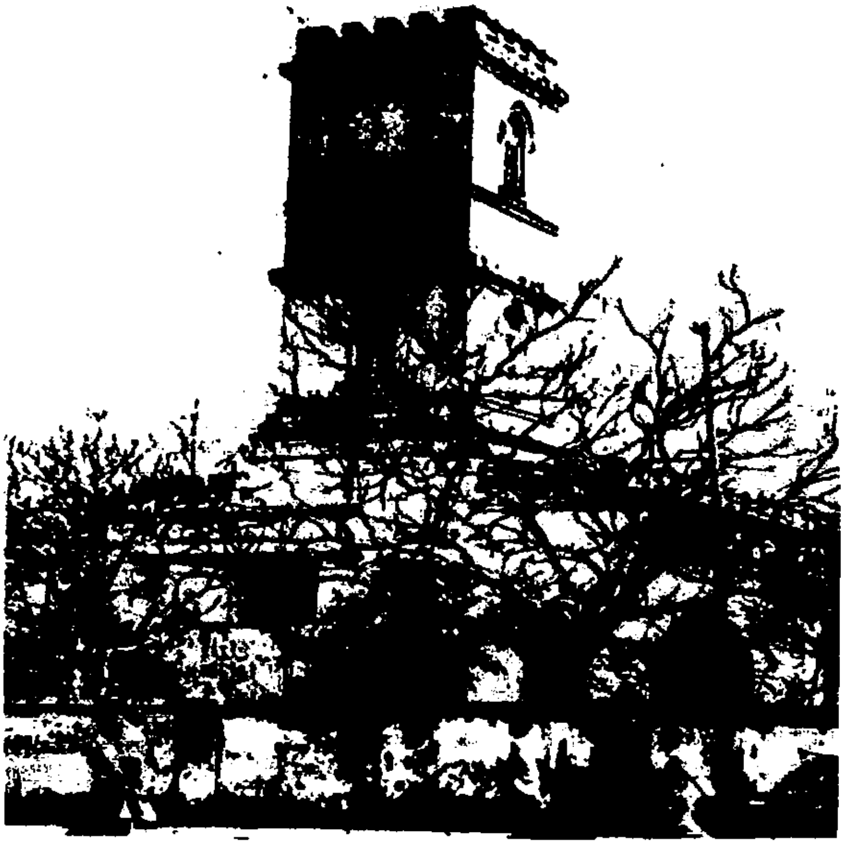

চিত্র নং-২৪ ঃ সেন্ট থমাস গির্জা (জনসন রোড)

চিত্র নং-২৫ ঃ সেন্ট থমাস গির্জার বেদীর অংশ

Dhaka University Institutional Repository

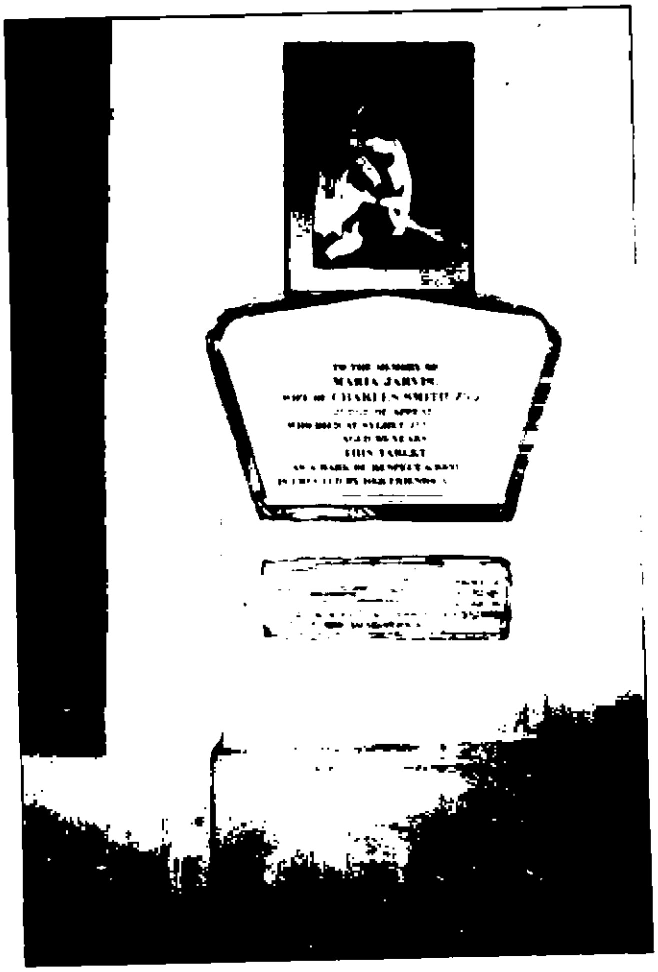

চিত্র নং-২৬ঃ দেয়ালে সন্তান কোলে মায়ের চিত্র

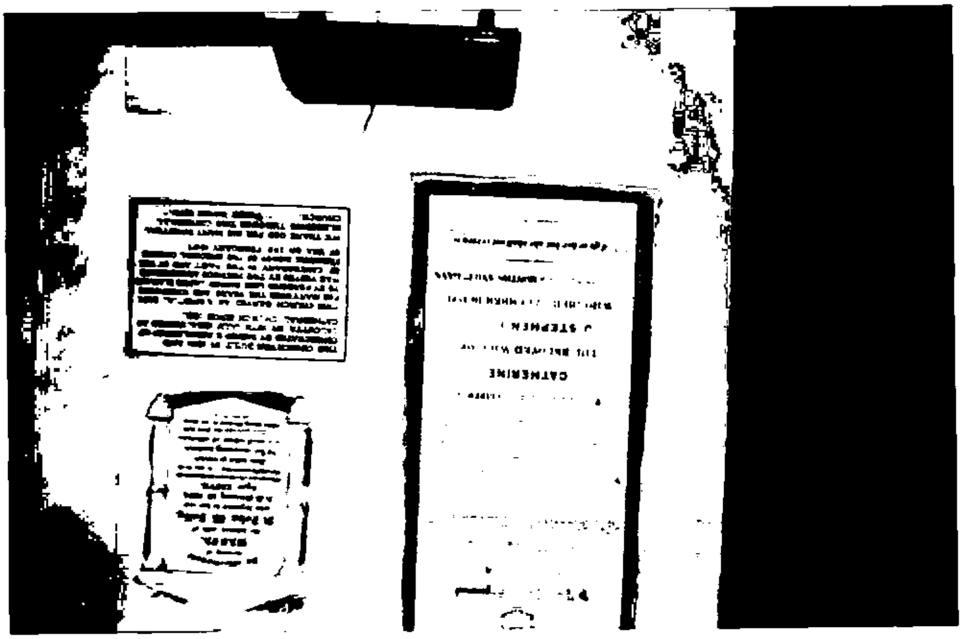

চিত্র নং-২৭ঃ শিলালিপির চিত্র

University Institutional Repository

চিত্র নং-২৮ঃ ব্যাপটিস্ট ফন্ট

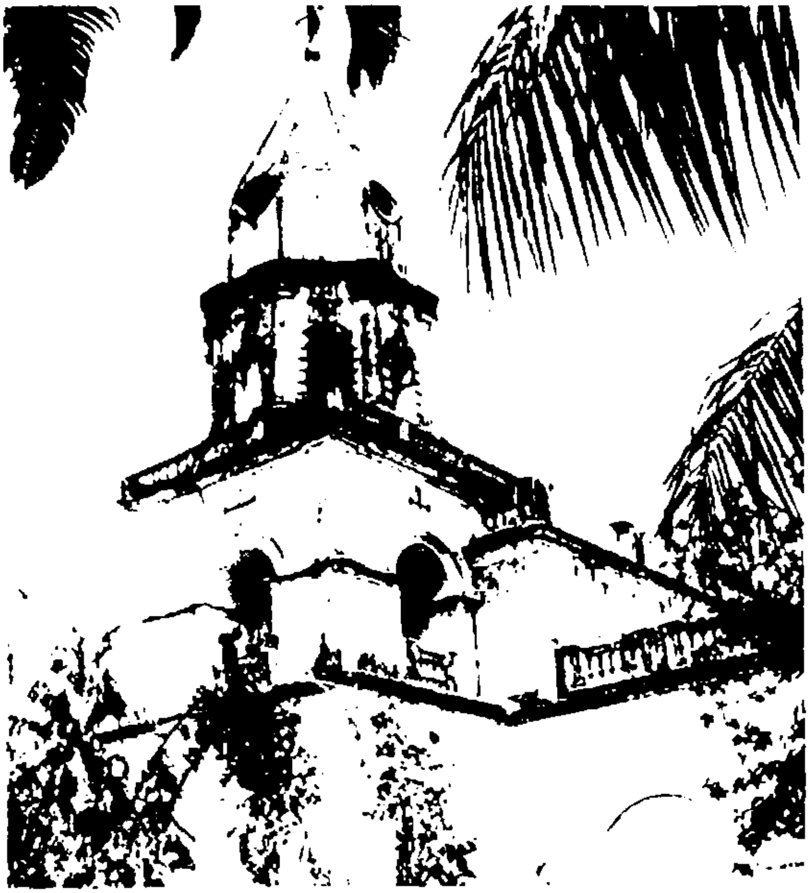

চিত্র নং-২৯ ঃ হলি রেসারেকশন গির্জা (আরমানিটোলা)

Dhaka University Institutional Repository

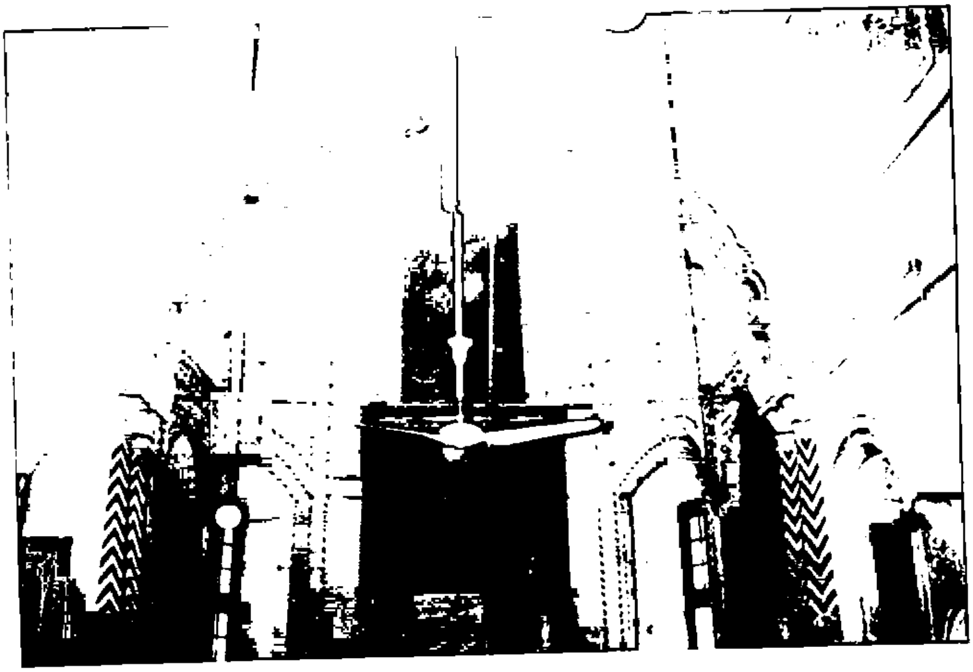

চিত্র নং-৩৬ ঃ বেদীর উপর কারুকাজ করা জোড়া স্তম্ভ এবং
বহুখাজ বিশিষ্ট অর্ধবৃত্তাকার খিলান

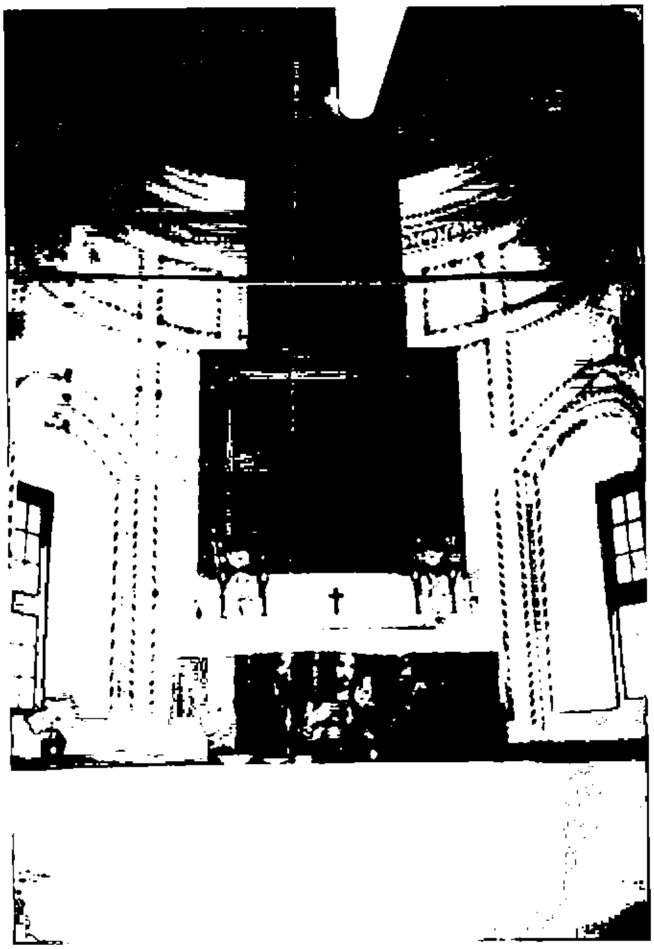

চিত্র নং-৩৭ ঃ বেদীর পেছনে দু'টি তেল চিত্র

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র নং-৩২ঃ বসার আসনসহ বেদীর চিত্র

চিত্র নং-৩৩ ঃ শ্বেত মর্মরের এপিটাফ

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র নং-৩৪ ঃ পবিত্র ক্রুশ গির্জা (লক্ষ্মী বাজার)

চিত্র নং-৩৫ ঃ পবিত্র ক্রুশ গির্জায় বেদীর চিত্র

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র নং-৩৬ ঃ সাধু যোহানের (তুমুলিয়া) গির্জার সম্মুখ অংশ

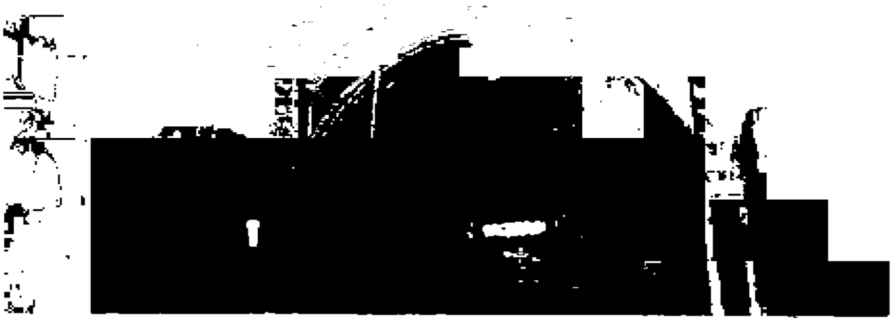

চিত্র নং-৩৭ ঃ তুমুলিয়া গির্জার বেদীর অংশ

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র নং-৩৮ ঃ যীশুর মূর্তি

চিত্র নং-৩৯ঃ সাধু ব্যাপ্টিস্টের মূর্তি